ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
প্রণব শূর

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত কনিষ্ঠ পুত্র

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের

অশ্রুসিক্ত স্মৃতির উদ্দেশে

ছিল না যত ছিল সুবিমল সেনের ডাকে সাড়া দিতে। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে সে তার বাল্যবন্ধু সুবিমলের কথাই ভাবছিল। একই স্কুলে, একই কলেজে তারা দুজনে পাঠ সাঙ্গ করেছে—আইনও পড়েছে পাশাপাশি বসে। কিন্তু পরীক্ষার ফল বের হলে দুটো নাম কোনদিনই কাছাকাছি পাওয়া যায় নি। বিপ্রদাসের মেধা পরীক্ষকদের চমক লাগিয়েছে। কিন্তু স্মার্ট ছেলে সুবিমল অনেকের প্রিয় হলেও পরীক্ষকদের কাছে কিছু সুবিধে করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় বিপ্রদাস হয়েছে প্রথম আর সুবিমল শুধুই পাশ করেছে।

জীবনের পরীক্ষায় কিন্তু হেরে গেছে বিপ্রদাস, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে কোথায় হারিয়ে গেছে কলেজের সেই কৃতিত্বমুখর দিনগুলো। স্কলারশিপ নিয়ে সে বিলেতে গেল, সেখানে কিছু গবেষণাকার্যের পর ফিরে এল ব্যারিস্টার হয়ে। সুবিমল তখন পিতার শূন্য আসনে বসেছে অ্যাটর্নি হয়ে। তারপর ভাগ্যের চাকার বিচিত্র গতিপথে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চললো দুই বন্ধুর জীবনে। সুযোগ এবং সুবিধার চাকায় চড়ে সুবিমলের রথ সকলকে সচকিত করে পৌঁছে গেছে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে। আজ সে একজন ধনী অ্যাটর্নিই শুধু নয়, শহরের অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিকও। আর এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যারিস্টার বিপ্রদাস, ব্যবসায়ের কোনও পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে এখন হাইকোর্টের উজ্জ্বল এবং উদীয়মান জ্যোতিষ্কদের পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে পাশে, আশ্রয় নিয়েছে দর্শনের শান্ত সমাহিত স্তব্ধতায়। আইনের ব্যবসায় তার তেমন কিছুই হয়নি, আজও হয় না। মাঝে-মাঝে উচ্ছিষ্টের মতন এক-আধটা ছেঁড়া কেস এসে পড়ে তার হাতে। তাই সে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধা করে। অর্থ না পাক, তৃপ্তি পায়—কারণ মানুষের আইনের চেয়ে জীবনের আইন তার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।

কিন্তু সুবিমলের ডাকে যেতে যেতে তার এই মূল্যবোধ পদে পদে ব্যাহত হল—অসমতল পথে হোঁচট খাওয়ার মতন। সুবিমলের এই সাফল্য সে যুক্তি দিয়ে নির্ণয় করতে পারে না। অবশ্য যুক্তি দিয়ে সব কিছুর মূল্যায়ন হয় না এও সে জানে। কিন্তু তবু ক্ষোভ থেকেই যায়। ক্ষোভ হয় সুবিমলের মতন বন্ধুদের ব্যবহারে। হয় ভাগ্যের কৃপা এদের অন্ধ করে দিয়েছে আর নয়তো সাফল্যের সিংহাসনে বসে অতীতের অসংখ্য অসাফল্যের সাক্ষী বন্ধুকে এড়িয়ে চলাই বোধ হয় এদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুবিমলের সঙ্গে আগে দু'চার বার তার দেখা হয়েছে। কিন্তু অ্যাটর্নি সুবিমল সেন, প্রাক্তন মেয়র সুবিমল সেনের চকচকে মুখোশের আড়ালে পুরাতন বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক কথায়, সুবিমল উপেক্ষার আঘাতে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ব্যথা সে পেয়েছে কিন্তু বিরক্ত হয়নি। তার মতন ব্রীফলেস ব্যারিস্টার সুবিমলের মত কৃতী পুরুষের কৃপার পাত্র হতে বাধ্য। সাফল্যের ঢেউ থেকে ঢেউএ ভেসে যেতে-যেতে সুবিমলের মতন মানুষরা আর যাই করুক ভাগ্যকে স্বীকার করে না। মনে হয়, আড়ালে তার সম্বন্ধে তারাই হেসে বলে, লোকটা কুঁড়ের বাদশা—হোপলেস।

দ্বিধাগ্রস্ত, চিন্তান্বিত, 'হোপলেশ' বিপ্রদাস এসে দাঁড়াল সুবিমল সেনের ঘরে। সুবিমল তাকে দেখে শুধু হেসে উঠল না, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরে, এসো এসো। কতদিন যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তুমি তো শুনি প্রায়ই হাইকোর্টে আস অথচ আমাদের এদিকে দেখতে পাই না।'

'তোমরা কাজের লোক। আসা মানে তো বিরক্ত করা', সে শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল।

'কি যে বল তার ঠিক নেই। কাজের চাপে মরে যাবার যোগাড় ঠিকই। তবু তোমার মতন পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেলে একটু হাঁফ ছাড়বার সময় পাওয়া যায়। নাও একটা সিগার ধরাও।'

উচ্ছ্বাসের উত্তর না দিয়ে সামনে এগিয়ে ধরা সুদৃশ্য চন্দনের বাক্সটা একবার সে দেখল, কি একটু ভাবল তারপর আলগোছে একটা সিগার তুলে নিয়ে বলল, 'রাতে খাওয়ার পর উপভোগ করা যাবে।'

'আরে ওটা ধরিয়ে নাও, ধরিয়ে নাও', সুবিমল প্রায় আত্মীয়তায় উপচে পড়ল, 'আর রাতের জন্যে এইগুলো রাখ',—কথার সঙ্গে সঙ্গে একমুঠো সিগার গুঁজে দিল তার কোটের হাঁ-করা বুক পকেটে।

হতচকিত বিপ্রদাস খানিকটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে সিগারগুলো তুলে পাশের পকেটে রাখল।

'তারপর, খবর কি বল ?' রিভলভিং চেয়ারে হেলে পড়ে বেশ দরাজ গলায় প্রশ্ন করল সুবিমল।

'শুনলাম তুমি আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ, কি না কি জরুরী প্রয়োজন।' প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সপ্রতিভ বিপ্রদাসকে এতক্ষণে পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ', গম্ভীর গলায় এইটুকু বলে সুবিমল ধীরে ধীরে একটা সিগার ধরাল, লাইটার বাড়িয়ে বন্ধুর সিগার ধরানোয় সাহায্য করল, চোখ বুঁজে এক মুখ ধোঁয়া টেনে নাক দিয়ে নীলচে কুণ্ডলী ছাড়ল এবং তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, 'তুমি দীপক দত্তর মামলার কথা শুনেছো নিশ্চয়ই।'

'না।'

উত্তর শুনে সুবিমল প্রায় আঁতকে উঠল, 'অ্যাঁ, শোননি ?' তারপর বেশ মাস্টারি চালে বলল, 'অবশ্য তোমার মতন ভাবুক দার্শনিক মানুষের না শোনাই স্বাভাবিক। তুমি কি একটুও বদলাবে না ? আর হাইকোর্টে এসে কর কি ? হাইকোর্টের বেয়ারাটাও জানে…'

'হাইকোর্টের আবহাওয়ায় বেড়াতে আমার ভাল লাগে।' মৃদু হেসে বলল বিপ্রদাস।

'আরে সেইখানেই তো আমার আপত্তি। মানে…অথচ তোমাকেই আমার প্রয়োজন।'

বিপ্রদাস নাকের ওপর ঝুলে পড়া চশমাটা সামলাতে সামলাতে বন্ধুর দিকে হাস্যোজ্জ্বল চোখে তাকাল—ভাবটা যেন সেইখানেই তো আমারও আপত্তি।

ভ্রূক্ষেপ না করে সুবিমল বলে চলল, 'দীপক দত্তর মামলা জানে না এমন

শুরুর শুরু

সপ্তাহে তিন দিন—সোম, বুধ আর শুক্রবার—বেলা ঠিক একটার সময় টাউন হলের সামনে গাছের তলা দিয়ে তাকে ধীর মন্থর গতিতে চলে যেতে দেখা যায়। কাজের দিনে, ঠিক সময়ে, গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই দৃশ্যের অবতারণায় ছেদ পড়েনি। লোকটির বয়স বেড়েছে কিন্তু চলার গতি বা ভঙ্গি বদলায় নি, বদলায় নি তার লক্ষ্য। লক্ষ্য একটু এগিয়ে সামনের লাল রঙের বিরাট বাড়ি—কলকাতার হাইকোর্ট।

টাউন হলের সামনে গাছের তলা দিয়ে বেলা ঠিক একটার সময় চলে যাচ্ছে লোকটি। পরণে সাদাসিধে সাহেবি পোশাক—পরিচ্ছন্ন কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়। অন্যমনস্ক, অগোছাল লোকটি এগিয়ে চলে, পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হলে মুখ তুলে মৃদু একটু হাসে কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও থামে না।

থামে হাইকোর্টের দোতলায় ব্যারিস্টারদের বসবার ঘরে পা দিয়ে। উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে আসতে একটু যেন হাঁফ ধরে—হয়তো বয়স হওয়ার জন্যে। তাতে অবশ্য রুটিন পাল্টায় না। ঘরে ঢুকে প্রথমে সামান্য একটু বিশ্রাম। তারপর কোটের ওপরেই পুরাতন কিন্তু পরিচ্ছন্ন কালো গাউন চড়িয়ে, হাতের পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ দুলিয়ে বেশ ভারিক্কি চালে লম্বা করিডরের পথে পা বাড়ানো। হাতের ব্যাগটা ভারী নয়, খান দুয়েক বই আর দিনের খবরের কাগজের ভার আর কত হবে! আর ভার নেই বলে চলতে ভালই লাগে।

ভাল লাগে এই হাইকোর্টের নিজস্ব পরিবেশে পরিচিত সহকর্মিদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে। ব্যারিস্টার, উকিল, জজ, আমলা, এটর্নি, কেরানি—এইসব বিচিত্র মানুষের মিছিলের সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের পরিচয়, চোখের পরিচয় প্রায় সকলের সঙ্গে। বছরের পর বছর নিয়মমাফিক এই পরিক্রমায় পরিচয় হয়নি এমন লোক নেই। কথা না হোক দেখা হয়েছে—কখনও বিচার কক্ষের গুরুগম্ভীর আবহাওয়ায়, কখনও করিডরের আলো-আঁধারে, কখনও বা উঁচু সিঁড়ি ভাঙার ব্যস্ততায়। শুধু দেখাই হয়েছে আর কিছু নয়। অন্যেরাও তাকে দেখেছে, নিশ্চয়ই দেখেছে এবং ভ্রূ কুঁচকে একবার ভেবেছে, কিন্তু ভেবেও এই হাইকোর্টে তার ভূমিকা কেউ ঠিক করতে পারেনি। তার সহকর্মিদের মধ্যে অধিকাংশই জানে না এই লোকটি নিয়মিত কেন আসে, কেন ঘুরে বেড়ায়, আবার ঠিক সময়ে কেন চলে যায়। বিশেষত তরুণের দল, ঢিলেঢালা পোশাক, মাথাভর্তি সাদা চুল, নাকের ওপর ঝুলে পড়া চশমা, এই বিচিত্র মানুষটিকে তাদের বসবার ঘরে দেখেছে কিন্তু কোনো মামলার পক্ষ নিয়ে বিচারকক্ষে তার উপস্থিতি দেখেনি বললেই চলে। তারা শুধু আশ্চর্য নয়, এই অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে তাদের সহকর্মী ভেবে হয়তো বিরক্তও হয়েছে।

লোকটিকে কিন্তু একদিনও কেউ বিরক্ত হতে দেখেনি। বিচারকক্ষের পর বিচারকক্ষে অলস ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে, নোটিশ বোর্ডে মামলার লম্বা ফিরিস্তি পড়েই তার আনন্দ। যে যা ভাবে ভাবুক, বলে বলুক, সে জানে যে মামলা বাগাবার মোহে সে হাইকোর্টে আসে না। হাইকোর্টে আসা তার নেশা, আইনের আবহাওয়ায় সপ্তাহে কয়েকঘণ্টা কাটানোর মধ্যে সে পায় তার জীবনের সর্বোত্তম প্রেরণা। মাঝে-মাঝে এক-একটা মামলা যে জোটে না তা নয়। বছরে বার কয়েক। ছোটখাট মামলায় শোনা যায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব মক্কেলের পক্ষ নিয়ে তার সওয়াল।

এই হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের চল্লিশ বছরের প্রবীণ ব্যারিস্টার, বিপ্রদাস বসু।

এই দীর্ঘ দিন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছে বিপ্রদাস। হাইকোর্টে পসার জমেনি। বন্ধুও তার নেই, কি হাইকোর্টে কি বা হাইকোর্টের বাইরে। পুরাতন ব্যারিস্টারের দল তাকে চেনে কিন্তু এড়িয়ে চলে। ভাবুক ভবঘুরে লোকের সঙ্গে পরিচয় রাখায় লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। তাই নির্বান্ধব বিপ্রদাস ধীরমন্থর পায়ে হাইকোর্টে আসে, ঘরের পর ঘর ঘুরে বেড়িয়ে, গাউন খুলে রেখে ঠিক পাঁচটার সময় টাউন হলের সামনের ফুটপাত বেয়ে, ময়দানের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে, নীল আকাশের তলা দিয়ে ফিরে যায় লোয়ার সার্কুলার রোডের নির্জন ফ্ল্যাটে। ছুটিছাটা, দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা বাদ দিলে এই তার সপ্তাহে তিন দিনের রুটিন। আসে ট্রামে ফিরে যায় হাঁটাপথে। বাকী তিন দিন কাটে আলিপুরের জাতীয় পাঠাগারের শীতল, শান্ত কোণে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের গবেষণায়। লিখেছে দর্শনশাস্ত্রের উপর গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ খানকয়েক বই, যা পড়বার লোক বিশেষ নেই। রবিবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। পৈতৃকসূত্রে কিছু অর্থ পেয়েছিল বলেই সম্ভব হয়েছে এই সুসংবদ্ধ নিয়মের গণ্ডীতে ঘেরা শান্ত, সুস্থ জীবন।

নিয়মের ব্যতিক্রম কিন্তু হয়ই, সেদিন যেমন হলো বিপ্রদাসের জীবনে। সবে করিডরে পা রেখেছে ; কোথা থেকে সামনে এসে লম্বা সেলাম দিয়ে দাঁড়াল এক ধোপদুরস্ত পোশাক পরা বেয়ারা। বিস্মিত চোখ তুলে তাকাতেই এগিয়ে দিল চকচকে সাদা ছোট্ট একটা কার্ড। অ্যাটর্নি সুবিমল সেন এখনই তাকে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়েছে। বিমূঢ় বিপ্রদাস মুখ তুলতেই বেয়ারাটা আবার সেলাম দিয়ে বলে উঠল, 'বেলা দশটা থেকে আপনাকে খুঁজছি স্যার। সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'সাহেব, সুবিমল সেন'—নিজের মনে একবার বলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কি দরকার বল তো ?'

বিখ্যাত অ্যাটর্নির সুচতুর বেয়ারা বিনয়ের ভঙ্গীতে আদেশের সুর মিলিয়ে বলল, 'তা তো ঠিক জানি না স্যার। তবে সাহেব আপনার জন্যেই বসে আছেন। ব্যাপারটা জরুরী মনে হয়।'

'আচ্ছা তুমি বলগে আমি যাচ্ছি।'

করিডরের পথ ছেড়ে বাইরের পথে পা বাড়ানোয় বিপ্রদাসের তত আপত্তি

আসামী দোষী হলে তার শাস্তি এবং নির্দোষ হলে তার মুক্তি ত্বরান্বিত করা।'

'শাস্তি এক্ষেত্রে অনিবার্য আর যতদূর মনে হয় আসামী নিজেই দোষ স্বীকার করবে।'

'দেখ সুবিমল, কেসটা যখন আমি নিয়েছি, আসামীর সম্বন্ধে ভাবনার দায়িত্ব এরপর আমারই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। শাস্তি যা হবার তাতো হবেই। তোমার কৃতিত্বে এখন ফাঁসীটুকু বাঁচলেই বাঁচি।'

'এক সপ্তাহ পরে আমার মতামত পাবে' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল বিপ্রদাস। বন্ধুর সঙ্গে ব্যবহারটা হয়তো ঠিক হলো না, কিন্তু বিরক্ত, বিতৃষ্ণ সে এর চেয়ে ভাল কি-ই বা করতে পারতো। ভাবতে ভাবতে হাইকোর্টের সামনে এসে পড়েছে, এমন সময় প্রশান্ত রাহার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি।

রাহার 'বার'-এ বেশ নাম হয়েছে তাই সে পুরাতন বন্ধু হলেও ব্রীফলেস বিপ্রদাসকে এড়িয়ে চলে। আজ কিন্তু চোখ নাচিয়ে, ঘাড় কাঁপিয়ে বললে, 'আরে বোস। তুমি এধারে কি ব্যাপার—ব্রীফ্ না কি?'

গোপন কোনও কথা বলার ভঙ্গীতে কাছে এগিয়ে বিপ্রদাস প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'হ্যাঁ, একটা বেশ জমজমাট মামলার।'

'পুলিশ কোর্টের নিশ্চয়ই।'

'হাইকোর্ট সেশনের' বলে ব্যাগটা দুলিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল বিপ্রদাস।

বার লাইব্রেরীতে এসে গাউন খুলে বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হলো বিপ্রদাস। 'হাইকোর্টের সেশন' এই কথাটার মধ্যেই কেমন একটা প্রেরণার সাড়া লুকিয়ে আছে। কথাটা বলার পর থেকেই নিজেকে তার নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। জীবনের সব ব্যর্থতা এইবার হয়তো একটি নিটোল পরিপূর্ণ সার্থকতার গোলাপ হয়ে ফুটে উঠবে। কিন্তু কি করে? কি আছে ওই মোটা ফাইলটার মধ্যে? কেন দু'জন সুযোগ্য ব্যারিস্টার প্রত্যাখ্যান করেছে এই সম্ভাবনাপূর্ণ মামলার দায়িত্ব?

বাড়ী ফেরার কিছু পরেই শেষ প্রশ্নের উত্তর পেতে তার দেরী হলো না। ঘণ্টা তিনেক বাদে মোটা ফাইল পড়া শেষ করে সে তখন নথীর পাশে তার পূর্ববর্তী দুই ব্যারিস্টারের পেন্সিলে লেখা নোট সযত্নে ঘষে ঘষে তোলায় ব্যস্ত। সে সম্পূর্ণ নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। আর তা ছাড়া নোট করা তার স্বভাব নয়। মামলার খুঁটিনাটি মাথায় নিয়ে ঘোরা তার বদ অভ্যাস।

তার ঘরের বাইরে শীতল রাত্রির অন্ধকার তখন বাদুড়ের মতন ঝুলে পড়েছে। লোয়ার সার্কুলার রোডে দু'খানা মাত্র ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে সে—দীর্ঘকাল একই বাড়ীতে আছে। বড় ঘরখানা একাধারে তার শয়নকক্ষ এবং লাইব্রেরী। অতি সাধারণ আসবাব আর বই ভর্তি একাধিক আলমারী—টেবিলের ওপর একটা সবুজ শেড দেওয়া টেবিলল্যাম্প জ্বলছে—আর তাতেই ঘরখানা কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে।

নথী মার্জনা শেষ করে সে গেল পাশের ঘরে—তার রান্না এবং খাবার ঘর।

হিটার জেনলে নিজে হাতেই তৈরী করল এক কাপ কফি। তারপর ধূমায়িত কফির পেয়ালা নিয়ে এসে পাশের ছোট টেবিলে রেখে লুটিয়ে পড়ল আরাম কেদারায়। এই আরাম কেদারাটি তার একমাত্র বিলাসের বস্তু। সুদৃশ্য নরম গদীমোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুঁজে কল্পনার আকাশে পাখা মেলায় তার অসীম আনন্দ। আজও কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে ধরাল সুবিমল সেনের দেওয়া সুগন্ধি সিগার। উর্ধ্বায়িত নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে দেখতে চোখ বুঁজে এল। তার এই ধ্যানাবস্থায় দু'বার মাত্র ছেদ পড়ল—দু'বারই হাত বাড়িয়ে সে টেনে নিলো পাশের টেলিফোন রিসিভার।

'মিঃ পাল? আমি বিপ্রদাস বোস কথা বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতেই তো পারছেন হাইকোর্টে ইচ্ছে থাকলেও আপনাদের মতন ব্যস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় না।…ও হ্যাঁ আপনার পার্টির কার্ড পেয়েছিলাম বৈ কি…যেতে না পারার জন্য সত্যিই দুঃখিত…পরিচিত হবার এমন একটা সুযোগ হারিয়ে এখন হাত কামড়াচ্ছি আর কি। যাই হোক, দীপক দত্তর মামলাটা আমার হাতে এসেছে…না, মিঃ ব্যানার্জি করতে রাজী নন। আর সেই জন্যেই এই রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি…যদি কিছু মনে না করেন, মানে সহকর্মী হিসাবে জানতে চাইছি…আচ্ছা আপনি মামলাটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন কেন?'

তরুণ পালের দীর্ঘ উত্তর শুনতে-শুনতে তার কণ্ঠে বার দুয়েক শুধু শোনা গেল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' আর 'কি আশ্চর্য'। আলাপ শেষ হলো তার বিনয় নম্র ধন্যবাদে, 'কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এখন বুঝেছি কেন আপনি আপনার স্বাভাবিক পথে মামলার সফল নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলেন। সুযোগ পেলেই একদিন দেখা করবো। আচ্ছা নমস্কার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে আপন মনে বার বার বলল, 'বড় আশ্চর্য ব্যাপার তো—সত্যিই আশ্চর্য।'

মিনিট পাঁচেক বাদে আবার শুরু হলো টেলিফোনে আলাপ, 'আমি মিঃ ব্যানার্জিকে চাই…ওঃ, কে? মিঃ ব্যানার্জি—আমি বিপ্রদাস বোস।' আগের কথা এবং ভঙ্গীর মোটামুটি পুনরাবৃত্তি হলো এবারও। তফাতের মধ্যে এইবার রিসিভার নামিয়ে রেখে তাকে বলতে শোনা গেল 'বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার দেখছি—। সত্যিই বিদ্‌ঘুটে।'

তারপর বাইরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো, ঘরে প্রলম্বিত হলো শান্ত সমাহিত স্তব্ধতা। সুগন্ধি চুরুটের নীলাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে কখন মিলিয়ে গেল শূন্যে। টেবিলের ওপর জ্বলে চলল সবুজ শেড দেওয়া বাতি যতক্ষণ না ভোরের আলো এসে আচ্ছন্ন করল তার দীপ্তি।

ভোরবেলা রাসুর মা নিজের ডুপলিকেট চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলে ঘরে এসে দেখল কর্তা আরাম কেদারায় ঘুমিয়ে আছেন। রাসুর মা বিপ্রদাসের একাধারে পাচিকা এবং পরিচারিকা। অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখে বাসুর মার গজগজানি শুরু হতেই বিপ্রদাসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ রগড়িয়ে বলল, 'ক'টা বেজেছে বলতো?'

লোক কলকাতায় আছে বলে মনে হয় না। ছ'মাস আগের ঘটনা এখন প্রায় একটা কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 'জলযাত্রা' জাহাজে লণ্ডন থেকে কলকাতা আসবার পথে দীপক দত্ত এক ইংরেজ যুবককে খুন করে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর এই জন্যে যে আজও খুনের উদ্দেশ্য জানা যায়নি। যাকে খুন করেছে তাকে সে কখনও দেখেনি, তার সঙ্গে কোনও সূত্রে কোনও দিন সে পরিচিত হয়নি, এমন কি খুনের পর নিহত ব্যক্তির একটি জিনিসও সে অপহরণ করে নি। জাহাজের কাপ্তেন তাকে কলকাতা পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছে। এখন সে আলিপুরের জেলে। আর তিন হপ্তা পরেই হাইকোর্টের সেশনে তার বিচার আরম্ভ হবে।'

'আমাকে এই কাহিনী বলাই কি তোমার জরুরী প্রয়োজন?'

'না, জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে তোমার হাতে এই মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থনের ভার দেওয়া।'

'আমার হাতে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু হাইকোর্টের সেশনে মামলা করার কোনও অভিজ্ঞতাই আমার নেই।'

'নেই বলেই তো তোমার নাম আমার প্রথমে মনে পড়েছে। অনেক দিন তো হলো, এইবার পরোপকারের মায়া ছাড়। আচ্ছা, সত্যি তুমি কি বলো তো! জীবনের চল্লিশটা বছর কাটিয়ে দিলে শুধু যতসব দেউলিয়া মক্কেলের মামলায় মেহনত করে। একটু মন দিলে তোমার মতন পণ্ডিতের ব্যারিস্টারীতে নাম করা কঠিন হতো না। সেই সুযোগ আমি তোমার হাতে এবার তুলে দিচ্ছি।'

জীবনের এই সায়াহ্নে পুরুষের ভাগ্যোদয়ের অভিধানে বিলম্ব বলে কোনও কথা নেই। এই একটা মামলাতেই তুমি মাত করে দিতে পারবে। দীপক দত্তর মামলা নিয়ে সারা শহর, শহর কেন, এমন কি খোদ দিল্লী পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছে। একজন মানুষের মাথা ফাঁসীকাঠে লটকাবার উপক্রম হলেও লক্ষ লোকের মাথাব্যথা হবে, খবরের কাগজের ভাষায় 'অগণিত জনতা' উন্মুখ হবে মামলার ফলাফলের জন্যে। একবার এই 'অগণিত জনতার' মন জয় করতে পারলেই, হাইকোর্টে তোমার জয়যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে, গাড়ী গাড়ী ব্রীফ আসবে তোমার বাড়ীর দরজায়।' কংগ্রেসের বড় মাপের নেতা সুবিমল সেন দীর্ঘ বক্তৃতান্তে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে।

দ্বিধাগ্রস্ত বিপ্রদাস কোনক্রমে বলল, 'তুমি যা বলছো হয়তো তাই ঠিক। আমার নাম মনে পড়ার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'আরে দূর, কৃতজ্ঞ হবার কি আছে। তবে হ্যাঁ, একটা কথাও আমার বলা দরকার। এই মামলায় তুমি বিশেষ কিছু পাবে না, মানে পয়সাকড়ি নেই বলেই ধরে নাও। জানই তো অনেক পরোপকার আমায় করতে হয়। এই মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা সেই রকম একটা নিছক পরোপকার আর কি। এমন একটা বিচিত্র সূত্রে মামলাটা এসে পড়েছে যে না বলতে পারছি না। আর তাই বা কেন, এখন আমার মনে হচ্ছে যে তোমারই প্রয়োজনে এ মামলাটা যেন হাতে এসেছে। পয়সা না পেলেও এ মামলায় প্রচারের অভাব হবে না। আর তোমার

এখন এই প্রচারটুকুই একান্ত প্রয়োজন। এক এক করে দু'জন নামজাদা ব্যারিস্টার ফাকিয়ে এসেছিল হে এই মামলা নিতে। তরুণ পাল আর নীরেন বাঁড়ুজ্জেকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?'

'নাম শুনেছি' মিইয়ে গিয়ে বিপ্রদাস উত্তর দিলে?

'আর ঠিক সেই জন্যেই তোমার নাম হাইকোর্টের একটা বড় কেসেও শোনা যায় না। আরে, ব্যারিস্টারদের পরস্পর বন্ধুত্ব না থাকলে চলে। আলাপ-পরিচয়, আদান-প্রদানের মধ্যেই তো ব্যারিস্টার মহলের যা কিছু মহিমা।......যাই হোক। এখন শোন···মামলার কাগজপত্তর বেশ কিছু দিন পড়াশোনা করে তরুণ পাল হঠাৎ ফাইল ফেরত দিয়ে জানিয়ে গেল যে এ মামলা সে নিতে পারবে না। ছোকরা সবে নাম করছে হে, অথচ এমন একটা সুযোগ মনে হলো বেশ খুসী হয়ে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল নীরেন বাঁড়ুজ্জে। মামলাটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। গত সপ্তাহে সেই নীরেন বাঁড়ুজ্জে গম্ভীর চালে ফাইল আমার টেবিলে রেখে জানালে তার অপারগতা। তিন সপ্তাহ পরে মামলা উঠবে, তাই বাধ্য হয়ে তাকে অনেক অনুরোধ করলাম। তার মুখে এক কথা—এই মামলা করা অসম্ভব। তাহলে এই শেষ সময়ে এ মামলা করবে কে? মনে পড়ল তোমার কথা, আর তাই এই······' বলে টেবিলের ধার থেকে একটা মোটা ফাইল আঙুলের ধাক্কায় তার দিকে সরিয়ে দিলে অ্যাটর্নি সুবিমল সেন।

ফাইলটা তুলে নিয়ে সে বলল, 'বেশ ভারী দেখছি। দুই নামজাদা ব্যারিস্টারের সঞ্চয় অবশ্য কম হবার কথাও নয়, কি বল?' তারপর একমেবা-দ্বিতীয়ম দৈনিক খবরের কাগজের পাশে ফাইলটা গুঁজে মোটা পোর্টফোলিও ব্যাগটা বগলে পুরে, বন্ধুর মুখে একবার স্মিত চোখের দৃষ্টি ফেলে সটান বাইরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল বিপ্রদাস।

'তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলে না তো?' একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল সুবিমল।

'মোটেই না। তুমি তোমার কর্তব্য করেছো এখন আমাকে আমার কর্তব্য করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

'সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিতে কি মনে হয়েছে জান—মনে হয়েছে যে এই মামলার রায় সেশন বসবার আগেই দেওয়া যায়। দোষী নির্ধারণের ব্যাপারে খুনী সামান্যতম সন্দেহ বা সমস্যার অবকাশ রাখেনি। জলের মতন পরিষ্কার ব্যাপারটা, সিদ্ধান্তে পেঁছিতে কোনও বাধাই নেই। কিন্তু প্রধান বাধা হচ্ছে তোমার এই দীপক দত্ত—আসামী স্বয়ং। আর সম্ভবত সেই বাধায় ধাক্কা খেয়েই তোমাব পূর্ববর্তী দুই ধুরন্ধর কাত হয়েছেন।'

'তুমি যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল।'

'বলবার কিছুই নেই। নথিপত্র পড়লে তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে। তবে তুমি যদি তিন সপ্তাহের বেশী সময় চাও, তার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।'

'না, তার প্রয়োজন হবে না। পাত্রে সুরা ঢেলে সাকীর চোখের পানে চেয়ে যারা বসে থাকে তাদের কবি বলে। আইনজীবি হিসাবে আমার কর্তব্য হচ্ছে

করলে বাধিত হব। অসুবিধা থাকলে আমি আপনার নির্ধারিত সময়ে আপনার ঠিকানায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত আছি। অবিলম্বে উত্তরের আশায় রইলাম…

নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানা চিঠি পাঁচখানার খামে লেখা হলো ঃ

(১) মিসেস রুবি দত্ত, রেনবো হোটেল, ১৩নং নিউ এভিনিউ, টালিগঞ্জ, (২) মিসেস রেবা দত্ত, ৭নং দেওদার স্ট্রীট, (৩) ডাঃ বিজন সেন, ৩।১, লেক টেরাস, (৪) ফাদার লরেন্স এবং (৫) ফাদার কোলম্যান—ব্যাপটিস্ট হোম অফ লাইট, রামপুরহাট, বীরভূম।

চিঠি সই করে, খাম মুড়ে বিপ্রদাস বলল, 'ঠিকানা অবশ্য ফাইল থেকে নিয়েছি সুতরাং এর মধ্যে দুএকটা পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক, তুমি যাবার পথে চারখানা চিঠি জি. পি. ও-র ডাকবাক্সে পারলে ফেলে দেবে। রেবা দত্তর রাস্তাটা তো তোমার পার্ক সার্কাসের পথেই পড়বে, চিঠিটা বাড়ির লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে চলে যেও। আর, কাল তোমার স্কুলে ছুটি নেওয়া চলবে ?'

'তা চলবে।'

'তাহলে সকাল সাড়ে আটটায় এখানে চলে আসবে। আমার দেখা পাবে না, হয়তো রাত ন'টার আগে ফিরতে পারবো না। তুমি, আমি না আসা পর্যন্ত থাকবে। টেলিফোনের ডাকে সাড়া দেবে আর অতিথি আসলে অভ্যর্থনা করে বসাবে। পত্রোক্ত পাঁচজনের কেউ ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসলে তোমার কর্তব্য হবে আগামী পরশু যে কোনও সময় আমার সঙ্গে দেখা করার একটা সময় স্থির করা। একদিনের জন্যে রাসুর মার অত্যাশ্চর্য রন্ধনে তোমার রসনা তৃপ্ত করতে হবে।'

'যদি আপনাকে দেবার মতন কোনও জরুরী সংবাদ থাকে ?'

'কিছু করবার নেই। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নাও, উঠে পড়।'

'যদি কিছু মনে না করেন, আচ্ছা এই যে পাঁচজনকে চিঠি লিখলেন, এঁরা কে ?'

'মনে অবশ্য করা উচিত কিন্তু তুমি এই মামলায় আমার জুনিয়র, অতএব উত্তর পেতে পারো।' তারপর মামলার সবকিছু ভূমিকাটুকু শুনিয়ে সে বলল, 'এই পাঁচজনের সাক্ষ্য আমার মামলার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হবে মনে হচ্ছে। অবশ্য এঁরা সহজে সম্মত না হতে পারেন। তাহলেও রাজী করাতেই হবে।'

খামগুলো তুলে নিয়ে অতসী চলে গেল। সে জানে যে শিক্ষক বিপ্রদাস আর ব্যারিস্টার বিপ্রদাস অনেক তফাত। ব্যারিস্টার বিপ্রদাসের মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বের করা যাবে না।

চিন্তার তাড়নায় সে রাত্রে বিপ্রদাসের ভাল ঘুম হলো না। সুবিমল সেনের দেওয়া চুরুট একটার পর একটা পুড়ে ছাই হবার সঙ্গে সঙ্গে পুইয়ে এল রাত্রি। ভোরবেলা সে তার মক্কেলের সঙ্গে সাক্ষাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বেলা এগারোটায় প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে বিপ্রদাস এসে দাঁড়াল আলিপুর জেলের দরজায়। একটু পরেই তাকে দেখা গেল সহকারী জেলার প্রতীপ গুপ্তর সঙ্গে সেলের দিকে অগ্রসর হতে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর প্রতীপ প্রশ্ন করল, '৪১৮নং কয়েদীর ঘর তো?'

'হ্যাঁ।'

'এমন অদ্ভুত কয়েদী আমার জীবনে আমি দেখিনি। একটা কথা যদি বলাতে পারেন তো আপনার ভাগ্য। জেলের দরজা তবু খোলা যায় কিন্তু ৪১৮ নম্বরের মুখ খোলা তার চেয়ে কঠিন।''

তার এই প্রগলভতায় চোখ কুঁচকে তাকাতেই প্রতীপ ভয় পেয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'মানে, এর আগে দু'জন ব্যারিস্টার সাহেব এসেছিলেন কিন্তু সুবিধা করতে পারেন নি। হতভাগা লোকটাকে পাগলা গারদে পাঠালেই পারে। শুনছি যে ওর পক্ষ নেবার উকিল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমার ধারণা তুমি যার কথা বলছো সে 'হতভাগা লোক' নয় এবং আমিই তার উকিল।'

অপ্রতিভ প্রতীপ মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল, বোধহয় ভাবতে ভাবতে যে তার সঙ্গী লোকটি হয় উন্মাদ আর না হয় তো উজবুক।

দরজা খোলা হলে বিপ্রদাস ওয়ার্ডারের পেছনে 'সেলের' ভেতর পা রাখল। পেছনে দরজা বন্ধ হবার অবসরে সে চোখে চশমাটা ভাল করে লাগিয়ে নিল।

সেলের অপর প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে তার মক্কেল। আবছা অন্ধকারে সেই বিরাট মাংসস্তূপ দেখে চমকে উঠল বিপ্রদাস। একমাথা রুক্ষ জটাবদ্ধ চুল আর বিস্তৃত বিস্ফারিত চিবুক সমেত বিরাট সেই মুখমণ্ডল যে কোনও মানুষের হতে পারে, প্রথম দর্শনে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। ভয়ে দু'পা পিছিয়ে এল বিপ্রদাস, মনে হল তার সামনে থাবা মেরে অন্ধকারে বসে আছে কোনও দানব। গরিলার মতন স্ফীত বুক, আজানুলম্বিত লোমশ দুই বাহু, বড় বড় হাতের থাবা আর লোহার মতন আঙ্গুল—সব মিলিয়ে খুনীর জ্বলন্ত প্রতীক বললেও ভুল হয় না। এই ভয়াবহ দেহে যা সবচেয়ে ভয়ংকর সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখ। মূর্তিটা ক্রমশঃ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে দীর্ঘপক্ষ্ম ভ্রূর তলায় মড়ার চোখের মতন দৃষ্টিহীন দুই বিস্ফারিত চোখ, গাল ঠেলে বেরিয়ে আসা হাড়, আর খসখসে শুকনো, পুরু দুটো ঠোঁট। সেই পরিবেশে হঠাৎ দেখলে মৃত একটা পশুর দেহ মনে হয়। কিন্তু তারপরেই কানে আসে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ, যেন একটা হাপর চলে জানিয়ে দিচ্ছে জীবনের অস্তিত্ব। বিপ্রদাসের দীর্ঘ জীবনে এমন একটি কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর সম্মুখীন হবার সৌভাগ্য হয়নি। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে সঙ্গীকে প্রশ্ন করল, 'ও কি সারাদিন এইভাবে বসে থাকে।'

'হ্যাঁ প্রায় সব সময়েই'—জবাব দিল প্রতীপ।

ক্ষণিকের জন্য বিপ্রদাসের সামনে দিয়ে ভেসে গেল সিনেমার আবিষ্কার একাধিক দানবের মূর্তি—ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, কিংকং বা ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড।

'আটটা।'

'উঃ, ভয়ঙ্কর বেলা হয়ে গেছে। বক্তৃতা রেখে শীগগির এককাপ কফি দাও।'

রাতের বিশ্রামে আর একটা সামান্য বিক্ষেপের ঘটনা আছে। টেলিফোন পর্ব সাঙ্গ হবার একটু পরেই এল মিস অতসী রাহা। হঠাৎ চমক ভেঙ্গে তাকে দেখেই বৃদ্ধ ব্যারিস্টার খুশী হয়ে বললেন, 'আর, তুমি এসেছো। দাঁড়িয়ে কেন? বসো ওই চেয়ারটায়।'

'আমি তো মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে আছি। মনে হলো আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। শরীর ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল আছে। কন্যার আমার একটুতেই ভাবনা।'

অতসী অবশ্য বিপ্রদাসের কন্যা নয়, কোনও আত্মীয়ই নয়। পূর্ববঙ্গের মেয়ে অতসী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম. এ. পাশ করেছে। দেশ বিভাগের ফলে সর্বস্ব হারিয়ে বিধবা মা আর চারটি ভাইবোন নিয়ে আস্তানা খুঁজে নিয়েছে কলকাতায়। এখানে আসার পর স্কুলে মাস্টারি আর একাধিক টিউশানি করতে করতে সাফল্যের সঙ্গে আইন পাশ করেছে। হাইকোর্টে বেরোবার আগে এখন সে থিসিস্ লিখছে। আর এই থিসিস্ লেখার সূত্রেই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তার বিপ্রদাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বিপ্রদাসের নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য সহজেই অতসীকে আকৃষ্ট করেছে। অতসীর স্নেহ-মধুর ব্যবহার, তার জীবনকে সহজভাবে গ্রহণের প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়েছে বিপ্রদাস। ধীরে ধীরে দু'জনের মাঝে গড়ে উঠেছে স্নেহের বন্ধনে, সমমর্মিতার স্পন্দনে, আত্মার আত্মীয়তা।

অতসীর স্থির সিদ্ধান্ত যে সে থিসিস্ লেখা শেষ করেই হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস শুরু করবে, ওকালতিই হবে তার জীবনের পেশা। আর এইখানেই বিপ্রদাসের আপত্তি। জীবনের অনেক ক্ষয় আর ক্ষতি দিয়ে সে বুঝেছে যে আইনের ব্যবসা একটা মস্ত জুয়াখেলার সামিল। ভাগ্য যার খুলে যায় সে, খেলায় অবশ্যই জয়-লাভ করে আর জয়লাভের অর্থ বাড়ী, গাড়ী, সম্মান, সম্পদ—এককথায় ঐহিক সব সুখ আর সুবিধা। কিন্তু যে হারে সে একেবারে হারিয়ে যায়, হারিয়ে যায় দৈন্যের দীর্ঘ পথে অসংখ্য দুঃখপীড়িত মানুষের ভীড়ে। অতসীর মতন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে কেন বরণ করবে এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। হয় সে বিয়ে করে ঘর বাঁধুক—তার মতন মায়েদের প্রয়োজনই আজ সর্বাধিক। নিজের স্বাধীনতা যদি কিছুটা বজায় রাখতে চায় খুঁজে নিক ভাল কোনও কলেজে অধ্যাপিকার পদ। দুটোই তার পক্ষে সহজলভ্য, দুটোতেই আছে আদর্শের স্বীকৃতি। বার বার তার এই মত অতসীকে বলেছে বিপ্রদাস, বুঝিয়ে দিয়েছে যে হাইকের্টের অলিগলির সন্ধান তার মতন আর কেউ জানে না কারণ সে অনেক মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করেছে এই অমূল্য অভিজ্ঞতা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর অতসী শুনেছে আর দুলেছে আশা ও আকাঙ্ক্ষার দোলায়। কিন্তু তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়নি।

পরিবর্তন হয়নি দু'জনের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির। দিনের পর দিন আত্মীয়তা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বিপ্রদাসের সব বক্তৃতার আড়ালে একটি স্নেহসিক্ত অন্তর অতসীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই সে বিনা

স্বিধায় এই বয়স্ক বন্ধুর ছোটখাট সুখ-সুবিধা অভাব-অভিযোগের ভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। রাস্র মার পর সেই একমাত্র নারী যে বিপ্রদাসের অন্দরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। পেয়েছে সদর দরজার বাড়তি চাবি, এবং অতসী নিজের গুণে অন্দর থেকে আরও এগিয়ে স্থান করে নিয়েছে এই পিতৃসম মানুষটির অন্তরে। বিপ্রদাসও অতসীকে পেয়ে যেন নতুন জীবন পেয়েছে। অপরিসীম আগ্রহে সে নিজের পাণ্ডিত্য উজাড় করে দেয় এই তীক্ষ্ণধী, নিষ্ঠাবতী, নিরভিমানী মেয়েটির থিসিস লেখার সাহায্যে। শিক্ষকের আগ্রহ এবং আন্তরিকতা দেখে অতসী আগে দু'একবার যুক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। মনে হয়েছে প্রৌঢ় ব্যারিস্টারের এই অত্যধিক মনোযোগ অনুরাগের পূর্বলক্ষণ নয়তো! কিন্তু পরক্ষণেই সে ধরেছে বিচার এবং বিশ্লেষণের পথ। তীব্র অনুভূতি দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে এই দার্শনিক মানুষটির অন্তরের স্বরূপ। আশৈশব নারীর স্নেহস্পর্শ না পেয়ে প্রৌঢ় বিপ্রদাসের মনে জন্ম নিয়েছে বিশ্বের সব নারীর প্রতি এক বিচিত্র বৈরাগ্য। মনের সব নরম অনুভূতি জমাট বেঁধে যেন তার অন্তরে নিয়েছে একটি নিটোল দ্যুতিময় মুক্তার রূপ। তাই হাইকোর্টের দু চারজন মহিলা ব্যারিস্টার বা উকিল, যাদের নাম শুনতেও সে বিরক্ত হয়, তাদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিন্তু কৌতুকহাস্যে বলে,'ওদের কথা আর বোলো না। এমন সওয়াল করে যে জজ হয় বিরক্ত হন আর নয়তো দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েন। মামলার রায়ের ব্যাপারে দুটোই মারাত্মক।'

সেদিন অতসী চেয়ার টেনে বসতেই বিপ্রদাস বলল, 'আজ তোমার থিসিসের আলোচনা একটু বন্ধ থাক। তুমি বরঞ্চ আমাকে সাহায্যের আয়োজন কর। টাইপ-রাইটারটা খুলে কাগজপত্তর বানিয়ে নাও, পাঁচখানা চিঠি টাইপ করতে হবে।'

'নতুন কোনও মামলা বুঝি?' টাইপরাইটার খুলে বসতে বসতে জিগগেস করল অতসী।

'শুধু মামলা নয়। খুব জমজমাট মামলা। এরপর তুমি আমায় দেখতে পাবে হাইকোর্টের সেশনে। টেবিলের ওপর ওই মোটা ফাইলটা দেখছো, ওরই মধ্যে আছে আমার মক্কেলের মামলা—সেই মক্কেল, যাকে খুনের অভিযোগ থেকে বাঁচাবার ভার পড়েছে আমার ওপর। মামলাটা সত্যিই জটিল, মানে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে এর জটিলতার পরিমাপ করতে পারছি না। আর সবচেয়ে যেটা সাংঘাতিক, সেটা হচ্ছে মক্কেলের স্বপক্ষ সমর্থনে অনিচ্ছা। অর্থাৎ আসামী হয়তো দোষ স্বীকার করে বসবে আর আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করবো যে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ—ফলে মক্কেলের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ অনিবার্য। আচ্ছা, এইবার টাইপ শুরু কর।'

বিপ্রদাসের ইংরাজী চিঠির তর্জমা করলে দাঁড়ায়ঃ

গত ৫ই মে 'জলযাত্রা' জাহাজে মিঃ রবার্ট বিচাম-কে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত শ্রীদীপক দত্তর বিচার আগামী ২০শে নভেম্বর হাইকোর্টের সেশনে শুরু হবে। আমি আসামী পক্ষ সমর্থনের ভার নিয়েছি। এই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি আপনার দর্শনপ্রার্থী। অনুগ্রহপূর্বক পত্রপাঠ আমার উপরোক্ত ঠিকানায় দেখা

যারা বীর্যবান, বলশালী পুরুষের বন্ধনে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে সার্থক হতে চায়। আমার যতদূর মনে হয় এর স্ত্রী শুধু তম্বী তরুণী নয়, কালিদাসের ভাষায় যাকে বলে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। বিপরীতের প্রতি আকর্ষণের যে শাশ্বত নিয়ম তা এই ক্ষেত্রে কার্যকরী না হবার কোনও কারণ নেই।'

চাবির আওয়াজে চমক ভেঙ্গে দেখল প্রতীপ 'সেল'-এর ফটক খুলে বের হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, চল এবার যাওয়া যাক্। আমি আগামী কাল আবার আসবো এবং সঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসবো। আচ্ছা আর এক মিনিট। আমি ওর খুব কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াতে চাই যাতে ও ঘ্রাণের মাধ্যমে আমায় ভালভাবে চিনে নিতে পারে, আগামী কাল মুখোমুখি হলেই যেন চিনতে পারে।'

এই বলে বিপ্রদাস নির্ভয়ে তার মক্কেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে দাঁড়াল। দীপক দুই হাত পিছনে গুটিয়ে, দেয়ালে ঠেসান দিয়ে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রইল, অনুভূতির সামান্য রেখাও তার মুখে পড়ল না।

'আজ ওর মেজাজ বিগড়ে গেছে। দেখা যাক আগামী কাল কি হয়', সখেদে এই কথা বলে প্রৌঢ় ব্যারিস্টার সেলের বাইরে এসে দাঁড়াল। জেলের প্রশস্ত চত্বর মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতে পার হচ্ছিল সে। প্রতীপ হঠাৎ বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন স্যার। মামলাটা এর পরেও কি আপনি হাতে রাখবেন ?'

'নিশ্চয়ই', একটু হেসে সে উত্তর দিল।

'পশুটার ভাগ্য সত্যিই ভাল···'

প্রতীপের এই মন্তব্যে তার অন্তরের চিন্তাটা যেন খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে এল। সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ, আকৃতি দেখলে তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আকৃতি দিয়ে কতটুকু চিনতে পারি আমরা মানুষকে। আর এক্ষেত্রে আমরা বিচার করছি এমন একজন মানুষকে যে আমাদের দেখতে পায় না, আমাদের কথা শুনতে পায় না, বলতে পারে না আমাদের তার মনের কথা। ওর কাছে আমরা এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। ওকে বুঝতে গেলে বসতে হবে গিয়ে ওরই জগতে আসন পেতে। আমার একমাত্র চেষ্টা ওর জগতের রহস্য-আবরণ অপসারণ করা। তাহলে হয়তো দেখা হবে ওর স্বরূপ, শোনা যাবে ওর অন্তরের কান্না—কেউ ওকে চিনলো না এই দুঃখে কাঁদছে ওর নিপীড়িত মানবাত্মা। ও নিজের পক্ষ সমর্থন করতে চাইছে না বলেই আমার পক্ষে ও হয়ে দাঁড়িয়েছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। যাই হোক, চলো তোমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

জেলের প্রবীণ সুপার অমায়িক হাস্যে বিপ্রদাসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'কেমন দেখলেন আপনার মক্কেলকে ?'

'মন্দ কি !' হেসে বলল বিপ্রদাস, 'আজ ওর মন ভাল নেই কিন্তু আগামী কাল হয়তো অবস্থার উন্নতি হতে পারে। আর সেই জন্যেই আমি আপনার সাহায্য চাই। ওর খাবার ব্যবস্থা একটু ভাল করা প্রয়োজন। মানে, জেলের বরাদ্দ

ব্যবস্থার বদলে একটু সুস্বাদু, মুখরোচক কিছু আর কি।'

'দেখুন আইন আমার হাত বেঁধে দিয়েছে। তবে বাইরে থেকে কোনও খাদ্য কেউ উপহার হিসাবে পাঠালে সেটা ওকে দেবার হুকুম আমি করিয়ে নিতে পারি।'

'এর আগে এরকম কোনও উপহার নিয়ে ওর সঙ্গে কেউ কি দেখা করতে এসেছে?'

'না, সেরকম কেউ আসেনি।'

'খুব আশ্চর্য তো! ওর বহু আত্মীয়-স্বজন তো এই শহরেই রয়েছেন!'

'আমিও সেই রকম শুনেছি বটে।'

'সবার কথা ছেড়ে দিলেও ওর মা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি ছেলেকে একবারও দেখতে আসেননি?'

'কই মনে তো পড়ে না।'

'তাছাড়া ওর বোন ভগ্নীপতি সকলেই রয়েছেন···অথচ।'

হয়তো আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে একজন খুনীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে রাজী নয়। ধরে নিতে পারি শিশুকাল থেকে বিকলাঙ্গ দীপক অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনকে। এখন সুযোগ পেয়ে তাঁরা ওকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো ওর ফাঁসী হলে আত্মীয়-স্বজনরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।'

'কিন্তু ওর স্ত্রী?'

'আপনি কি জানেন না যে জাহাজ থেকে নামার পরই ওর স্ত্রী গা ঢাকা দিয়েছেন?'

'কিন্তু এই অন্তর্ধানের কারণ কি? এ কথা সকলেই জানে যে খুনের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যার সঙ্গে যাপন করেছে সেই স্বামীকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে স্ত্রী গা ঢাকা দেবে—এ ঘটনা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।'

'আমার কিন্তু আশ্চর্য হবার বয়স চলে গেছে!'

'তা যা বলেছেন। যাই হোক, আমি কিছু খাবার আজই পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। কিছু ডিম, কেক, সন্দেশ এই আর কি। দয়া করে আপনি ওকে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে মনের মতন খাবার পেলে আজ রাতে ওর ভাল ঘুম হবে। আর তাহলেই আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে আলাপে ও আপত্তি করবে না।'

'আপনি ওর সঙ্গে আলাপের পদ্ধতি জানেন তাহলে।'

'না না, আমি জানিনা। বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করতে হবে; ওর বাল্যের কোনও শিক্ষককে পেলে সবচেয়ে সুবিধে হয়। আচ্ছা এখন আসি। আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ!'

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল বিপ্রদাস। সুপারের কাছে সরে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'দেখুন, আর একটা ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে হবে। ব্যাপারটা আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ওয়ার্ডার ইত্যাদিকে বলে

কিন্তু এর তুলনায় প্রত্যেকটাই হলো নিতান্তহাস্যকর। সংগে সংগে সে আবার প্রশ্ন করল, 'ও কি আমাদের উপস্থিতি জানতে পেরেছে ?'

'নিশ্চয়ই', প্রতীপ উত্তর দিল, 'সব ও বুঝতে পারে। অন্ধ, কালা আর বোবা একটা মানুষ এত খুঁটিনাটি জিনিস কি করে বোঝে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।'

'কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না' বলল বিপ্রদাস। 'যে এই লোকটি খুব বুদ্ধিমান এবং উচ্চশিক্ষিত। এমন কি এ একটা বইও লিখেছে।'

'কে যেন বলছিল মনে হচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করি নি।'

'আচ্ছা আমি তোমায় একখানা বই এনে দেবো। এখানে তো পড়বার অনেক সময় দেখছি।' রহস্যচ্ছলে বলল বিপ্রদাস।

'কিন্তু লিখলো কি করে ?' প্রতীপের তখনও বিস্ময় কাটেনি।

'কেন দৃষ্টি, শ্রুতি আর বাক্ যে তিনটে ইন্দ্রিয় নেই তার পরিবর্তে স্পর্শ, আস্বাদ আর ঘ্রাণ—যে-তিনটে আছে তাই ব্যবহার করে। অবশ্য ব্যাপারটা বোঝা খুব সহজ নয়...'

'আমি কিন্তু একটু একটু বুঝতে পারছি। আমাকে এবং অন্যান্য ওয়ার্ডারদের প্রায় সকলকেই ও চেনে, চেনে আমাদের গায়ের গন্ধ দিয়ে। আমি যে ঘরে এসেছি ও তা বুঝতে পেরেছে।'

'আচ্ছা ওর খিদে কেমন ?'

'দেহের তুলনায় সামান্যই। তবে এখানকার খাওয়াও তেমন সুবিধের নয়।'

'হাত দিয়ে খায় না ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে ?'

'ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে এবং নির্ভুলভাবে করে। তবে অধিকাংশ দিন খাবার ছোঁয়ই না। দেখলেই মনে হয় বেচারীর কাছে এই জেলের জীবন চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের চেয়েও দুর্বহ।'

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু তাহলে যারা ওর অভিব্যক্তি বোঝে তাদের কারুকে কাছে পাবার কোনও আগ্রহ ভাবভংগীতে প্রকাশ পেত। ওর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?'

'আজ পর্যন্ত একাধিক বিখ্যাত সব ডাক্তার দেখেছেন এবং প্রত্যেকেই বলেছেন যে ও সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'তাঁরা বুঝলেন কি করে ?'

'কেন, তাঁরা ওর সংগে আঙ্গুল স্পর্শ করে ভাব আদান-প্রদান করতে পারে এমন লোক সংগে এনেছিলেন।'

'সেই লোকেরা কি বললে ?'

'বললে যে ও ইচ্ছে করে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না। ও নাকি মামলায় নিজের পক্ষ সমর্থনে সম্মত নয়।'

ঠিক এই সময় দীপক দেয়াল ঘেঁষে উঠে দাঁড়াল, ভাবটা যেন কোনও আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। দুই দর্শকের চেয়ে তার দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় এক ফুট বেশী।

'উঃ, এ সত্যিই একটা দৈত্য' বিপ্রদাসের মুখ থেকে আপনিই খসে পড়ল এই

মন্তব্য : 'আর কি পালোয়ানের মত সব দেহের পেশী। একটা লোককে মারবার জন্যে তো এর দুটো আঙ্গুলের চাপই যথেষ্ট। আচ্ছা ও অমন করে দুলছে কেন ?'

'ওটা ওর স্বভাব। খাঁচায় পোরা গরিলাগুলো ঠিক এমনি করে দাঁড়িয়ে দোলে। দেখুন, দেখুন স্যার, ও আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। কি রকম জোরে জোরে শুঁকছে দেখছেন না! না, না, এগিয়ে যাবেন না…'

তার কথা না শুনে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল বিপ্রদাস। দীপকের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে তার হাতে নিজের ডান হাতের আঙ্গুল দুটো ছোঁয়াল। কেমন যেন কুঁকড়ে উঠল দীপকের দেহ, অবাঞ্ছিত স্পর্শে যেমন হয়। গ্রাহ্য না করে বিপ্রদাস পরক্ষণেই তার মুখের ওপর হাত রাখল।

'পেছিয়ে আসুন স্যার, পেছিয়ে আসুন', পেছনে চীৎকার করে উঠল প্রতীপ। কিন্তু সাবধান হবার আগেই বজ্রের মতন নেমে এল দীপকের দুই থাবা।

সাঁড়াশির মতন তার আঙ্গুলগুলো চেপে বসলো বিপ্রদাসের গলার চারপাশে। জোরে আরো জোরে। চকিতে এগিয়ে এসে প্রতীপ কয়েদীর মাথায় বসিয়ে দিল ভারী লাঠির আঘাত। তীক্ষ্ন আর্তনাদ তুলে কয়েদী লুটিয়ে পড়ল দেয়ালের পাশে।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বিপ্রদাস ঝুঁকে পড়ল তার চশমাটা কুড়িয়ে নেবার জন্য। প্রতীপ তখন বলে চলেছে, 'আমি আপনাকে বললাম, শুনলেন না। ও একটা হিংস্র পশু।'

বক্তার দিকে চেয়ে সামান্য একটু হেসে বিপ্রদাস আবার এগিয়ে গেল তার মক্কেলের দিকে। এবার সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই দানবতুল্য মানুষটির আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখে নিল। তারপর নিজের মনেই বললো, 'আমার দুই ব্যারিস্টার বন্ধুর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি কেন দু'জনেই এই মামলা প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন মক্কেলের মামলা নেওয়ার বিপদ কম নয়! অথচ বিপদ আছে বলেই মামলাটা আমার ভাল লাগছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন এই লোকটা যারাই তার উপকার করতে চায় তাদেরই আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর ? আমি এর কোনও ক্ষতি করিনি, তবুও কেন অন্যদের মতনই আমার প্রতি এ এত বিরূপ ? কি করে, কি করে ওকে বোঝানো যায় যে আমি ওকে সাহায্য করতে চাই…?'

'ও কারুর সাহায্য চায় না স্যার। এই তো প্রথম নয়, এর আগেও চেষ্টা হয়েছে,' অস্পষ্ট শেষ মন্তব্যটা শুনে ফস করে বলে ফেলল প্রতীপ। বিপ্রদাসের দিকে চেয়ে তার মনে হলো কথাগুলো ভদ্রলোকের কানে যায় নি।

'আমার মনে হয় তারা ঠিক পথ ধরতে পারে নি,' তার চিন্তার ছিন্নসূত্র গুছিয়ে নিয়ে নিজের মনে বলে চলল বিপ্রদাস, 'তিনি প্রধান ইন্দ্রিয়ের অভাব সত্ত্বেও লোকটাকে সব মিলিয়ে সুদেহী শক্তিমান পুরুষ বলা যায়। আকৃতি রুক্ষ হলেও যৌবন যেন উপচে পড়েছে ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশাল কিন্তু সব মিলিয়ে সুষম। এই পুরুষকে ভালোবাসা কিছুই অসম্ভব নয়, বিশেষত সেই সব নারীর পক্ষে

দিতে হবে যে ওরা যেন আমার মক্কেলকে একটা পশু না ভাবে এবং ওর সঙ্গে সেই ভাবে ব্যবহার না করে। মামলার রায় যতক্ষণ বার না হচ্ছে ততক্ষণ ওকে খুনী ভাবাও অন্যায়। আমার মতে ও সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আমি চাই যে সকলে ওকে সেই দৃষ্টিতেই দেখবে। দীপক দত্ত একজন অসাধারণ আসামী এবং সবচেয়ে অসাধারণ হচ্ছে ওর তীক্ষ্ন অনুভূতিপ্রবণ অন্তর। আজই আমি সেই অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। আমি ওর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ওর মুখে হাত রেখেছিলাম। উত্তরে ও চক্ষের নিমেষে আমার গলা টিপে ধরল, হয়তো হত্যাই করতো। আমি ওর হাত থেকে মুক্তি পেলাম···কিন্তু আঘাত পেয়ে আমায় ছেড়ে দেবার পূর্ব মুহূর্তে ওর সেই মর্মন্তুদ চীৎকার এখনও আমার কানে বাজছে। শ্বাসবন্ধ পশুর ঘৃণায় বিষাক্ত, ভয়ে বিকৃত আর্তনাদ বেজে উঠেছিল ওর কণ্ঠে। পশুর মতো সেই ঘৃণার একমাত্র লক্ষ্য ওর আবাল্য শত্রু মানুষ। কিন্তু দীপক পশু নয়, মানুষ। তাই ওর আর্তনাদে মিশে ছিল ওর আত্মার কান্না। সে কান্নার সুর আমি শুনেছি। অপমানে অবহেলায় জর্জরিত হয়ে কাঁদছে ও—হয়তো কাঁদছে আরও কোনও ব্যথায়, যে ব্যথার হদিস আমরা জানি না। কিন্তু সম্ভবতঃ সেই উৎসেই নিহিত আছে এই হত্যার রহস্য। পশুর আকৃতির আড়ালে বসে ব্যথায় বেদনায় চোখের জল ফেলছে একজন মানুষ—এই উপলব্ধিতেই দেখছি আমার প্রকৃত সমস্যার শুরু।' একটু হেসে সুপারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল বিপ্রদাস।

দু'ঘণ্টা বাদে তাকে দেখা গেল কলেজ স্ট্রীটের এক বইয়ের দোকানে। পরিচিত দোকানের মালিক তাকে দেখেই হেসে বললেন, 'আবার পুরোনো কোনও পুঁথি চাই বুঝি?'

'না, এবার পুঁথি নয় বরঞ্চ তার বিপরীত। একখানা হালের উপন্যাসের খোঁজ করছি, কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। আপনার দোকানে তো সব রকম বই থাকে। দেখুন তো 'নির্বাসিত আত্মা' বলে কোনো উপন্যাসের হদিস মেলে কি না।'

'খবরের কাগজ থেকে নামটার হদিস পেয়েছেন মনে হচ্ছে। সম্প্রতি একটা খুনের আসামী হিসাবে বইটার অন্ধ-কালা-বোবা লেখককে নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। মূল বইটা ইংরেজিতে লেখা, পরে বাংলা অনুবাদ বার হয়।'

'তাই না কি? একাধারে সাহিত্যিক এবং খুনী অথচ তার উপন্যাস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

'প্রথম সংস্করণ শেষ হবার পর বাংলা বইটার কোনো নতুন সংস্করণই বার হয়নি।'

'কবে বার হয়েছিল প্রথম সংস্করণ?'

খাতা উল্টে দেখে মালিক বললেন, 'তা প্রায় পাঁচ বছর হবে।'

'খুব অল্প বয়সের লেখা মনে হচ্ছে। কি রকম নাম করেছিল বইটা?'

'যতদূর মনে পড়ছে সমালোচকরা সুখ্যাতি করেছিলেন। তবে বই বিক্রী হয়েছিল প্রধানতঃ লেখক সম্বন্ধে কৌতূহলের তাগিদে। আমি পড়েছিলাম বইটা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি মানবাত্মার অপূর্ব উদ্‌ঘাটন পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু বইটা যাকে বলে জনপ্রিয় হয়নি। নাটক নেই, চমক

নেই, প্রেম নেই, পরিচিত জীবনের আভাস নেই—এমন উপন্যাস কি করে জনপ্রিয় হবে বলুন। আমার একখানা কপি আছে। ভাল বই এক কপি আমি আলাদা করে রাখি। আপনার একান্ত প্রয়োজন থাকলে সেখানা দিতে আপত্তি নেই। অবশ্য বইখানার ইংরেজী সংস্করণ পেলেও পেয়ে যেতে পারেন। বিলেতে শুনেছি বইখানার খুব নাম। আর তারই ফলে লেখক নাকি সেখানে অন্ধ-কালা-বোবাদের সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পান। ওই উপন্যাসের পর আর একটা অক্ষরও লেখেননি লেখক—না ইংরেজি না বাংলায়।'

'আশ্চর্য ব্যাপার বটে।' মুখে এই কথা বলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিপ্রদাস। ইতিমধ্যে মালিক বইখানা বার করে নিয়ে এলেন। চমক ভেঙে আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল সে। একটু ময়লা মলাটের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ওপরটা তো বেশ সুন্দর দেখছি। ভেতরে অর্থাৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তুটা কি বলুন তো?'

'অনেকদিন আগে পড়েছি। তবে যতদূর মনে পড়ছে এর নায়ক লেখকের মতই অন্ধ-কালা এবং বোবা। নায়ক ভালবাসল একটি মেয়েকে। কিন্তু মেয়েটি তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। বিরহের আগুনে পুড়তে পুড়তে ধীরে ধীরে নায়ক সৃষ্টি করল তার নিজস্ব জগৎ, বরণ করল সেখানে স্বেচ্ছানির্বাসন।'

ঘণ্টাখানেক বাদে বিপ্রদাস বাস থেকে নেমে হনহন করে হেঁটে চলল আলিপুরের জাতীয় পাঠাগারের পথে। পাঠাগারে ঢুকে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ক্লান্ত পথিক অনেক পথ হেঁটে যেমন বাঁচে নিজের বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে। এখানে সব নিয়ম তার নখদর্পণে। সকলেই পরিচিত। চটপট ব্যবস্থা করে সে আনিয়ে নিল ৬ই মে থেকে ১৪ই মে তারিখের খানচারেক বিখ্যাত সংবাদপত্রের ফাইল। তারপর শুরু হলো একটার পর একটা কাগজে দীপক দত্তর গ্রেপ্তার ও অপরাধের বর্ণনা পড়া। বর্ণনা কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও দীর্ঘ, কোথাও বা নানা মন্তব্যে কণ্টকিত। ওরই মধ্যে একটা কাগজের খবর বেশ পছন্দ হলো। বড় হেডলাইন 'জলযাত্রা' জাহাজে বীভৎস হত্যাকাণ্ড এবং তারই তলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

'৬ই মে তারিখের তারবার্তা—গতকল্য বিকালে লণ্ডন হইতে কলিকাতাগামী 'জলযাত্রা' জাহাজে ইংরাজ যাত্রী মিঃ রবার্ট বিচাম তাঁহার কেবিনে খুন হইয়াছেন। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক মিঃ বিচাম ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রবীণ সদস্য মিঃ হেনরী বিচামের একমাত্র পুত্র। ওই জাহাজেই প্রথম শ্রেণীতে যাত্রী ছিলেন শ্রীদীপক দত্ত ও তাঁর স্ত্রী।

'অন্ধ-মূক এবং বধির দীপক দত্ত কয়েক বৎসর পূর্বে "নির্বাসিত আত্মা" উপন্যাস লিখিয়া আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উপন্যাসটির ইংরাজী সংস্করণ বিলাতে বিশেষ সাড়া তুলিয়াছিল।

'ইংলণ্ডের এক সংস্থার উদ্যোগে একাধারে অন্ধ-মূক এবং বধিরদের সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য শ্রীদত্ত পাঁচ বৎসর পূর্বে তথায় গমন করেন। গত পাঁচ বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে তিনি বক্তৃতা এবং অধ্যাপনা করিয়াছেন।

সঙ্গে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী। বস্তুতঃ স্ত্রীর সাহচর্যে এবং সাহায্যেই শ্রীদত্তের এই ভ্রমণ সার্থক হইয়াছিল।

'জাহাজে দুপুরে আহারের পর শ্রীমতী দত্ত প্রত্যহই স্বামীর বিশ্রামের অবসরে ডেকে পায়চারি করিতেন। ঘটনার দিন ডেক হইতে কেবিনে ফিরিয়া দেখেন যে স্বামীর শয্যা শূন্য। অবিলম্বে স্বামী ফিরিতে পারেন এই আশায় তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। শেষে হতাশ হইয়া স্বামীর খোঁজে বাহির হন এবং জাহাজের কোষাধ্যক্ষকে জানান। সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ-সংকেত বাজানো হয় কারণ অন্ধ-মূক বধির শ্রীদত্তের পক্ষে সমুদ্রে পতিত হওয়ার ভয় ছিল।

'জাহাজে খোঁজ শুরু হয়। সর্বোচ্চ শৌখীন শ্রেণীর কেবিনের তত্ত্বাবধায়ক খোঁজ করিতে করিতে মিঃ রবার্ট বিচামের কেবিনের দরজা সামান্য খোলা দেখিতে পান। দরজা খুলিবার চেষ্টায় অপরপ্রান্তে কোনও বোঝার ভার বাধা সৃষ্টি করে। জোর ধাক্কা দিলে দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়, চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে এক বীভৎস দৃশ্য—দরজার হাতলে হাত, মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া ঝুঁকিয়া আছে তরুণ যাত্রী মিঃ রবার্ট বিচামের মৃতদেহ। তাঁহার ঘাড় হইতে রক্তের ধারা নামিয়াছে —পায়জামা রক্তে সিক্ত, কার্পেটের সর্বত্র রক্তের দাগ। মিঃ বিচাম খুন হইয়াছেন। ভয়ার্ত চোখ তুলিতেই তত্ত্বাবধায়ক দেখিলেন কেবিনের অপর প্রান্তে বসিয়া আছেন নির্বাক, নিস্পন্দ, পঙ্গু শ্রীদীপক দত্ত। তাঁহার রক্তাক্ত হাত দৃষ্টিহীন চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, মনে হয় যেন ভাবলেশহীন সেই চক্ষুতেও ভয়ের রেখা ভাসিয়া উঠিয়াছে। তত্ত্বাবধায়কের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে আসেন কোষাধ্যক্ষ। পরে দীপক্ষ দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজের খোলে আটক রাখা হয়। গ্রেপ্তারের সময় শ্রীদত্ত বিন্দুমাত্র বাধা দেন নাই। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে কিছু জেরারও চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেনের অনুরোধে শ্রীমতী দত্ত স্বামীর সঙ্গে বিশেষ পদ্ধতিতে বাক্য বিনিময়ের চেষ্টা করেন। জাহাজে একমাত্র শ্রীমতী দত্তই অন্ধ-মূক-বধির মানুষের সঙ্গে আলাপের বিশেষ পদ্ধতি জানিতেন।

'স্ত্রীর মাধ্যমে শ্রীদত্তের প্রথম এবং শেষ কথা: আমি খুন করেছি এবং যা করেছি ঠিকই করেছি। এই সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতির পুনরুক্তি ছাড়া আর একটি কথাও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

'খুনের উদ্দেশ্য জানা যায় নাই। ইহা বিশেষ রহস্যাবৃত মনে হয়, কারণ শ্রীমতী দত্তের জবানবন্দীতে জানা যায় যে তাঁহার বা তাঁহার স্বামীর সহিত নিহত মিঃ বিচামের বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না, এমন কি তাঁহারা এই ইংরাজ তরুণের নামও শুনেন নাই। শ্রীদত্তকে পরীক্ষান্তে জাহাজের চিকিৎসক তাঁহার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন।

'জাহাজ কলিকাতা বন্দরে ভিড়িলেই শ্রীদীপক দত্তকে স্থানীয় পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।'

ওই একই কাগজের ১৪ তারিখের সংখ্যায় পাওয়া গেল গ্রেপ্তারের বিবরণ: 'জলযাত্রা' জাহাজ কলিকাতা বন্দরে লাগিবামাত্র পুলিশ মিঃ রবার্ট বিচামকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত শ্রীদীপক দত্তের ভার গ্রহণ করে। পুলিশের একজন পদস্থ

কর্মচারী অন্ধ-মূক-বধির মানুষের সঙ্গে আলাপে বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞের মারফত শ্রীদত্তকে জেরার চেষ্টা হয়। এ ক্ষেত্রেও শ্রীদত্তের প্রথম এবং শেষ কথা ঃ আমি খুন করেছি এবং যা করেছি ঠিক করেছি।' এই অত্যাশ্চর্য আসামীকে জেলে প্রেরণের পূর্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, উদ্দেশ্য আসামীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া। তিন প্রধান অঙ্গের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া না কি কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়।'

পড়া শেষ করেই উঠে পড়ল বিপ্রদাস। কোনও কিছুর 'নোট' নেওয়া তার অভ্যাস নয়; প্রয়োজনীয় যা কিছু তা সে জমা করে রাখে তার মস্তিষ্কে। বাসে বসে চোখ বুঁজে চিন্তামগ্ন হলো বিপ্রদাস। দীপকের সুস্থতা সম্বন্ধে একাধিক চিকিৎসকের অনুকূল মত সে মামলার ফাইলে পেয়েছে। সেই দীপকই খুনের পর থেকে অসংখ্য জেরার উত্তরে বলেছে মাত্র কয়েকটি কথা ঃ জাহাজে খুন আমি করেছি; সব জেনেশুনে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে করেছি; যা করেছি তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই এবং জীবনে জাহাজের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে মিঃ বিচামকে ওই একইভাবে আবার খুন করতে দ্বিধা করব না।'

কিন্তু জাহাজের সেই ঘটনা, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে খুনের উদ্দেশ্য—সেটা কি? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল বিপ্রদাস।

রহস্যের আকাশে মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু একটি নিভৃত তারার মতো একান্তে জ্বলছে তার একান্ত বিশ্বাস যে দীপকের ওই পশুর দেহের মধ্যে আছে সম্পূর্ণ একটি মানুষের আত্মা। হয়তো 'আত্মা' কথাটার প্রয়োগ এক্ষেত্রে ভুল; কিন্তু সব বাদ দিয়েও এই মানুষটির মধ্যে অসামান্য বুদ্ধির আলোয় দীপ্ত, প্রবল ইচ্ছা-শক্তি সমন্বিত একটি মনের অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে দীপক দত্তের বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব নয়। তাই সন্দেহ হয় প্রকৃত দীপক দত্তকে জানা, তার অন্তরের আকুতি হৃদয়ঙ্গম করা কি কারুর পক্ষে কোনওদিন সম্ভব হবে। আশা আছে যে দীপকের আত্মীয়স্বজন বিশেষতঃ তার মায়ের সঙ্গে দেখা হলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। তার শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ হলেও অনেক রহস্য অপসারিত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার স্ত্রী রুবি দত্তকে। এই মামলায় রুবি দত্তই হবে তার সবচেয়ে বড় সহায়। কিন্তু কেন এখনও লুকিয়ে আছে রুবি দত্ত? আবলম্বে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

সার্কুলার রোডে কালা-বোবাদের শিক্ষায়তনে বিপ্রদাস যখন ঢুকল তখন বেলা বেশ গড়িয়ে এসেছে। আগমনের উদ্দেশ্য শুনে শিক্ষায়তনের প্রধান তাকে সাদর আপ্যায়ন জানালেন। চেয়ারে বসে দু'চার কথার পর বিপ্রদাস বলল, 'আপনার এখানে অন্ধ-কালা-বোবা কোনও ছাত্র কখনও এসেছে কি?'

এটা কালা-বোবাদের স্কুল, অন্ধ ছাত্রের জন্য বেহালায় আলাদা স্কুল আছে। আমাদের স্কুলের পদ্ধতির সঙ্গে বেহালার স্কুলের পদ্ধতির মিল নেই। থাকতেও পারে না কারণ কালা-বোবা ছাত্রদের প্রধান সম্পদ তাদের দৃষ্টি আর অন্ধ ছাত্রদের

শিক্ষার প্রধান সহায় হচ্ছে কথা বলার এবং শোনার শক্তি।'

'তাহলে যে শিশু তার তিন ইন্দ্রিয়—দৃষ্টি, বাক্ এবং শ্রবণ, তিন শক্তিই হারিয়েছে তার কি হবে?'

'বাকী তিন ইন্দ্রিয়—স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ এই তিন শক্তির সাহায্যে তার শিক্ষার প্রচেষ্টাও হচ্ছে।'

'সে প্রচেষ্টায় কি কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে?'

'প্রায় সম্পূর্ণ সাফল্য পাওয়া গেছে বলা যায়। এই তিন ইন্দ্রিয়হীন শিশুকেও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী কৃতী করে তোলা সম্ভব হয়েছে।'

'কোথায়, কোন শিক্ষায়তনে?'

'পৃথিবীর অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা আমাদের দেশে, এই বাংলা দেশেই রয়েছে। এই প্রচেষ্টায় বীরভূমের মিশনারি প্রতিষ্ঠান 'ব্যাপ্‌টিস্ট হোম অফ লাইট' অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে। আমার যতদূর মনে হচ্ছে আপনার মক্কেল দীপক দত্ত এই প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষিত হয়েছে এবং সাফল্যের নিদর্শন তো আপনার হাতেই রয়েছে—মানে তার লেখা উপন্যাস 'নির্বাসিত আত্মা'। আপনি পড়েছেন বইটা?'

'না।' 'তিন ইন্দ্রিয়হীন শিশুকে কত উচ্চশিক্ষিত এবং রুচিবান তরুণে পরিণত করা সম্ভব, ওই উপন্যাসের মধ্যেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।'

'আচ্ছা, এই আশ্চর্য শিক্ষার পদ্ধতিটা কি?'

'বীরভূমের হোমে এই শিক্ষার প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন ফাদার লরেন্স। পদ্ধতিটা প্রায় তাঁর নিজস্ব বলা যায়। তাঁকে দেখলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে আপনি আপনার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর পাবেন। বিস্ময়কর প্রতিভা এই ফাদার লরেন্সের। বিদেশী মিশনারী বলেই বোধহয় সেই প্রতিভার যোগ্য সমাদর আজও হয়নি।'

'আপনি গেছেন বীরভূমে?'

'নিশ্চয়ই। ফাদার লরেন্সকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। পদ্ধতিটা তাঁর কাছেই যা শিখেছি তা হচ্ছেঃ প্রথমে সাহায্য নেওয়া হয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের। প্রতিটি বস্তু স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত ধারণাকে ধীরে ধীরে প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশিত এবং অভিব্যক্ত করার চেষ্টা দিয়ে শুরু হয় শিক্ষা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে আঙুলের বিশেষ ভঙ্গী আয়ত্ত করা—এটা বিশেষভাবে প্রস্তুত বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয়ের প্রস্তুতি। শেষ পর্যায়ে সেই বর্ণমালার সাহায্যে পাঠ ইত্যাদি এগিয়ে চলে। ক্রমশঃ এইভাবে, শিক্ষকের পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে এবং ছাত্রের ঐকান্তিক আগ্রহের সাহায্যে ভাবপ্রকাশের দুটো মাধ্যম আয়ত্ত হয় —একটা প্রতীক চিহ্ন আর অন্যটা বিশেষ হরফ। আমি বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারছি না আর না দেখলে ব্যাপারটা বোঝাও যাবে না। আপনার উচিত রামপুর-হাট যাওয়া।'

'নির্বাসিত আত্মা' বইটা সামনে এগিয়ে ধরে বিপ্রদাস বললো, 'আমি এইটুকু বুঝছি যে এইরকম তিন ইন্দ্রিয়হীন কোনও শিশুর মনে বই সম্বন্ধে ধারণা

জন্মাতে হলে প্রথমে তার হাতে দিতে হবে ধরুন এই বইখানা। পুনঃ পুনঃ স্পর্শের মাধ্যমে বইটার আকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা তার হলো। এরপরই তাকে শেখাতে হবে এই ধারণাকে প্রকাশের ভঙ্গী। অর্থাৎ একখানা 'বই' বোঝাতে হলে সে কি করবে? সে প্রথমে প্রতীক চিহ্ন সৃষ্টি করে বোঝাতে পারে এবং পরে শিক্ষা আরও অগ্রসর হলে পারে 'ব' আর 'ই' এই দুটো অক্ষর সাজিয়ে।'

'আশ্চর্য আপনার বিশ্লেষণ তো? একেবারে পদ্ধতির মূল সূত্রটা ধরে ফেলেছেন। অর্থাৎ 'ব' আর 'ই' এই দুটো অক্ষর যখনই সে সাজাচ্ছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে তার মনে রূপায়িত হচ্ছে স্পর্শের মাধ্যমে পাওয়া ধারণা আর প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে অভিব্যক্ত সেই ভাব। এইভাবে একের সঙ্গে অন্যের পুনঃ পুনঃ সংযোগের ফলে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ একটি ধারণা, সম্ভব হয় নির্বিঘ্নে প্রকাশের ভঙ্গী আয়ত্ত করা। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এই পদ্ধতি, অত্যন্ত কঠিন এতে সাফল্য-লাভ করা। তবে শিক্ষকের নিষ্ঠা এবং ছাত্রের প্রতিভা থাকলে সাফল্যলাভ অসম্ভব নয়—আপনার মক্কেল দীপক দত্তই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'

'কিন্তু সে বই লিখল কি করে?

'হাতে চিহ্ন এঁকে শিশুর ধারণার সঙ্গে সেই চিহ্নের সংযোগ স্থাপন করতে হয়। তাছাড়া আছে ঠোঁট, জিভ আর তালুর সাহায্যে অক্ষর উচ্চারণের প্রক্রিয়া শিক্ষা করা। সেই উচ্চারণ আপনার কাছে হয়তো শুধুই একটা হাউ হাউ চীৎকার মনে হবে কিন্তু বিশেষজ্ঞ তার থেকেই বুঝতে পারবেন বক্তার মনের কথা। প্রতীক চিহ্ন, উচ্চারণ আর অক্ষর এই তিনের সমন্বয়ে শিক্ষা পূর্ণতা পায় 'ব্রেল' পদ্ধতির সাহায্যে মনের ভাব লিখিতভাবে প্রকাশের মধ্যে।'

'আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো জানি না। আপনার কাছে এইটুকু না জানলে আমার মক্কেল সম্বন্ধে আমার ধারণা সম্পূর্ণ হতো না। এইটুকু বুঝছি যে উপন্যাস লিখে দীপক দত্ত প্রমাণ করেছে যে এই বিশেষ শিক্ষাক্রমানুযায়ী ভাব প্রকাশের প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে সে অশেষ পারদর্শী।'

'তাতে কোনও সন্দেহই নেই।'

'তাহলে কণ্ঠস্বরের মারফতেও সে বলতে পারে মনের কথা এবং যদি না বলে তো বুঝতে হবে যে ইচ্ছে করেই বলছে না।'

'কথাই তো আছে, যে জেগে ঘুমোয় ইত্যাদি। কিন্তু দীপক দত্তের ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক প্রযোজ্য নয়। সাধারণ কালা বোবার মতো শিক্ষা সত্ত্বেও বক্তার ঠোঁটের ভঙ্গী দেখে কিছু বোঝা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর সঙ্গে কথা বলতে হলে আঙুলের স্পর্শে সৃষ্ট বর্ণমালা দিয়ে ওর মনে সঞ্চারিত করতে হবে বক্তব্য। ওর বিকৃত অর্ধোচ্চারিত কণ্ঠস্বর মারফৎ উত্তর দিলে আপনি কিছুই বুঝবেন না, প্রায় কেউই কিছু বুঝবে না। সুতরাং ওকে 'ব্রেল' বর্ণমালার সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করবার সুযোগ দিতে হবে।'

'আপনি কিছু মনে না করলে আপনাকে আরও একটু কষ্ট দেব। আগামী কাল যদি আপনি আমার সঙ্গে জেলে গিয়ে আপনাদের বিশেষ পদ্ধতিতে আমার মক্কেলের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেন তো বিশেষ উপকার হয়।'

'আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে এই ব্যাপারে ফাদার লরেন্স বা ফাদার কোলম্যান যাঁরা আশৈশব ওকে শিখিয়েছেন তাঁদের কারুর সাহায্য নিলেই ভাল করতেন।

'তাঁদের আমি চিঠি লিখেছি কিন্তু এখনও উত্তর পাইনি। অথচ সময় এত অল্প যে দীপকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাটাকে পিছিয়ে দিতে পারছি না। আপনি যদি এই উপকারটুকু…'

'আচ্ছা, আমি রাজী। ফাদার লরেন্সের কাছে যেটুকু শিখেছি তা প্রয়োগ করতে আমার ভালই লাগবে।'

'তা হলে আগামী কাল বেলা ১০টায় আমি আপনাকে এইখান থেকে তুলে নেব।'

বাড়ীতে পা দিতেই অতসী চেঁচিয়ে উঠল, 'কি আপনি বলুন তো ? আর একটু আগে আসতে পারলেন না। আপনাকে একজন খুঁজতে এসেছিলেন, এইমাত্র চলে গেলেন।'

'এরই মধ্যে গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা…সুখবর দেখছি ··নামটা বল !'

'মিসেস রেবা দত্ত।'

'অ্যাঁ। স্বয়ং দীপক দত্তের মা। কি বললেন ভদ্রমহিলা ?'

'বললেন, আপনার চিঠি পেয়েই সোজা চলে এসেছেন।'

'এ আগ্রহ মিইয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল বিপ্রদাস।

'কোথায় চললেন আবার ?'

'মিসেস রেবা দত্তের বাড়ী। খুব সম্ভব আমি যাবার আগেই তিনি বাড়ী পেঁৗছে যাবেন। না হলেও আমি তাঁর ড্রইংরুমে বসে তাঁর ফেরার অপেক্ষায় বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেব।' হাতের বইটা অতসীর সামনে এগিয়ে ধরে হাসল বিপ্রদাস।

বইটার পানে এক পলক দেখেই বিস্মিত অতসী প্রশ্ন করল, 'আপনি নভেল পড়বেন ?'

'ক্ষতি কি ? কিন্তু শুধু নভেলই দেখছো ?'

'নামটা বলছেন। সত্যি, নামটা পড়েই মনে হচ্ছে খুব করুণ হবে এর কাহিনী।' একটু থেমে বইটা দেখতে দেখতে বিস্ফারিত চোখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল অতসী, 'আরে এর লেখক যে দেখছি…'

'এইবার ঠিক দেখেছো। এই উপন্যাসের পাতাতেই হয়তো লুকিয়ে আছে আমার সমস্যাসঙ্কুল মামলার সমাধান। যাই হোক, আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর। আবার যদি কেউ আসেন, বলা তো যায় না।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল বিপ্রদাস। হতভম্ব অতসী দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল যে হাইকোর্টের এই মামলার নেশায় প্রৌঢ় ব্যারিস্টার পাগল না হয়ে যান।

রাত প্রায় দশটার সময় ফিরে এল বিপ্রদাস। অতসী দরজা খুলতেই বললো, 'ভয়ঙ্কর ক্লান্ত আমি। খিদেও খুব পেয়েছে। খাবার আছে তো ?'

'হ্যাঁ, ওই-তো টেবিলে গোছানো রয়েছে।'

'চমৎকার। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। এই না হলে আমার কন্যা। আচ্ছা, এইবার তুমি একটা ট্যাক্সি ডেকে চট্‌পট্‌ বাড়ী চলে যাও। রাতে ঘুম না হলে শরীর খারাপ হবে।'

'কিন্তু অন্নপূর্ণার ঘুমোবার অবসর কোথায় বলুন।' খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বলল অতসী। বিপ্রদাস স্মিতমুখে তার দিকে তাকাতেই আবার প্রশ্ন করল অতসী, 'ভদ্রমহিলার দেখা পেলেন ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আর কথা নয়। বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হও। কাল সকাল সাড়ে আটটায় আসতে হবে মনে থাকে যেন।'

রাতের খাওয়া সেরে, সুবিমল সেনের দেওয়া অবশিষ্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজি-চেয়ারে আরামে গা এলিয়ে 'নির্বাসিত আত্মা' পড়া শুরু করল বিপ্রদাস। বাইরে রাত ক্ষয়ে যেতে লাগল, গলে পড়ল অন্ধকার। নিবিষ্টচিত্ত বিপ্রদাস তখন ডুবে গেছে উপন্যাসের পাতায়। উপন্যাসের অন্ধ-কালা-বোবা নায়ক তার অন্ধকারের আবরণ ছিঁড়ে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ছটফট করছে। লেখকের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় অভিভূত বিপ্রদাস বার বার সেই কয়েক পাতা পড়তে লাগল ঃ

'অন্ধ-কালা-বোবা উপন্যাসের নায়ক জীবন কি জানবার জন্য উৎসুক হয়েছে। কিন্তু যে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না, সে কেমন করে পাবে জীবনের আভাস। মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে সে এসেছে কিন্তু সংগে নিয়ে এসেছে মাতৃগর্ভের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, হিমশীতল স্তব্ধতা। অন্ধকারের আবরণে বন্ধ হয়ে কাঁদছে তার উৎসুক আত্মা। সে কান্না জানাবার ভাষা তার জানা নেই, তাই সে কান্না অনুভব করবারও বুঝি কেউ নেই। কেউ যে থাকতে পারে এ ধারণাও তার নেই। তার অন্ধকার জগৎ সীমিত হয়ে আছে ঘ্রাণ স্বাদ আর স্পর্শের সংকীর্ণ গণ্ডিতে। জীবনের এক শোকাবহ প্রকাশ, চরম দুঃখের প্রতীক। যত দিন বাড়ছে ততই সে বুঝতে পারছে তার পংগুতার পরিমাপ ; বুঝছে কিন্তু করতে কিছুই পারছে না। পংগুতাই যে তার জীবনের অভিশাপ, এ সত্য আর তার কাছে অস্পষ্ট নেই। কিন্তু কেমন করে সে মুক্তি পাবে এই অভিশাপ থেকে ?

'পংগু নায়কের মনে উঠেছে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার ঢেউ, ফেনায়িত হচ্ছে একের পর এক আশার আবেদন, কিন্তু শেষে সব ভেংগে পড়ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের অতলে। কিছুতেই ছেঁড়া যাচ্ছেনা সেই অন্ধকারের ভারী পর্দাটা, শত আঘাতে ভেংগে ফেলা যাচ্ছে না পংগুতার দুর্ভেদ্য বাধা। অদ্ভুত, অদৃশ্য এক বন্ধন, যার চিহ্ন হাতে বা পায়ে কোথাও নেই। বহিরংগে সে মুক্ত, স্বাধীন কিন্তু তিন ইন্দ্রিয়ের পথ বন্ধ করে এক অদৃশ্য শক্তি দাঁড়িয়ে আছে তার পথ আগলে। মানুষের হাতে মানুষের চরমতম শাস্তি মৃত্যু। ভগবানের হাতে বুঝি ছিল মানুষের চরমতম শাস্তি, আর তারই প্রতীক এই তিন ইন্দ্রিয়হীন মানুষটির বেঁচে থাকা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অতলে মগ্ন হয়ে শুধু

জড়ের মতো বসে থাকা। নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া অন্ধকারের হিম স্পর্শ, ঠোঁটে, জিভে, গলায় সর্বত্র লেগে আছে, জড়িয়ে আছে অন্ধকারের তিক্ত স্বাদ। জীবনে একটি মাত্র রঙ, সে রঙ তমিস্রার, আকাশে সেই আঁধারের প্রলেপ, বাতাসে সেই আঁধারের আভাস, ভেতরে বাইরে সর্বত্র বয়ে যাচ্ছে একটি মাত্র রঙের স্রোত—কালো রঙ ছড়িয়ে আছে আশেপাশে—নিদ্রায় দুলছে অন্ধকারের পর্দা, জাগরণেও স্থির হয়ে আছে সেই অন্ধকারের আবরণ……এই অন্ধকারের স্বরূপ সে জানে না। কিন্তু এই অন্ধকারই যে তার জীবনের চরম অভিশাপ এ তার অজানা নেই। কিন্তু কিসে পাওয়া যাবে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি।

'কিসে পাওয়া যাবে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি!'

'জীবনে তার ঘিরে আছে পঙ্গুতার বাধা আর আঁধারের আবরণ। মানুষের হাতে খেলার পুতুল সে, তাই সব কিছুতেই তার ভয়। ভয় বর্তমানকে, ভয় ভবিষ্যতকে। কোথায় সে যাচ্ছে, কে নিয়ন্ত্রণ করছে তার জীবন? আজ যদি সে পরিত্যক্ত হয়, এই মুহূর্তে সকলেই তাকে ভুলে যায়—তখন? তখন কি হবে তার—কি লাভ হবে ধনীর সন্তান হয়েও? নিজের যার কিছু করবার সামান্য শক্তিও নেই, কি হবে তার পিতার অজস্র সম্পদ থেকেও। দারিদ্র্যই তার বিধিলিপি, প্রতি পদে অপরের করুণায় অপরের সাহায্যে পুষ্ট হওয়াই তার জীবনের সকরুণ ইতিহাস। কারা তাকে পঙ্গু, ব্যর্থ জীবন টেনে টেনে চলায় সাহায্য করছে, কারা দয়া করে তাকে চলাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, বসাচ্ছে, শোয়াচ্ছে? কারা এই মানুষের দল? কেমন দেখতে এদের? এরাও কি তারই মতো অথবা তার চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের জীব?

'এই রকম অসংখ্য চিন্তার ঢেউ মনে উঠে, মনেই মিলিয়ে যায়, তিন ইন্দ্রিয়ের অভাবের কঠিন বাধায় আছড়ে প'ড়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারের অতলে। গভীর অন্ধকারের অতল থেকে আবার শুরু হয় সাঁতার, কালো আলকাতরার মতো তরল অন্ধকার পেরিয়ে শুরু হয় পৃথিবীর আলোয় ভেসে ওঠবার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা। কিন্তু বারে বারে ফিরে যেতে হয় ব্যর্থতার আঘাত পেয়ে, ফিরে যেতে হয় সেই কর্দমাক্ত, তরল ঘন অন্ধকারের অসহ্য আবহাওয়ায়। মনে হয় এ থেকে বুঝি মুক্তি নেই।

'তবুও মুক্তির ইশারা সত্যিই একদিন এল। অন্ধকারের ভারী পর্দা ভেদ করে এল আলোর সংকেত। জীবনের সেই পরম মুহূর্তকে ভোলবার নয়। ভোলবার নয় তার চারপাশের অসংখ্য রহস্যময় জীবের মধ্যে একজনের স্পর্শে সারা সত্তার সেই অপূর্ব শিহরণ। স্পর্শ তো কতজন রেখেছে তার দেহে, প্রতিদিন রেখেছে। কিন্তু কোনও দিন এমন করে ঝংকার ওঠেনি তার মনের বীণায়। কে হঠাৎ এসে তার হাতে দিল সামান্য একটা স্পর্শ, যার মধ্যে অনুরণিত হলো তাকে কিছু বলার ব্যগ্রতা, যার মধ্যে আভাসিত হলো বাইরের অদৃশ্য জগতের কোনও অজ্ঞেয় বার্তা। কার, কোন মরমীর আঙুলে বাজল এই বিচিত্র ঝংকার?

'চকিতে এক নতুন জগতের আহ্বান এসে পৌঁছল তার মনের দরজায়। অন্ধকারের আবরণের সামান্য এক ছিদ্র দিয়ে এসে পড়ল আলোর ক্ষীণ এক রেখা।

সেই আলোয় স্নান করতে করতে আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, আবার সে উন্মুখ হলো, আবার শুরু হলো তরল অন্ধকার ভেদ করে তার ঊর্ধ্বগামী সাঁতার। চারপাশে অজ্ঞাত, অদৃশ্য জীবদের স্পর্শের আশায় তার সারা সত্তা সর্বক্ষণ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সে শুরু করে স্পর্শের মাধ্যমে সঞ্চারিত বাণীর মর্মোদ্ধারের প্রচেষ্টা। কে যেন বার বার তার মনের বন্ধ দরজায় আঘাত করছে, কিছু বলতে চাইছে তাকে। সেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে বোঝবার, কিন্তু পারছে না। তবু এই প্রচেষ্টার মাঝেই হঠাৎ সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের এক অপূর্ব, অনাস্বাদিত অর্থ......'

পড়তে পড়তে বিপ্রদাস বার বার বিস্মিত হলো লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-চাতুর্যে, অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টিতে। নায়কের মর্মবিকাশের এই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার মধ্যে পদে পদে যেন ছাপ পড়েছে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। কিন্তু কার স্পর্শে দীপক দত্তের অন্ধকার জীবনে প্রথম আলোকের রেখা এসে পড়ল? কার স্পর্শে—কোনও পুরুষের না নারীর? তার মনে হলো এ ক্ষেত্রে ফাদার লরেন্স হওয়াই সম্ভব। ফাদার লরেন্সের কাছ থেকে কোনও উত্তর তখনও আসেনি মনে পড়ল। না আসুক, সে নিজেই যাবে ফাদার লরেন্সের কাছে।

পরদিন সকালে একটা চিঠি পেয়ে বিপ্রদাস খুব খুশী হলো। ফাদার লরেন্সের উত্তর অবশ্য নয়। ডাঃ বিজয় সেন তার চিঠির উত্তর দিয়েছেন। চিঠির ভাষায় একটি অমায়িক ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে সে আশ্বস্ত হলো। ডাঃ সেন তাকে দেখা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সময় তাঁর মোটেই নেই, তবু দায় যখন তারই তখন আমন্ত্রণে সাড়া দিতেই হবে। মনে মনে সারাদিনের কাজ ঠিক করে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বেলা সাড়ে দশটায় কালা-বোবাদের শিক্ষায়তনের প্রধানকে নিয়ে সে এসে দাঁড়াল দীপক দত্তের 'সেলে'। পথ দেখিয়ে নিয়ে এল গতকালের সেই পরিচিত প্রতীপ গুপ্ত। চাবি খোলায় ব্যস্ত প্রতীপকে বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'আমার মক্কেল রাতে খাওয়া দাওয়া কিছু করেছে তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ; কাল ভাল ভাল সব খাবার দিয়েছিলেন সুপার সাহেব। একেবারে চেঁচেপুঁছে খেয়েছে। প্রায় ফাঁসির খাওয়া স্যার।'

ছেলেটিকে এমনিতে ভাল লাগলেও বিরক্তস্বরে বিপ্রদাস বলল, 'তুমি বড় বাজে কথা বল।' তারপর অপ্রস্তুত সঙ্গীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'তা হলে আজ ওর মেজাজ ভাল থাকা উচিত। আর তা হলেই আজ আমাদের বন্ধুত্ব হতে বোধ হয় দেরী হবে না।'

দেয়ালের পাশে বিছানায় বসেছিল দীপক। দরজা খুলতেই সে দেয়ালের গা ঘেঁসে সরে বসল, গরিলার মতো এপাশ ওপাশ দুলতে লাগল তার বিরাট দেহ।

বিস্মিত বিপ্রদাস প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কালকের চেয়ে আজ ওর দেহটা যেন আরও বিরাট কিন্তু বেশ ভব্যসভ্য দেখাচ্ছে হে। কিন্তু ও অমন দুলছে কেন?

ব্যাপার কি বল তো?'

প্রতীপ বলল, 'আমি তো বলেছি আপনাকে যে ও ওর মত করে সব কিছু চট্‌পট্‌ বুঝে নেয়। আমরা যে আসছি তা ও দরজা খোলবার আগেই টের পেয়েছে।'

বিপ্রদাস হেসে বলল, 'বুঝেছি।' তারপর তার সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'আমার মক্কেলকে কেমন দেখছেন বলুন?'

সঙ্গী দরজায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। বেশ একটু শঙ্কিত ভাবে বললেন, 'দৈত্যের সামনে যাওয়া ঠিক হবে কি না ভাবছি।'

বিপ্রদাস বলল, 'হ্যাঁ দৈত্যই বটে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই অসাধারণ দেহের মধ্যে কি করে লুকিয়ে থাকতে পারে এমন অনুভূতিপ্রবণ একটি মন, এমন মেধাবী একটি মস্তিষ্ক—তাই না? ওর বই যখন পড়েছেন তখন কোনও সন্দেহ থাকবার কথা নয়।'

কথা বলতে বলতে বিপ্রদাস দীপকের সামনে এগিয়ে গেল। বিরাট সেই দেহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মন দিয়ে একবার দেখল তার মক্কেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর পিছন না ফিরেই বলল, 'আমাকে দেখে ও স্থির হয়ে রয়েছে; অর্থাৎ গতকালের উকীলকে চিনতে ওর ভুল হয়নি। গন্ধের এই আশ্চর্য শক্তি, ইন্দ্রিয়হীন মানুষের জীবনে গন্ধের এই অলৌকিক ভূমিকা, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ওই, ওই, ও আবার দুলছে। অপরিচিত তৃতীয় এক ব্যক্তির উপস্থিতি ও বুঝতে পেরেছে। আবার খেপে না ওঠে। অপরিচিতকে আবার আলিঙ্গনের চেষ্টা করলেই সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। দেখি কিছু দিয়ে ওকে খুশী করা যায় কি না।'

চট্‌ করে একটা সিগারেটের প্যাকেট দীপকের ডানহাতে গুঁজে দিল বিপ্রদাস। সঙ্গে সঙ্গে দীপকের দুলুনি থেমে গেল। বেশ সহজভাবে বাঁ হাত দিয়ে একটা সিগারেট বার করে মুখে গুঁজল সে। বিপ্রদাস প্রস্তুত হয়েই ছিল। ত্বরিতে লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল। মুগ্ধ চোখে প্রৌঢ় ব্যারিস্টার দেখল তার মক্কেলের বেশ জোরে একটি টান এবং নাক দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে তৃপ্তি যেন ঝরে পড়ছে। ছোট ছেলের মতো খুশী হয়ে সে বলে উঠল, 'ভারী আরাম করে টানছে হে, একেবারে পাকা নেশাখোর।' তারপর প্রতীপের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, 'এখানে আসার পর কি ও একটাও সিগারেট পায়নি?'

প্রতীপ বলল, 'আজ্ঞে না। ওর যে কি দরকার তাই তো বোঝা যায় না! দিনরাত শুধু কাতরাচ্ছে।'

'কই এখন তো কাতরাচ্ছে না? কেমন আরাম করে সিগারেট টানছে দেখ তো। এই হচ্ছে ওকে প্রশ্ন করবার সুবর্ণ সুযোগ।' বলতে বলতে আরও এক পা এগিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বিপ্রদাস, 'আরে, আজ দাড়িও কামিয়েছে না কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'। প্রতীপ উত্তর দিল।

'নিজের হাতে?'

'তা ছাড়া কি! হাত দিয়ে ও পারে না এমন কাজ নেই।'

বিপ্রদাস হেসে ফেলে বলল, 'তার প্রমাণ আমি গতকাল পেয়েছি।' তারপর তার সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'অবশ্য আপনার কোনও ভয় নেই। এতক্ষণে আপনার গন্ধের সঙ্গে ও পরিচিত হয়েছে, আপনাকে ও ওর মতো করে চিনে ফেলেছে। এইবার স্বচ্ছন্দে আপনি আপনার কাজ আরম্ভ করতে পারেন।'

সঙ্গী তার কথায় বিশেষ ভরসা না পেয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে এবার বেশ দৃঢ়স্বরে বলল, 'এই মুহূর্তে ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমার ধারণা ওর দেহটা দৈত্যের মতো বিরাট কিন্তু মন শিশুর মতো কোমল। আজকের পরিচ্ছন্ন পরিতৃপ্ত দীপক দত্তের মধ্যে আমি প্রায় আমাদেরই মতো সামাজিক, স্বাভাবিক এক মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। আপনি নির্ভয়ে আপনার কাজ আরম্ভ করে দিন। প্রথমেই ওকে বুঝিয়ে দিন যে আমি মামলায় ওর পক্ষ সমর্থনের ভার নিয়েছি আর আপনি এসেছেন উকীল আর মক্কেলের আলাপে সাহায্য করতে। ওর জানা দরকার···যে আমি ওর বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী। আর জানা দরকার যে এরপর থেকে ওর প্রয়োজনীয় খাবার এবং সিগারেটের ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো।'

ভয় একেবারে না কাটলেও ভরসা পেয়ে ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে তাঁর আঙুল দীপকের হাতে ছোঁয়ালেন, সুর তোলবার আগে যেমন করে আঙুল ছুঁয়ে থাকে সেতারের তার। নিশ্চল দেহে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে রইল দীপক। শুরু হলো নির্বাক কথোপকথন।

একটু বিরতির সুযোগে উৎকণ্ঠিত বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'কি বলছে ও ?'

'কোনও উত্তর নেই।'

'তা না থাক। আমার পরিচয় যে ও জেনেছে এই যথেষ্ট। এইবার ওকে বলুন যে ওর উপন্যাস পড়ে আমি খুব খুশী হয়েছি।'

আবার শুরু হলো আঙুলের সঞ্চরণ আর সঙ্গে সঙ্গে দীপকের মুখে ছড়িয়ে পড়ল আনন্দের আলো।

বিপ্রদাস হাততালি দিয়ে বলল, 'এইতো, এইতো পাওয়া গেছে ওর উত্তরের আভাস। প্রশংসা শুনলে সকলেই খুশী হয় দেখছি। আচ্ছা, ওকে জানিয়ে দিন যে জেলে বসে ও যদি নতুন কোনও লেখা আরম্ভ করতে চায় তো তার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। ওর বর্তমান অভিজ্ঞতাতেই তো উপন্যাসের প্রচুর উপকরণ রয়েছে।'

আবার শুরু হলো আঙুলের অর্কেস্ট্রা। বিপ্রদাসের বক্তব্য পৌঁছে গেল দীপকের অন্তরে: সঙ্গে সঙ্গে গতির ছন্দে চঞ্চল হলো দীপকের আঙুল। নির্বাক ভাষ্যকারের নিশ্চল হাতে সঞ্চারিত হলো তার আঙুলের লিপি।

উত্তেজনায় ফেটে পড়ে চীৎকার করে উঠল বিপ্রদাস, 'এই তো ও উত্তর দিচ্ছে! কি বলছে বলুন তো ?'

'ও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং বলছে যে আপনার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, কারণ ও আর কোনও দিনই কিছু লিখবে না।'

'কৃতজ্ঞতা আমার মোটেই পছন্দ নয়। যাই হোক ওকে বলুন যে আমার বিশ্বাস

ইংরাজ তরুণকে খুন করে ও ঠিক কাজই করেছে।'

বিস্মিত চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক,'এই কথা বলতে বলছেন আপনি ?'

'আপত্তি কি ? ব্যারিস্টার হিসাবে বলায় হয়তো বাধা থাকতে পারে কিন্তু ওর বন্ধু হিসাবে সান্ত্বনাটুকু আমায় দিতেই হবে। আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় না হলে ও কিছুতেই আমায় বিশ্বাস করবে না।'

আঙ্গুল মারফত এই মন্তব্য বাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাসের মনে হলো দীপকের ভাবলেশহীন মুখে বিস্ময়ের একটা ক্ষীণ আভা জেগেই মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে সঙ্গীকে বলল, 'থামবেন না। আরও জানিয়ে দিন যে আমি শুধু ওর কাজ সমর্থনই করি না, ওকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করি।'

বক্তব্যটুকু শেষ হতেই আঙ্গুলের সঞ্চরণ থেমে গেল। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে দীপক। একবার মক্কেলের দিকে চেয়ে একটু ভেবে প্রৌঢ় ব্যারিস্টার সঙ্গীকে বলল, 'এইবার পর পর পাঁচটা প্রশ্ন করুন ওকে।'

'প্রথম প্রশ্ন ঃ কেন ও নিজের দোষ স্বীকার করেছে ?'

একটু পরেই সঙ্গী জানালেন, 'উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ও এখনও কোনও চেষ্টা করেনি কেন ?'

'উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মায়ের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ওর আছে কি না ?'

'না',—সঙ্গীর হাতে তার এই ছোট্ট উত্তরটুকু পেয়ে খুশী হলো বিপ্রদাস।

তার ডাকে তবে সাড়া দিয়েছে এই নির্বিকার নির্লিপ্ত লোকটি।

'চতুর্থ প্রশ্ন ঃ ও স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায় কিনা ?'

'না' দৃঢ়, নির্দিষ্ট উত্তর।

'পঞ্চম এবং শেষ প্রশ্ন ফাদার লরেন্স এখানে দেখা করতে আসায় ওর আপত্তি আছে কি না ?'

'উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।'।

সঙ্গীর মুখে কথাটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বলল বিপ্রদাস, 'যাক তবু সোজা 'না বলে দেয়নি। আচ্ছা এইবার বলুন যে যাবার আগে আমি আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে ওর হাতদুটো নিজের হাতে ধরতে চাই। ওকে হাত বাড়িয়ে দিতে বলুন।'

বিপ্রদাসের অনুরোধ দীপকের অন্তরে পেঁছিল কিন্তু মুখে না পড়ল স্বীকৃতির ছায়া বা না হলো তার নিশ্চল ভঙ্গীর সামান্য পরিবর্তন। একটু হতাশ হয়ে বাইরে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াল বিপ্রদাস। সেলের বাইরে পা দিয়ে সে সঙ্গীকে বলল, 'ওর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা এইবার বলুন।'

সঙ্গী হেসে বললেন, 'আপনার কথাই ঠিক। আপনার মক্কেল শুধু অত্যন্ত বুদ্ধিমান নয়, সাংঘাতিক ধূর্তও। ও জানে কখন কতটুকু বলা দরকার, জানে প্রয়োজনে কেমন করে বীভৎস দেহের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয়।'

চলতে চলতে চিন্তিত ব্যারিস্টারের কথা শোনা গেল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে

বুদ্ধিমান মক্কেলের চেয়ে বোকা মক্কেলের পক্ষ সমর্থন অনেক সহজ।'

বাড়ী ফিরতেই অতসী এগিয়ে দিল ফাদার লরেন্সের চিঠি। লেখায় একবার চোখ বুলিয়ে বিপ্রদাস বলল, 'আমায় এখনই যেতে হবে অতসী। এই কাছেই লেক টেরাসে টুক করে নেমে একটা কাজ সেরে সোজা চলে যাব হাওড়া স্টেশন। তার পরের প্রোগ্রাম এখনও ঠিক করিনি। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি রইলে এখানকার কাজ সামলাবার জন্যে।'

'কিন্তু কবে ফিরবেন আপনি ?'

'বললাম তো কিছুই ঠিক নেই।'

'এককাপ কফি খাবারও সময় হবে না ?'

'বলছো—আচ্ছা দাও।'

সামনের চেয়ারে বসে পড়ে অতীত ঘটনাগুলোকে যেন গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় বলে চলল বিপ্রদাস, 'পাঁচজনকে চিঠি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে প্রথম দেখা হয়েছে মক্কেলের মা'র সঙ্গে। একটু বাদেই দেখা হবে ডাক্তারের সঙ্গে। আগামী কাল সকালে আশা করছি আর দু'জনের দেখা পাব। তাহলে বাকী রইল শেষ এবং পঞ্চম জন—মক্কেলের স্ত্রী। ভদ্রমহিলা চিঠি পেলেন কিনা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। পেলেও, উত্তর দেবেন না হয়তো। তীরে এসে নৌকো অমন টলমল করেই। একটু ধৈর্য ধরলে আর ধীরবুদ্ধি হলে তীরের মাটিতে পা দেওয়া হয়তো কঠিন হবে না—হয়তো সহজ হবে সমস্যার সমাধান। কি, তুমি কিছু শুনছো অতসী? দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা ছেড়ে আমি যা বলছি কর! আরম্ভ কর আইনের গবেষণা। তোমার গবেষণার বিষয় হবে, 'আসামী পক্ষের উকীলের কি তার মক্কেলের হত্যাপরাধ সমর্থনের নৈতিক অধিকার আছে?' হয়তো বিষয়টা তোমার পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু এই একটি প্রশ্নের মধ্যে আমি এই প্রৌঢ় বয়সেও জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি, বেঁচে থাকার মধ্যে পাচ্ছি অনাস্বাদিত এক আনন্দ।'

চারদিন বাদে ফিরে এল বিপ্রদাস। ভদ্রলোকের চেহারার অবস্থা দেখে একটিও প্রশ্ন না করে অতসী তার স্নান ও আহারের ব্যবস্থায় মন দিলে। ঘণ্টাখানেক পর সুস্থ, পরিতৃপ্ত বিপ্রদাস একটা চুরুট ধরিয়ে ইজিচেয়ারে আশ্রয় নেবার পর পাশের চেয়ারে এসে বসল অতসী। চুরুটে একটা টান দিয়ে হেসে বিপ্রদাস বলল, 'এতক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপকে মিথ্যে প্রমাণ করছো। পুরস্কার-স্বরূপ তোমার উদ্‌গ্রীব মনের একাধিক প্রশ্নের উত্তর আমিই দিচ্ছি। এতদিন আমি কি করছিলাম জান? একটা বিশেষ পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম।'

'পরীক্ষা ?'

'হ্যাঁ—অন্ধ, বোবা এবং কালা এমন একজন মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা।'

'এমন মানুষ বেঁচে থাকে এবং…'

'শুধু বেঁচে থাকে না, তোমার কল্পনাতীত সুস্থ এবং সহজভাবে থাকে।' কথা শেষ করে অতসীর প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে তার দিকে তাকাল বিপ্রদাস। খুব বেশী চিন্তিত মনে হলো তাকে।

'কি ব্যাপার বল তো ? তোমার কিছু যেন হয়েছে মনে হচ্ছে ?' প্রশ্ন করল বিপ্রদাস।

ক্ষীণ হেসে অতসী বলল, 'না, হয়নি কিছুই। ব্যাপারটা সামান্য, আপনাকে বলা ঠিক হবে কি না…'

'কি ব্যাপার ?'

'আপনি যাবার দিন থেকে প্রতি রাতে ঠিক এগারোটার সময় টেলিফোনে একটি মেয়ে আপনাকে খোঁজ করেছে। আমি আপনার অনুপস্থিতি জানাবামাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমাকে কোনও প্রশ্নর সুযোগই দেয়নি।'

'এই ব্যাপার ? কিন্তু এতে ভাববার কি আছে ? আমার বান্ধবী কেউ হলেও বা…কিন্তু সেখানেও তো শূন্য মরুভূমি'—বলেই, হো হো করে হেসে উঠল বিপ্রদাস। তারপর নিভন্ত চুরুটটায় একটা জোরে টান দিয়ে ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে বলল, 'নাও, এখন বাড়ী যাবার ব্যবস্থা কর। আগামীকাল তোমার ছুটি। পরশু ঠিক সকাল সাড়ে আটটায়, মনে থাকে যেন।'

অতসী চলে যেতেই ব্যাগ থেকে খানকতক পুস্তিকা বার করে পড়তে বসল বিপ্রদাস। রামপুরহাট থেকে সংগ্রহ করে আনা অন্ধ-কালা-বোবা মানুষের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার গভীরে তলিয়ে গেল সে। চমক ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে।

'কে ? হ্যাঁ, কথা বলছি…আপনি…বুঝেছি—তাহলে আমার চিঠি পেয়েছেন বলুন ?…সকলের কথা শোনাবার পর মনে হচ্ছিল আপনি হয়তো আড়ালেই থেকে যাবেন…অথচ এই মামলার ব্যাপারে আপনাকেই আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মিসেস দত্ত…আপনার সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারবো না…কেন দেখা করবেন না ?…তা কখনও হয়—আপনার স্বামীর মামলা, অথচ আপনি সরে আছেন, এতে শুধু বাজে গুজবের সৃষ্টি হচ্ছে। ঠিকই, আপনার কিছুই করবার নেই, কিন্তু আমাকে সাহায্য করায় আপত্তি কি ?…হ্যাঁ, আমার একান্ত অনুরোধ…কি বলছেন, আমার বাড়ীতে আসবেন না…বেশ তো, আপনি যখন যেখানে বলবেন…আপনার বাড়ীতে…না ?…ঠিক আছে, কিন্তু জায়গাটা বলুন…অ্যাঁ, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে…ওখানে যে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী…ওঃ, সকালে…হ্যাঁ তখন ফাঁকা পাওয়া যাবে…নিশ্চয়, একাই আসবো। আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, মিসেস দত্ত…দক্ষিণ দিকে গেটের সামনে, বেলা দশটায় আমার কালো কোট দেখলেই…ঠিক আছে…অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার পুস্তিকার পাতায় ডুবে গেল বিপ্রদাস।

পরদিন ঠিক বেলা দশটার সময় নির্দিষ্ট স্থানে মিসেস রুবি দত্ত'র সঙ্গে দেখা হলো বিপ্রদাসের। দীপক দত্তের সঙ্গে তুলনা করে তার স্ত্রীর একটা রূপ বিপ্রদাসের মনে আঁকাই ছিল। চশমাটা ভাল করে চোখে লাগিয়ে সে দেখল কল্পনার সঙ্গে বাস্তব হুবহু মিলে যাচ্ছে। বিশালদেহী দীপকের স্ত্রী এমন তন্বী—তরুণী, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব না হলে যেন ভগবানের রসিকতা সম্পূর্ণ হতো না। অদ্ভুত সুন্দরী মিসেস রুবি দত্ত। নীল শাড়ীতে আর গলায়

জড়ানো ধূসর রঙের স্কার্ফে সদ্য ফোটা ফুলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। কবি না হলেও বিপ্রদাসের মনে হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ফুলের বাগানে যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে স্বর্গের এক অপ্সরা।

তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বলল,-'একটু দেরী হয়ে গেল বোধহয়, কিছু মনে করবেন না।'

ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তরুণী বলল, 'মনে করবার কিছু নেই। এখন আমায় কেন ডেকেছেন বলুন ?'

'এক কথায়, মামলার ব্যাপারে আমার, মানে আমাদের অর্থাৎ আমার এবং আপনার স্বামীর আপনার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।'

ভ্রূ একটু কুঁচকে তরুণী বলল, 'আপনার প্রয়োজন না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু আমার স্বামীর কোনো প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। খুনের পর থেকেই দীপক আমাকে এড়িয়ে চলছে। জেলে দেখা করতে চেয়েছিলাম, সে রাজী হয়নি। বলতে পারেন কেন সে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় ?'

'এ প্রশ্নের উত্তর এখনই দিতে পারছি না।' 'হয়তো আমারই ভুল হয়েছে। আমার অনুরোধ যে এই মামলার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

'আমি তো একবারও না বলিনি আপনাকে।'

'আশ্চর্য। তাহলে আপনি আমার পূর্ববর্তী দু'জন ব্যারিস্টারের সঙ্গে সহ-যোগিতা করেননি কেন ?

'কারণ তাঁদের প্রতি আমার আস্থা ছিল না। প্রথম টেলিফোনে কথা বলার পরই বুঝেছিলাম শুধু নিজেদের নাম জাহির করার জন্যেই তাঁরা মামলাটা নিয়ে-ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে দীপক দোষী। কিন্তু আমি জানি যে দীপকের পক্ষে কারুকে খুন করা সম্ভব নয়।'

'আপনি জানেন মানে ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করল বিপ্রদাস।

'অর্থাৎ এই হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। দীপককে আমার চেয়ে ভালো ভাবে কেউ জানে না। আর সেই জন্যেই আমার বিশ্বাস ভুল, এমন ভাববার কোনো কারণ দেখছি না।'

'আর ঠিক সেই জন্যেই এই মামলার ব্যাপারে আপনাকে আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।'

'কিন্তু মিঃ মিঃ......'

'বসু' কথাটা জুগিয়ে দিল বিপ্রদাস।

'কিন্তু মিঃ বসু, আমরা দু'জনে চেষ্টা করলেও কিছুই করতে পারব না। দীপক নিজে কোনো সাহায্য নিতে রাজী নয়। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা নেবার জন্যে সে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে খুনের রহস্য কেমন করে ভেদ করবেন আপনি ? দীপক নিজে কথা না বললে, কারুর সাধ্য নেই কিছু করার। এবং জাহাজের অভিজ্ঞতার পর আমি বলতে পারি যে কেউ তাকে কথা বলাতে পারবে না।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। আপনার স্বামী কথা না বললে মামলায় তাঁর শাস্তি অনিবার্য। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমরা যাই ভাবি না কেন, ঘটনা, প্রমাণ—যেমন আংগুলের ছাপ এবং সব শেষে আপনার স্বামীর স্বীকৃতি, সব তাঁর বিরুদ্ধে। এবং সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত একটাই, সেটা হচ্ছে যে খুন আপনার স্বামীই করেছেন।'

'কিন্তু যাকে জানে না, চেনে না এমন একজন লোককে দীপক খুন করতে যাবেই বা কেন?'

'এই প্রশ্ন তো আমারও। আর এই প্রশ্নের উত্তর আমি আর আপনি, আমরা দু'জনে, চেষ্টা করলে হয়তো খুঁজে বার করতে পারি। হয়তো হত্যা না করে তার উপায় ছিল না। এমনি অসংখ্য 'হয়তো'র আবরণ উলটে আমাদের মুক্তির চাবিকাঠি খুঁজে বার করতেই হবে। এ আশ্বাস আমি আপনার স্বামীকেও দিয়ে এসেছি।'

তরুণী এই বয়স্ক ব্যারিস্টারের পানে তার বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে চেয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সে একটু সরে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'হত্যা না করে দীপকের উপায় ছিল না এমন কোনও কারণ তো আমার জানা নেই।'

হেসে ফেলে বিপ্রদাস বলল, 'আমার কাছে যা বললেন বললেন। মামলায় সাক্ষ্য আপনাকে দিতেই হবে এবং তখন ভুলেও যেন এমন বেফাঁস কিছু বলে বসবেন না। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। রোদ বাড়ছে, এখানে আর বসা চলে না। আগামী কাল একটা সময় করে আমার বাড়ীতে আসুন না!'

'আজ রাত এগারোটায় টেলিফোন করে আপনাকে জানাবো।'

'সেই ভাল। কিন্তু যাবার আগে আমার আর একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।'

'আপনি বললেন যে হত্যার পর থেকে আপনার স্বামী কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু আপনি যে বললেন আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইতিমধ্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন—এটা কিন্তু আমার খবরের সংগে মিলছে না। সকলেই জানে যে জাহাজ থেকে নেমেই আপনি আত্মগোপন করেছেন। ঠিকানা একটা নথীপত্রে পেয়েছি কিন্তু সেখানে আপনি থাকেন কিনা সন্দেহ। আর তাই যদি হয়, তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মিসেস দত্ত, আপনি কি সত্যিই চান যে আপনার স্বামী মুক্তি পেয়ে আবার আপনার পাশে ফিরে আসুন?'

তার বড় বড় চোখ মেলে তরুণী আবার তাকাল এই দরদী ব্যারিস্টারের পানে। নীরব সেই দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল ব্যথার মেঘ, ক্রমশঃ চোখের কোলে ফুটে উঠল কণা কণা অশ্রু। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে বাগানের বাইরে চলে গেল সে।

বিপ্রদাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কিন্তু তাকে পালিয়ে যেতে বাধা দিল না। একটু পরেই ধাবমান তরুণীর দেহরেখা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। পকেট থেকে

রুমাল বার করে চশমার কাঁচ ও কপাল মুছতে মুছতে আপন মনেই বলল সে, 'বিচিত্র ব্যবহার এই দম্পতির। এরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে এত ব্যস্ত কেন?'

মাথা নিচু করে বোধহয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই সে চলল ট্রাম রাস্তার দিকে। পাশ দিয়ে হঠাৎ হুঁশ করে একটা মোটর ছুটে চলে গেল। চমকে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল মোটরের মধ্যে চুরুট মুখে দিয়ে আরামে গা এলিয়ে বসে আছে সুবিমল সেন। ক্ষণিকের জন্য বিপ্রদাসের চোখটা একবার জ্বলে উঠল। এই সুবিমল সেনের বন্ধুবাৎসল্যই তাকে আজ জড়িয়ে দিয়েছে জটিলতম এক খুনের মামলার জালে।

প্রথম দেখার ঠিক সাত দিন পরে সুবিমল সেনের আপিসে আবার এসে দাঁড়াল বিপ্রদাস। সুবিমল সাদর অভ্যর্থনা জানাল। চুরুট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তারপর তোমার মামলার খবর কি?'

'খবর ভালই,' একগাল হেসে উত্তর দিল বিপ্রদাস। তার হাসির বহরে একটু বিস্মিত হলো সুবিমল। ব্যাপারটা জানবার আগ্রহে বলল, 'তা'হলে তোমার আরও কিছু সময়ের দরকার নেই বল?'

'মোটেই না। মামলা নির্দিষ্ট দিনেই হবে।'

'এত তাড়াতাড়ি তুমি সব গুছিয়ে নিলে কি করে? মক্কেলের সংগে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ', চোখ বুঁজে চুরুটে একটা টান দিয়ে বলল বিপ্রদাস।

'কি রকম মনে হলো মক্কেলকে?'

'কিছু বলবার সময় এখনও আসেনি।'

'তা ভাল; কিন্তু মামলাটা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আমার ওপর বিরক্ত হওনি তো?'

'ও সম্বন্ধেও ঠিক কিছু বলবার সময় এখন আসেনি। তবে শেষে তোমায় ধন্যবাদ জানাতে পারলেই আমি খুশী হব। আমার বিরুদ্ধে কে কে দাঁড়াচ্ছেন কিছু জান নাকি?'

'ব্রিটিশ দূতাবাসের পক্ষে দাঁড়াবে শ্যামল পালিত। তুমি চেনো নিশ্চয়ই?'

'নাম শুনেছি বটে।'

'এবার মুখোমুখি দেখবে। অতি তুখোড় ব্যারিস্টার। খুনের মামলায় বিশেষজ্ঞ বলা যায়। তুমি একটু বসলে এখানেই দেখা হতে পারে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মিঃ পালিতের আসবার কথা আছে।'

বন্ধুর এই আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে পারল না বিপ্রদাস। হেসে বলল, 'তুমি দেখছি অসাধ্য সাধনে তৎপর হয়েছো। আমার মতন ব্রীফ্‌লেশ ব্যারিস্টারের পক্ষে মিঃ পালিতের সংগে আলাপ একটা অঘটন বলা যায়।'

'শ্যামল পালিত একটু দাম্ভিক ঠিকই, তবে সে মক্কেলের কাছে। সহকর্মী-দের সঙ্গে ওর ব্যবহার খুব ভাল। আর তা ছাড়া দীপক দত্তের পক্ষ নেবার সংগে

সঙ্গে তোমার নাম বার-লাইব্রেরীতে প্রায়ই এবং প্রায় প্রত্যেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে।'

'অর্থাৎ সকলেই ভাবছে যে লোকটা পাগল অথবা…'

'ঠিক তা নয়। আলোচনার আড়ালে একটু ঈর্ষা, একটু প্রশংসা আছে বৈকি।' কথা শেষ হবার সংগে সংগেই ঘরে ঢুকল ব্যারিস্টার শ্যামল পালিত। সুবিমল হাত বাড়িয়ে বললে, 'বসুন মিঃ পালিত। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু, ব্যারিস্টার বিপ্রদাস বসুর আলাপ করিয়ে দিই। দীপক দত্তের মামলায় বসু আসামী পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। বিপ্রদাস, ইনিই ব্যারিস্টার মিঃ পালিত।' দু'জনের প্রাথমিক আলাপ শেষ হলো। এই প্রাথমিক আলাপেই ফুটে উঠল দুই ব্যারিস্টারের আকৃতির মতন ব্যক্তিত্বের পার্থক্য। শ্যামল পালিত তরুণ এবং সুদর্শন। কথা বলার ভংগী দেখলেই মনে হয় নিজের প্রকাশ-চাতুর্যে এবং কণ্ঠস্বরে সে নিজেই মুগ্ধ। এই আত্মতুষ্টির প্রভাব তার কর্মজীবনেও প্রসারিত। মামলা নেবার সময় মক্কেলের মুখ চাওয়া তার স্বভাবে নেই। প্রথম সে ভাবে নিজের মান ও নামের প্রশ্ন। আর এইখানেই তার সঙ্গে বিপ্রদাসের যা কিছু তফাত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে শ্যামল পালিত বলল, 'শুনছিলাম এই নাকি আপনার সেশন কোর্টে প্রথম মামলা।'

'ঠিক শুনেছেন। প্রথম বলেই তো সামলে উঠতে পারছি না।'

'অভ্যেস না থাকলে অসুবিধে হবেই। আমি ওই জন্যে ছোটখাট মামলা সব সহকারীদের ছেড়ে দিই।'

বিপ্রদাস মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করলেও, মুখে তা প্রকাশ করল না। প্রয়োজনীয় খবর জানবার জন্য ভালমানুষের মতন বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন—কতজন সাক্ষী আপনি ডাকবেন ঠিক করেছেন?'

'জন বারো। আপনার কতজন?'

'ওর অর্ধেকও বোধহয় হবে না।'

'মিঃ পালের, মানে তরুণ পালের মুখে আমি শুনছিলাম বটে যে মামলাটায় আসামী পক্ষের স্বাক্ষী পাওয়াই দুষ্কর।'

'যা শুনেছেন তা অবশ্য সবটাই ঠিক নয়।' বলে উঠে দাঁড়াল বিপ্রদাস। তার-পর মিঃ পালিতের দিকে চেয়ে বলল, 'আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ পালিত। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে' বলেই, সুবিমলের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিপ্রদাসের গমনপথের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়েছিল সুবিমল। হঠাৎ তার কানে এল তরুণ ব্যারিস্টারের প্রশ্ন, 'ভদ্রলোককে কোথা থেকে খুঁজে বার করলেন মিঃ সেন? কোনও মফঃস্বলের কোর্ট থেকে নিশ্চয়ই।'

'বিপ্রদাসকে এখন কলকাতা হাইকোর্টের সব চেয়ে পুরনো ব্যারিস্টার বললে বোধহয় ভুল হবে না।'

'বলেন কি মিঃ সেন। কিন্তু দীপক দত্তের মামলা আপনি ভদ্রলোককে দিলেন কেন?'

'দিলাম তিনটে কারণে। প্রথম—অন্য কোনো ব্যারিস্টার নিতে রাজী হলেন না। দ্বিতীয়—বিপ্রদাস আমার বিশেষ বন্ধু। বার লাইব্রেরীতে কেউ ওকে চেনে না এবং যাঁরা চেনেন তাঁরা ওকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন এটা আমার ভাল লাগছিল না। তাই, এমন একটা মামলা ওকে দিলাম যাতে সফল হলে, আজ যাঁরা ওঁকে তাচ্ছিল্য করছে কাল তাঁরাই ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। তৃতীয়—আমার বিশ্বাস বিপ্রদাস ইচ্ছে করলেই নিজেকে প্রতিভাবান ব্যারিস্টার বলে প্রমাণ করতে পারে।'

'মামলা এখনও শেষ হয়নি মিঃ সেন', বেশ বাঁকা সুরে বলল শ্যামল পালিত।

'ওর প্রতিভার প্রতি আমার আস্থা কিন্তু কিছুতেই শেষ হবে না মিঃ পালিত। কারণ ওর চরিত্রের সেই গুণের খবর আমার জানা আছে, যে গুণ আজকের দিনের তথাকথিত সুবিখ্যাতদের মধ্যে আর বিশেষ চোখে পড়ে না। ও কাজকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। কাজ নিলে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে।

সাক্ষ্য—ফরিয়াদী পক্ষে

হাইকোর্টের প্রশস্ত কক্ষে তিলধারণের জায়গা নেই। বেলা দশটা না বাজতে বাজতেই ঘর ভরে গেছে দর্শকে, উকিলে আর আমলায়। বৃথাই সংবাদপত্রগুলো হৈ চৈ করেনি! দর্শকের আসনে বিভিন্ন জাতের ও বয়সের পুরুষ এবং মহিলাদের দেখলেই প্রচারের সাফল্য বোঝা যায়। সকলেই উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে মামলা শুরু হবার আশায়। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে অতসীও। শুধু উৎসুক কেন, খুশীও হয়েছে অতসী। এত বড় একটা মামলায়, এত লোকের চোখের সামনে, সামনের সারিতে বসতে পাওয়াই ভাগ্যের কথা। তার ওপর বিপ্রদাস আবার অন্যান্য উকীল ব্যারিস্টারদের সংগে নিজের প্রধান সহকারিণী বলে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মনে মনে তাই বেশ একটু গর্বও হচ্ছিল অতসীর। কিন্তু ভাবটা স্থায়ী হচ্ছিল না। বিপ্রদাসের পানে তাকালেই মনটা কেমন মুষড়ে পড়ছিল তার। পাশেই বসেছিল বিপ্রদাস। এত ভীড়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই নেই ভদ্রলোকের। একমনে নথীর মাঝে ডুবে আছে সে, দেখলে মনে হয় যেন ধ্যান করছে। এত বলে কয়েও আজকের এই স্মরণীয় দিনে তাকে একটা ভাল গাউন পরাতে পারেনি অতসী। সেই উস্কোখুস্কো চুল, সেই আদি এবং অকৃত্রিম পুরনো গাউন। এমন কি একটা নতুন চশমা নেবারও দরকার পড়েনি। সেই আলগা চশমাটা বার বার নাকের ওপর ঝুলে পড়ছে। এইসব দেখে লোকে তাকে একটা গেঁয়ো উকিল ভেবে বসলে বলবার কিছু নেই।

গেঁয়ো উকিলই বটে। অন্তত শ্যামল পালিতের পাশে দাঁড় করালে তাই মনে হবে। শুধু চেহারায় আর পোশাকেই মাত করে দেবে পালিত, জিতে নেবে অর্ধেক মামলা। জন ছয়েক সহকারী বেষ্টিত হয়ে বসে আছে শ্যামল পালিত। তার সহকারীদের মধ্যেই নামজাদা একজন উকিল আর জন দুয়েক উদীয়মান ব্যারিস্টার রয়েছে। ছোট বড় তারার মাঝে জ্বল জ্বল করছে দীপ্ত এক গ্রহ। সত্যিই জ্বল জ্বল করছে পালিত, কথায়-হাসিতে, ভাবে-ভঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি, দেখে মনে হয় মামলার ফলাফল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই তার। হাসিমুখে জয়ের মালা পকেটে পুরে মামলার শেষে বেরিয়ে যাবে পালিত। আর তখন বিপ্রদাস, জবুথবু গেঁয়ো বিপ্রদাস কি করবে? প্রশ্নটার উত্তর ঠিক করতে না পেরে হতাশ হয়ে অতসী ফিরে তাকাল। চোখে পড়ল বিপ্রদাস মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে একমনে কি আলাপ করছে। বিদ্যালয়ের প্রধান মামলায় দোভাষীর কাজ করবেন। ভদ্রলোক নিজেরই আগ্রহে দায়িত্বটা নিয়েছেন। এরই মধ্যে মামলার রহস্যময় আকর্ষণ বা বিপ্রদাসের সরল অমায়িক ব্যবহারে ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। বিপ্রদাসকে নিয়ে আরো বারকতক গেছেন দীপকের কাছে, আন্তরিক চেষ্টায় তার কাছ থেকে কিছু

প্রয়োজনীয় তথ্যও আদায় করেছেন। দীপকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বলা যায়। সুতরাং দোভাষীর কাজের জন্যে এমন একজন লোককে পেয়ে খুশী হয়েছে বিপ্রদাস, নিশ্চিন্ত হয়েছেন কোর্টের কর্তৃপক্ষ।

হঠাৎ ঘরের একটানা মৃদু গুঞ্জন থেমে যেতেই চোখ ফেরাল অতসী। বিচারপতি এলেন বোধ হয়। দরজার দিকে চাইতেই তার মস্তিষ্ক থেকে একটা বরফের স্রোত নেমে আচ্ছন্ন করল সারা সত্তা। পাথরের মূর্তির মতন সে চেয়ে রইল প্রহরী বেষ্টিত দীপক দত্তর মূর্তির পানে। রাতে বিরাট এই চেহারা দেখলে সে অজ্ঞান হয়ে যেতো নিশ্চয়ই। বিপ্রদাসের মুখে সে দীপকের কথা অনেক শুনেছে। কিন্তু এই কি বিপ্রদাস বর্ণিত 'বেচারা, হতভাগ্য' দীপক দত্ত : দৈত্যের মতন লোমশ দীর্ঘ দেহের পাশে পুলিশগুলোকে যেন বামন বলে মনে হচ্ছে। বিরাট দেহাকৃতি বিস্ফারিত চিবুক এক জীবন্ত বিস্ময় যেন এসে দাঁড়াল কাঠগড়ায়। এ মানুষ নয়, সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ এক আদিম জীব বিশেষ। ভুল করেছে বিপ্রদাস। এর সর্বাঙ্গে পাশবিক হিংসার রেখা রয়েছে ছড়িয়ে। ভালোমানুষ বিপ্রদাসের দিকে চেয়ে, তার অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা ভেবে বিষাদাচ্ছন্ন হলো অতসীর অন্তর।

জুরীরা এসে আসন নিলেন। ঘরের গুঞ্জন একটু থেমে আবার জেগে উঠলো। আসন্ন অধিবেশনের প্রতীক্ষায় সকলেই উদগ্রীব। শান্ত, ভাবলেশহীন শুধু একজন। যাকে নিয়ে সকলের এই মাথাব্যথা, সেই দীপকই শুধু নির্লিপ্ত নির্বাক। মমির মতন তার মূর্তির দিকে চেয়ে অবাক হলো অতসী। ও কি জানে না যে কি মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ ওৎ পেতে আছে ওকে গ্রাস করবার জন্যে ? ওকি বুঝতে পারছে না যে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ও ? ও না পারুক, পেরেছে প্রতীক্ষারত প্রতিটি মানুষ। তাই নীরব, নিথর এই মূর্তিকে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে থেমে আসছে বিরাট কক্ষের কোলাহল। একটা অজানা অস্বস্তিতে চুপ করে যাচ্ছে সকলে।

আনমনা হয়ে পড়েছিল অতসী। চমক ভাঙলো বিচারপতির আগমন ঘোষণায়। আসন গ্রহণ করলেন প্রবীণ বিচারপতি। তাঁর পিছনে পিছনে এলেন এডভোকেট জেনারেল নগেন সোম। বিপ্রদাস অতসীকে বলেছিল যে নতুন পদ পেয়ে মেতে উঠেছেন এই দুর্দান্ত ব্যারিস্টার। ভদ্রলোকের একমাত্র লক্ষ্য দোষ প্রমাণ করে আসামীকে শাস্তি দেওয়া, তা সে কঠোরতম হলেও ক্ষতি নেই। বিপ্রদাসের কথায় সামান্য একটু শঙ্কার আভাস অতসীর কান এড়ায়নি। নগেন সোমের তীক্ষ্ন তীব্র সওয়ালের যুক্তিতে জুরী অভিভূত হওয়ার ভয়।

কোর্টের প্রাথমিক সব প্রথা, দুপক্ষের পরিচয়, মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী শেষ হলো। সংবাদপত্রের খবরই নতুন করে বলা হলো আর একবার। তারপর বিচারপতি আসামীকে প্রাথমিক জেরা আরম্ভ করলেন। আসামীর হাতে আঙুলের লিপি দিয়ে দোভাষী তাকে জানিয়ে দেবে আদালতের প্রশ্ন। আসামী উত্তর দেবে "ব্রেল" পদ্ধতির মারফত। তার উত্তর তারপর তর্জমা করে আদালতকে শুনিয়ে দেবে আর একজন বিশেষজ্ঞ। পদ্ধতিটা সময় সাপেক্ষ ; কিন্তু প্রশ্ন এবং

উত্তরের নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার পক্ষে এ ছাড়া গতি ছিল না। মন্থর-গতিতে এগিয়ে চললো মামলা।

'নাম?'

'দীপক দত্ত।'

'জন্মের সময় এবং স্থান?'

'১লা জানুয়ারী ১৯২৩, কলকাতা।'

'পিতার নাম?'

'নিবারণ দত্ত।'

'মাতার নাম?'

'শ্রীমতী রেবা দত্ত।'

'ভ্রাতা বা ভগ্নীর নাম?'

'একমাত্র ভগ্নী—নাম কল্যাণী।'

এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজিয়ে আদালতকে জানানো হলো দীপকের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস। জানানো হলো ধনী পিতার সন্তান দীপকের প্রথম দশবছর কাটে তাদের বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম বাড়ীতে। সেখানে তার একমাত্র সঙ্গী ছিল তার চেয়ে তিন বছরের বড়, ছোট্ট মেয়ে রুবি। রুবির বিধবা মা শ্রীমতী লিলি বসাক ছিল দীপকের বোন কল্যাণীর গভর্নেস্। রুবির বাবা প্রসাদ বসাক বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন। পড়া শেষ না করেই ফিরে এসেছিলেন ইংরেজ স্ত্রী নিয়ে। ফিরে এসেও নিজের দেশে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। শুধু মদ খেয়ে আর রেস খেলে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে রেখে হঠাৎ মারা যান ভদ্রলোক। তার পরই শ্রীমতী লিলি বসাকের চাকরী শুরু হয় দীপকদের বাড়ী।

দশ বছরের শিশু দীপককে পাঠানো হয় রামপুরহাট, ফাদার লরেন্সের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের জন্য। ধনী পিতার পক্ষে এ ব্যবস্থা করা কঠিন হয়নি। তারপর প্রায় বারো বছর দীপকের কাটে রামপুরহাটে, মিশনারিদের শিক্ষায়তনে। তার শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতিতে, তীক্ষ্ন বুদ্ধি আর অসাধারণ মেধায় তাক লেগে গিয়েছিল শিক্ষকদের।

কুড়ি বছর বয়সে সে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি, এ, পাশ করে। তারপরই ফাদার লরেন্সের উৎসাহে সে লেখায় হাত দেয়। তিন বছর বাদে বার হয় তার উপন্যাস 'নির্বাসিত আত্মা'। ইতিমধ্যে মিশনারিদের অনুগ্রহে রুবি এবং তার মা স্থান পেয়েছিল রামপুরহাটের শিক্ষায়তনে। বাল্যের সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল দীপকের সহকর্মিণী এবং সমমর্মিণী। অন্ধ-কালা-বোবার সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সবকিছু পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল রুবি। তার আন্তরিক সাহায্য না পেলে দীপক উপন্যাস রচনা করতে পারতো কিনা সন্দেহ।

'নির্বাসিত আত্মা' প্রকাশের ছ'মাস পরেই রামপুরহাটে তেইশ বছরের দীপকের সঙ্গে ছাব্বিশ বছরের রুবির বিয়ে হয়। তার ক'মাস পরেই আসে ইংলণ্ডের কতিপয় প্রতিষ্ঠান থেকে এই দম্পতিকে অন্ধ-কালা বোবাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে

বক্তৃতার আমন্ত্রণ। পাঁচবছর ইংলন্ড এবং ইউরোপে কেটে যায় এই দম্পাতর। ৮ রবাবর সাহায্যে এবং সাহচর্যে দীপক এই দীর্ঘ ভ্রমণে সর্বত্র প্রচুর সম্মান এবং সুখ্যাতি পায়। সাফল্যের সঙ্গে এই বিদেশ ভ্রমণ সেরে ফেরবার পথেই জাহাজে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়ে দীপক।

ফরিয়াদি পক্ষের প্রথম সাক্ষী এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ দেহ, কোঁকড়ানো চুল, সুদর্শন বিদেশীয় তরুণ একজন। আসামীর ভীতিপ্রদ আকৃতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অতসীর চোখ। গুমোট গরমের মাঝে মৃদু দখিনা হাওয়ার মতন এই সুন্দর সাক্ষীকে দেখে খুশী হলো তার মন। শুধু অতসী কেন, সেই ঘরের সকলেই, বিশেষ করে মহিলারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন সাক্ষীর জবানবন্দী শোনবার আশায়। শুরু হলো জবানবন্দী।

'নাম ?'

'পল হোমস।'

'জন্মের তারিখ এবং স্থান ?'

'১০ই এপ্রিল ১৯১৫, প্যারী।'

'জাতি ?'

'ফরাসী।'

'পেশা ?'

'ম্যাথু স্টানলী অ্যান্ড কোম্পানীর জাহাজ 'জলযাত্রার' ভান্ডারী।'

'জাহাজের সর্বোচ্চ শৌখীন শ্রেণীর কেবিনের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল আপনার ?'

'হ্যাঁ।'

'জাহাজের সর্বোচ্চ শৌখীন শ্রেণীর কেবিনের যাত্রী ছিলেন মিঃ রবার্ট বিচাম ?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আদালতকে বলুন গত ৫ই মে তারিখে কি অবস্থায় আপনি প্রথম জানতে পারলেন যে রবার্ট বিচাম খুন হয়েছেন ?'

'৫ই মে তারিখে মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমি বিশ্রাম করছিলাম। এইটা যাত্রীদেরও বিশ্রামের সময়। তাই আমাদের হাতে বিশেষ কিছু কাজ থাকে না। বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে যাত্রীদের বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটে এমন কিছু করা হয় না। সেদিন কিন্তু হঠাৎ কোষাধ্যক্ষের হুকুম এল সব কেবিন খুঁজে দেখবার। দীপক দত্ত নামে একজন যাত্রীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরই খোঁজ করতে হবে। মিঃ দত্তকে আমরা সকলেই চিনতাম। প্রায় প্রত্যহই তাঁকে ডেকে স্ত্রীর হাত ধরে বেড়াতে দেখেছি আমরা। আমাদের সকলের চোখ এড়িয়ে তাঁর নিশ্চিহ্ন হওয়ার খবরে একটু বিস্মিত হয়ে ছিলাম। আমরা কেবিনগুলোয় খোঁজ আরম্ভ করলাম। আমার চাবি দিয়ে প্রত্যেক কেবিনের দরজা ফাঁক করে ভেতরে একবার করে চোখ বুলিয়ে চললাম। প্রায় প্রত্যেক যাত্রীরই দিবানিদ্রা ভাঙলো আর ফলে দরজা বন্ধ করবার আগে আমাকে ক্ষমা চাইতে হলো। মিঃ বিচামের

কেবিনের সামনে এসে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। আশ্চর্য হলাম তাঁর কেবিনের দরজা সামান্য খোলা রয়েছে দেখে। আমি ঠেলে খুলতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। মনে হলো ভেতর থেকে দরজার উপর যেন একটা ভার চাপানো রয়েছে। জোরে ধাক্কা দিলাম। খুলে গেল দরজা। দরজার ওপর চাপানো ভারটা চোখে পড়তেই ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হলাম আমি। হাঁটু গেড়ে হুমড়ি খেয়ে দরজার ওপর পড়ে আছে মিঃ বিচামের দেহ—তার হাত দুটো ধরে আছে দরজার গোল হাতলটা। এক দৃষ্টিতেই বুঝলাম বিচামের দেহে প্রাণ নেই, আর দেহটা তখনো শক্ত কাঠ হয়ে যায়নি।'

একটু থেমে সাক্ষী আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'দেখলাম তাঁর ঘাড় থেকে রক্তের একটা ধারা পায়জামা বেয়ে নেমে গড়িয়ে পড়েছে কার্পেটে। রক্তটা সবে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।'

'মিঃ দত্ত বেহুঁশের মতন 'বাংকে' বসেছিলেন। ভয় পেলে মানুষ যেমন করে দেখে সেইভাবে চোখের সামনে হাত মেলে বসেছিলেন তিনি। প্রসারিত রক্তমাখা আঙ্গুলগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। চকিতে এই দৃশ্য দুটো দেখার পরই মনে হলো মিঃ বিচাম খুন হয়েছেন।

'আর এই দেখেই আপনি সিদ্ধান্ত করলেন যে মিঃ দত্ত মিঃ বিচামকে খুন করেছেন।' প্রশ্ন করল বিপ্রদাস। শোনা গেল শান্ত অবিচলিত সাক্ষীর উত্তর, 'আমি কোনো সিদ্ধান্তই করিনি।'

তারপর ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বলে চললেন, 'সেই মুহূর্তে আমার সামনে দুটি মাত্র লোক ছিল তাদের মধ্যে একজন মৃত আর একজন জীবিত। দুজনেরই অঙ্গে ছিল রক্তের দাগ। তাই বা কেন, সারা ঘরেই, বিছানায়, বালিশে, কার্পেটে সর্বত্রই রক্ত ছড়িয়ে ছিল। ঘরের বিশৃংখল অবস্থায় একটা জোর রকমের ধস্তাধস্তির সব চিহ্নই ছড়িয়ে ছিল।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তখন কি করলেন?'

'আমি বাইরে বেরিয়ে সাহায্যের জন্য আর একজন ভাণ্ডারীর কাছে দৌড়ে গেলাম। তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলাম দরজার বাইরে যাতে মিঃ দত্ত পালাতে না পারেন। তারপর গেলাম 'পারসার' মিঃ ব্লেকের খোঁজে। মিঃ ব্লেককে নিয়ে ফিরে এসে আমরা তিনজনেই আবার কেবিনে ঢুকলাম। দেখি মিঃ দত্ত তখনও একই জায়গায় ঠিক আগের ভঙ্গীতে মোহাবিষ্টের মতন বসে আছেন। মিঃ ব্লেক আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার দায়িত্বমুক্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

'তারপর?'

'আমরা সাবধানে মিঃ দত্তের কাছে এগিয়ে গেলাম। তাঁর কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না আমাদের জানা ছিল না। তাঁর কাছে বা আশেপাশে কোনো অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া গেল না। আমার মনে পড়ছে এই সময়ে মিঃ ব্লেক বলেছিলেন—আশ্চর্য! ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে মিঃ বিচামের দেহে অথচ ছুরির চিহ্নও কোথাও নাই। মিঃ দত্তই একমাত্র লোক যিনি ছুরি কোথায় তা বলতে পারতেন, কিন্তু দুঃর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা নেই। যাই হোক ছুরির কথা পরে ভাবা

যাবে। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে মিঃ দত্তকে নিয়ে জাহাজের 'সেলে' আটক করা। আমার সন্দেহ নেই যে খুন উনিই করেছেন।

'মিঃ দত্তের কাছ থেকে কোনো বাধা না পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। মনে হলো খুন করবার পরমুহূর্তেই ভদ্রলোক ভাগ্যের হাতে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছিলেন 'বাঙ্কে'। তারপর একচুলও নড়েননি সেখান থেকে। যেন ধরা দেবার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, হয়তো তার অবস্থায় পালানো সম্ভব ছিল না বলেই নিরীহ শিশুর মতন মিঃ ব্লেক আর আমার সঙ্গে তিনি সোজা চলে এলেন 'সেলে'। অপর ভাণ্ডারী রইল কেবিনের পাহারায়। আমি 'সেলের' দরজায় প্রায় আধ ঘণ্টা পাহারায় ছিলাম। তারপর কাপ্তেনের হুকুমে আর একজন নাবিক এল পাহারা দেবার জন্যে।'

'আর আপনি আবার ফিরে গেলেন কেবিনে?'

'হ্যাঁ—ফিরে গিয়ে দেখলাম জাহাজের কাপ্তেন কেবিনের দরজা বন্ধ করে সীল করে দিয়েছেন। আমার ওপর হুকুম হলো যে কোনো কারণেই যেন আমার চাবি দিয়ে আমি দরজা না খুলি। কলকাতায় পৌঁছবার আগে কেবিনের যা কিছু যেখানে যেমন ছিল সেইমত রাখবার ব্যবস্থা হলো। এ ছাড়া জাহাজের সব কর্মচারীকেই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে নিষেধ করা হলো। যাত্রীরা জানতে পারবে ঠিকই, কিন্তু গায়ে পড়ে কিছু জানানো হয় এটা কাপ্তেন চাননি।'

'ধন্যবাদ মিঃ হোমস্। আপনি এবার আসতে পারেন। দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকা হোক,' আদালতের ঘোষণা শোনা গেল।

দ্বিতীয় সাক্ষী জাহাজের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ব্লেক এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সাক্ষ্য ভাণ্ডারীর বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ ব্লেক, আগের সাক্ষী মিঃ হোমস্ বলেছেন যে আপনি কেবিনে ঢুকে কোনো অস্ত্র না দেখতে পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম এবং পরে যখন অনেক খোঁজ করেও কোনো অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন বিস্মিত না হয়ে পারিনি।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করলেন, 'বিস্মিত হবার মতন কিছু সত্যিই ঘটেনি। নির্দিষ্ট সময়েই আদালত আসামীর লিখিত জবানবন্দী শুনে বুঝতে পারবেন যে সে কি উপায়ে অস্ত্রটা গোপন করেছিল।'

বিচারপতি চশমার আড়ালে একবার অ্যাডভোকেট জেনারেলের দিকে চেয়ে সাক্ষীকে বললেন, 'আচ্ছা, এইবার আপনি আসামীকে জাহাজের 'সেলে' আটক করবার পর কি করলেন তাই বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর, 'আসামী পক্ষের ধারণা যে মিঃ ব্লেকের পক্ষে নিজের দায়িত্বে মিঃ দত্তকে আটক করা অসঙ্গত, শুধু অসঙ্গত নয়, অত্যন্ত হঠকারিতা হয়েছিল। হঠকারিতা হয়েছিল এইজন্যে যে মিঃ বিচামকে যে মিঃ দত্ত খুন করেছেন এমন কোনো প্রমাণই তিনি পাননি।'

বিপ্রদাসের কথা শুনে এইবার সত্যিই বিস্ময় বিমূঢ় হলেন কোষাধ্যক্ষ।

চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'প্রমাণ ছিল না ? এ কথার অর্থই বা কি ! জাহাজে সেই মুহূর্তে সেই অবস্থায় যে-কোনো লোকই আমি যা করেছিলাম তাই করতেন। তাহলে কি নিহত ব্যক্তির পাশে বসে থাকতে দেখেও, সেই রক্তমাখা হাত নিয়ে মিঃ দত্তকে সকলের মাঝে বেড়িয়ে বেড়াবার সুযোগ দিলেই ঠিক হতো ?'

এইখানে শোনা গেল শ্যামল পালিতের তীব্র মধুর কণ্ঠস্বর, 'আসামী পক্ষের এই সাক্ষীকে বাধা দানের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমার ধারণায় মিঃ ব্লেক তাঁর কর্তব্য যথাযথই পালন করেছিলেন এবং তিনি যে অসঙ্গত কিছুই করেন নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় আটক হবার একঘণ্টা পরেই একাধিক সাক্ষীর সামনে আসামীর স্বীকারোক্তি থেকে।' বিচারপতি আবার একবার চশমার ফাঁকে চেয়ে একটু জোর গলায় বললেন, 'এ ব্যাপারে দু'পক্ষের বক্তব্যই আদালত শুনেছে।' তারপর সাক্ষীর দিকে ফিরে বললেন, 'এইবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন মিঃ ব্লেক।'

সাক্ষী বলে চললেন, 'মিঃ দত্তকে জাহাজের 'সেলে' আটক করে আমি তখনই কাপ্তেনকে জানালাম। জাহাজের ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তেন এবং আমি কেবিনে ফিরে গেলাম। এক মিঃ দত্ত ছাড়া কেবিনের আর কিছুই নড়চড় হয়নি। মৃতদেহ ঠিক আগের অবস্থাতেই দরজার হাতল আঁকড়ে পড়েছিল। ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন। তারপর কাপ্তেন এবং আমি, আমার ঘরে ফিরে গেলাম। যাবার পথেই আমরা দু'জনে পরামর্শের পর দুর্ঘটনার সংবাদটা মিসেস দত্তকে দেওয়া স্থির করি। আমার মুখে সংবাদটা শোনামাত্র ভদ্রমহিলা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান হলে পর তিনি আমাদের সঙ্গে জাহাজের 'সেলে' গিয়ে আমাদের এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে দোভাষীর কাজ করতে রাজী হলেন। এই সব কাজই আমরা যথাসম্ভব গোপনে করেছিলাম। তবে কলকাতার অফিসে বেতারে সংবাদটা জানানো হয়েছিল। সাংকেতিক ভাষা ব্যবহৃত হলেও, খবরটা যেমন করেই হোক ফাঁস হয়ে যায়। পরদিন সন্ধ্যাবেলাতে জাহাজের প্রায় সব যাত্রীই খুনের খবরটা জানতে পারেন।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দীপক দত্ত কি রকম আচরণ করলেন। ?'

'নিথর নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। স্ত্রীর মারফত তিনি শুধু বললেন —আমি মিঃ বিচামকে খুন করেছি। আমি আমার এই কাজ অস্বীকার করছি না এবং যা করেছি তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই। 'ব্রেল' পদ্ধতিতে তিনি নিজে এই কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন। কাপ্তেন এই জবানবন্দীটা নিজের কাছে রাখেন এবং পরে কলকাতায় পুলিসের হাতে সমর্পণ করেন।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল বললেন, 'এই জবানবন্দী আদালতের নথীভুক্ত হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল শ্যামল পালিতের সুরেলা কণ্ঠ, 'আসামীর এই

লিখিত স্বীকৃতির প্রতি আমি জরুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মিঃ বিক্রমকে খুনের দায়িত্ব সজ্ঞানে স্বীকারের গুরুত্ব যেন আমরা না ভুলি।'

পালিতের কথা শেষ হতেই বিপ্রদাস দাঁড়িয়ে উঠে সাক্ষীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'স্বামীর মুখে এই স্বীকৃতি শোনার পর মিসেস দত্ত কি করলেন তা আদালতকে জানাবেন কি?'

সাক্ষী বললেন, 'আমার বেশ মনে আছে এই সময়ে অদ্ভুত সাহস এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন মিসেস দত্ত। স্বামীর 'ব্রেল' পদ্ধতিতে দেওয়া উত্তর তিনি নিজে অনুবাদ করে বেশ সহজভাবে পড়ে শোনালেন আমাদের। তারপর নিজের থেকেই বলে উঠলেন, খুনের দায়িত্ব দীপক স্বীকার করছে ঠিকই, কিন্তু আমি জানি এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। কারুকে খুন করা দীপকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর তাছাড়া যাকে সে কখনো দেখেনি, যাকে আমরা দু'জন কোনো দিনই জানি না আর যার সঙ্গে জাহাজে সামান্যতম পরিচয়ও আমাদের হয়নি, এমন একজন লোককে সে খুন করতে যাবেই বা কেন?'

বিচারপতি শুধোলেন, 'আপনি কি মিসেস দত্তের কথা হুবহু উদ্ধৃত করছেন?'

'হ্যাঁ, হুবহু মিসেস দত্তের কথা।'

দাঁড়িয়ে উঠে বিপ্রদাস বলল, 'মিসেস দত্তের এই স্বামীর দোষ সম্পূর্ণ অস্বীকার করার তাৎপর্যের প্রতি আমি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলেন নগেন সোম, 'অস্বীকার না করলেই বরঞ্চ সেটা তাৎপর্যপূর্ণ না হোক অন্ততঃ বিস্ময়কর কিছু হতো।'

বিপ্রদাস জবাব দিলেন, 'একটু আগেই এই মামলাতে বেশী বিস্ময়কর অনেক কিছু আদালতের শোনা হয়ে গেছে।'

বিচারপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'আসামী পক্ষের আর কিছু প্রশ্ন করবার আছে কি?'

আর কিছু নেই জানিয়ে বসে পড়ল বিপ্রদাস। তৃতীয় সাক্ষী ছিলেন জাহাজের কাপ্তেন। তিনি বললেন: 'খুনের খবর আমি প্রথম পাই জাহাজের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ব্রেকের কাছে। আসামীকে জাহাজের 'সেলে' আটক করার পর তিনি খবরটা আমাকে জানান। জাহাজের নিয়মানুযায়ী আমার হুকুম ছাড়া কোনো যাত্রী বা কর্মচারীকে আটক করার অধিকার কারুর নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ শোনার পর মিঃ ব্রেকের কাজ আমি সমর্থন করেছিলাম। সব শোনার পর জাহাজের ডাক্তার এবং মিঃ ব্রেককে সঙ্গে নিয়ে কেবিনের সামনে গিয়ে দেখলাম দরজার সামনে একজন ভাণ্ডারী পাহারা দিচ্ছে। আমি কেবিনটা একবার দেখে নিলাম, দেখলাম কোনো জিনিসের নড়চড় হয়নি। তারপর কেবিনের দরজা বন্ধ করে সীল করে দিলাম। কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে সমস্যা রয়ে গেল। কলকাতায় পৌঁছতে তখনও বেশ কয়েকদিন দেরী। কেবিনে পড়ে থাকলে মৃতদেহ ততদিনে পচে উঠবে। তাই ডাক্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ

পরীক্ষা শেষ করবার পর আমি রাত্রে গোপনে মৃতদেহ জাহাজের একটা বড় রেফ্রিজারেটারে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করলাম। এই ব্যবস্থার ফলে কলকাতায় পৌঁছে সম্পূর্ণ অবিকৃত মৃতদেহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তারপর আমরা মিঃ ব্রেকের কামরায় যাই। সেইখানেই অত্যন্ত সাবধানে দুর্ঘটনার খবর মিসেস দত্তকে দেওয়া হয়।'

বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'মিসেস দত্ত শুনে কি বললেন ?'

'শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনেক বোঝানোর পর তিনি আমাদের সঙ্গে জাহাজের 'সেলে' যেতে সম্মত হন।'

'মুখোমুখি হবার পর স্বামী স্ত্রী কি রকম আচরণ করেছিলেন ?'

'অতি করুণ সে দৃশ্য। মিসেস দত্ত ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামীর বুকে। আকুল আবেগে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিলেন স্বামী। স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে কেঁদে উঠে বললেন মিসেস দত্ত ঃ দীপক, আমি জানি তুমি খুন করোনি, তুমি খুন করতে পারো না।'

'আমার আর একটা প্রশ্ন আছে,' বলল বিপ্রদাস, 'মিসেস দত্ত কি সেই আবেগবিহ্বল মুহূর্তে স্বামীর হাত ধরেছিলেন ?'

'হাত ধরেছিলেন ?' অকস্মাৎ প্রশ্নটা শুনে বিপ্রদাসের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন কাপ্তেন। তারপর আমতা আমতা করে বললেন, 'ঠিক মনে করতে পারছি না··· মানে খুব সম্ভব ধরেছিলেন।'

বিপ্রদাস বেশ দৃঢ় গলায় বললে, 'ভেবে চিন্তে সঠিক উত্তর দিন। এই মামলার পক্ষে উত্তরটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

পরক্ষণেই শ্যামল পালিতের তীক্ষ্ম রোষদীপ্ত কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল সারা কক্ষে, 'আসামী পক্ষ থেকে একজন দায়িত্বশীল এবং ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর বক্তব্যকে এভাবে অযথা প্রশ্ন তুলে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করছি!'

বিপ্রদাস তার চিরাচরিত শান্ত ভঙ্গীতে থেমে থেমে বলল, 'আমার বন্ধু দায়িত্বশীল, ন্যায়নিষ্ঠ ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শুধু বিশেষণ বললেই চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশেষ একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই মামলার ওপর একজনের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। এখানে তাই অতি সামান্য কথার গুরুত্বও কম নয়। যেমন আমার বন্ধু বুঝতে পারেননি যে কেন আমি প্রশ্নটার ওপর এত জোর দিচ্ছি। জোর দিচ্ছি এই জন্যে যে হাতধরা অবস্থায় এই দম্পতি কাপ্তেন বা অন্যদের সম্পূর্ণ অগোচরে সাঙ্কেতিক পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করতে সক্ষম।'

নগেন সোম তাঁর পাশনের ফিতে নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলেন, 'যদি দু'জনে সক্ষম হয়েই থাকে, যদি পরস্পরে অন্যের অগোচরে ভাব বিনিময় করেই থাকে—তাতে মামলার পক্ষে এমন কি সুরাহা হবে ?'

'অনেক কিছু হবে এবং ঠিক কি হবে সেটা পরে আমার বন্ধুকে আমিই জানিয়ে দেব। এখন শুধু এই ব্যাপারটার প্রতি জুরীর মনোযোগ আকর্ষণ

করাই আমার লক্ষ্য।' কথা শেষ করে বসে পড়ল বিপ্রদাস।

বিচারপতি সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, 'জাহাজের 'সেলে' তার পর কি হলো বলুন ?'

'তারপর আমি স্ত্রীর সাহায্যে স্বামীকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। উত্তর গুলো 'ব্রেল' পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হয়, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম মিসেস্ দত্তের সঙ্গেই ছিল। তারপর মিঃ ব্রেক তার ইংরাজী তর্জমা করেন। কাগজপত্র সব মিঃ ব্রেকের কাছেই থাকে।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে জানালেন, 'কাগজপত্র আদালতের নথীভুক্ত হয়েছে।'

বিচারপতির আদেশে পড়া হলো সেই প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রথম প্রশ্ন, 'আপনি কি মিঃ বিচামকে হত্যা করেছেন ?'

উত্তর, 'হ্যাঁ।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'কি দিয়ে আপনি মিঃ বিচামকে হত্যা করেছেন ?'

উত্তর, 'কাগজকাটা একটা ছুরি দিয়ে !'

প্রশ্ন, 'কি ধরনের কাগজকাটা ছুরি ?'

উত্তর, 'জাহাজ কোম্পানির দেওয়া যে ছুরি প্রত্যেক যাত্রীর বিছানার পাশের টেবিলে থাকে। আমার টেবিলেও একটা ওই ছুরি আছে।'

প্রশ্ন, 'যে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছেন, সেই ছুরিটা কোথায় ?'

উত্তর, 'আমি পোর্টহোল দিয়ে সেটাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছি।'

প্রশ্ন, 'দোষ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আপনি ছুরিটা ফেলে দিলেন কেন ?'

উত্তর, 'ছুরিটার অস্তিত্বে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম।'

প্রশ্ন, 'হত্যার আগে আপনি কি মিঃ বিচামকে জানতেন ?'

উত্তর, 'না।'

প্রশ্ন, 'তাহলে আপনি কেন তাঁকে হত্যা করলেন ?'

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

পরের প্রশ্ন, 'কিছু অপহরণের উদ্দেশ্যে কি খুন করেছিলেন ?'

উত্তর, 'না।'

প্রশ্ন, 'মিঃ বিচাম কি কোনো কারণে আপনার প্রতি অন্যায় বা আপনাকে অপমান করেছিলেন ?'

এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। এবং এর-পরেই মিঃ দত্ত আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। পড়া শেষ হলে বিচারপতি সাক্ষীর দিকে ফিরে বললেন, 'তারপর ?' সাক্ষী উত্তর দিলেন, 'আমরা তখন নিরুপায় হয়ে মিসেস দত্তকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসি। মিসেস দত্ত বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে মুষড়ে পড়লেও পরক্ষণেই সামলে নিয়ে স্বামীকে চুম্বন করার পর আমাদের অনুসরণ করেন।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'এরপরে জাহাজে আর স্বামী-স্ত্রীর দেখা

হয়েছিল কি ?'

'প্রত্যহই আমি এবং কোষাধ্যক্ষ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামীর সামনে যেতাম। তাঁকে না নিয়ে গিয়ে আমাদের কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ জাহাজে তিনিই ছিলেন একমাত্র দোভাষী। জাহাজের ডাক্তার স্বামী এবং স্ত্রীর একান্তে দেখা যাতে না হয় সেটা দেখতে বলেছিলেন। ডাক্তার অবশ্য মিঃ দত্তের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার কোনো লক্ষণই দেখতে পাননি। তবু তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলেই মিঃ দত্ত মিঃ বিচামকে খুন করেছিলেন এবং তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন এই ভেবে যে সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির পুনরাক্রমণ হলে, মিঃ দত্তের পক্ষে স্ত্রীকে খুন করাও অসম্ভব নয়।'

'পরবর্তী দেখা হওয়ার দিনগুলোতে কি কি ঘটেছিল ?'

'প্রত্যেক দিন মিসেস দত্ত স্বামীর কাছ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীর নির্বিকার নীরবতা ক্রমশঃই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। তিনি স্বামীর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রশ্নের উত্তর দিলে স্বামীরই মঙ্গল হবে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা স্বামীর নীরবতার পাষাণ প্রাচীরে বাধা পেয়ে বিফল হয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয় জাহাজ কলকাতা বন্দরে লাগবার ঘণ্টা তিনেক আগে। মিসেস দত্তের সেই মুহূর্তের করুণ অনুনয় এখনও আমার কানে বাজছে। স্বামীর হাত ধরে তিনি বার বার বললেন—দীপক, আমি জানি তুমি খুন করোনি, করতে পারো না। তবু, তবু কেন তুমি সেধে মৃত্যুকে বরণ করতে চাইছো ? সেদিন আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম মিসেস দত্ত আঙ্গুলের সংকেতে স্বামীর সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। স্বামী হাত ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলেন,—ভাবখানা যেন, তাঁর সম্বন্ধে কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তিন ঘণ্টা পরে আমরা মিঃ দত্তকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করলাম।'

কাপ্তেন নেমে দাঁড়াতেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় এলেন জাহাজের ডাক্তার।

বিচারপতি সাক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জাহাজের কেবিনে মিঃ বিচামের মৃতদেহ আপনি পরীক্ষা করেছিলেন। সেই পরীক্ষার ফলাফল বলুন।'

'প্রথমেই আমি লক্ষ্য করলাম যে মিঃ বিচামের ঘাড়ের রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হয়েছে। ফলে কয়েক সেকেণ্ড পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। আঘাতের চিহ্ন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁর দেহে কোনো তীক্ষ্ম ছোট কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মিঃ ব্লেক ওই ধরনের একটা কাগজ কাটা ছুরি দেখাবার পর আমি খুনীর ব্যবহৃত অস্ত্রের আকৃতি সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হই।'

'তাহলে আপনার মতে মৃত্যুর অন্য কোনো কারণ থাকতেই পারে না ?'

'না। শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ফুসফুস থেকে মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ বিচামের মৃত্যু হয়েছিল।'

এই সময় অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'জাহাজের 'সেলে' দীপক দত্তকে কাপ্তেনের হুকুমে আপনি পরীক্ষা করেছিলেন, তার ফলাফল

জানাবেন কি ?'

'হ্যাঁ, আমি পরীক্ষা করেছিলাম। প্রথম দিন অবশ্য খ্‌ুঁটিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারপর প্রত্যেক দিন কাপ্তেন ইত্যাদির সঙ্গে আমি 'সেলে' গেছি এবং কোনো দিনই তার দেহে বা মনে সামান্য বিকৃতির লক্ষণও দেখতে পাইনি। কলকাতায় প্রথমেই আমি প্‌ুলিশের অফিসার এবং ডাক্তারকে আমার ধারণার কথা জানাই। তারপর প্‌ুলিশের অফিসার ও ডাক্তারের সঙ্গে আমি প্রথমে জাহাজের রেফ্রিজারেটারে শোয়ানো মিঃ বিচামের ম্‌ৃতদেহ পরীক্ষার পর মিঃ দত্তের 'সেলে' যাই। প্‌ুলিশের অফিসার একজন দোভাষী সঙ্গে এনেছিলেন। সেই দোভাষীর সাহায্যে প্রথমে মিঃ দত্তকে চিকিৎসা শাস্ত্রান্‌ুযায়ী পরীক্ষার জন্য কিছ্‌ু প্রশ্ন করা হয়। তারপর প্‌ুঙ্খান্‌ুপ্‌ুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়। এই সব কিছ্‌ুর পরও আমার প্‌ূর্ব ধারণা পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয়নি।'

'কি আপনার সেই ধারণা ?'

'মিঃ দত্ত দ্‌ুর্ভাগ্যক্রমে আজন্ম অন্ধ-ম্‌ূক-বধির হওয়া সত্ত্বেও অন্য সব বিষয়ে তার মানসিক এবং দৈহিক স্‌ুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল চশমা আঙ্গ্‌ুলের ফাঁকে নাচাতে নাচাতে বললেন, 'সাক্ষী এখনই যা বললেন ঠিক এই কথাই তিনি এবং প্‌ুলিশের ডাক্তার তাঁদের লিখিত রিপোর্টে বলেছেন। এই থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই সম্ভব। সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, দীপক দত্তের স্বীকারোক্তি মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল নয় বা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অসংলগ্ন চিন্তার ফল নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন সম্প্‌ূর্ণ স্‌ুস্থ, স্থিরমস্তিষ্ক মান্‌ুষ সজ্ঞানে যা সত্য তাই স্বীকার করেছে। স্‌ুতরাং এই বিশেষ ব্যাপারটা আদালতকে মনে রাখতে অন্‌ুরোধ করি।'

বিপ্রদাস এই ব্যঞ্জনাময় বক্তৃতা শ্‌ুনতে শ্‌ুনতে একবারও বক্তার ম্‌ুখের পানে চাওয়া প্রয়োজন মনে করল না। সত্যি বলতে কি ডাক্তারের সাক্ষ্যতে সে কান দেয়নি এবং মন দিল না অ্যাডভোকেট জেনারেলের এই বিশ্লেষণে। একমনে একটা নথী পড়ে চলল।

চতুর্থ সাক্ষী নেমে দাঁড়াবার পর বিচারপতির হ্‌ুকুমে চিকিৎসকদের লিখিত রিপোর্ট পড়ে শোনান হলো। তারপর ডাক পড়ল পঞ্চম সাক্ষীর।

প্‌ুলিশ অফিসার বললেন :

'আমি ম্‌ৃতদেহ দেখার পর ঘটনাস্থল জাহাজের কেবিনে যাই। সেখানে চাদর, বালিশ ইত্যাদি থেকে গোটাকতক আঙ্গ্‌ুলের ছাপ তুলে নিলাম। চাদরের একটা ধারে খ্‌ুনী তার হাত ম্‌ুছেছিল। সেখানে গোটাকতক বেশ স্পষ্ট ছাপ পেলাম। এর পর আমি জাহাজের কাপ্তেন, কোষাধ্যক্ষ ভাণ্ডারী আর ডাক্তারের জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করে সারা ঘটনাটা ঠিকমত সাজিয়ে নিলাম।'

'এই সাজাবার ব্যাপারে সাহায্য হবে ভেবে আমি মিঃ দত্তকে 'সেল' থেকে

কেবিনে আনাবার ব্যবস্থা করলাম। কেবিনের দরজায় পা দিয়েই কিন্তু তিনি বিকৃত এক চিৎকার তুলে পালাবার চেষ্টা করলেন। আমার লোকেরা তাঁকে ধরে জোর করে কেবিনে ঢুকিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে আমি একজন পুলিশকে মৃত মিঃ বিচামের পাজামা পরিয়ে কেবিনের বিছানায় সামান্য পাশ ফিরে শুইয়ে দিয়েছিলাম। বিছানার পাশের টেবিলে রেখেছিলাম যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য জাহাজের দেওয়া একটা কাগজকাটা ছুরি। মিঃ দত্ত কেবিনে ঢুকতেই তাঁকে আলগা ভাবে সেই টেবিলের দিকে ঠেলে দিলাম। এই ঠেলার ফলে তাঁর দেহে লাগল বিছানায় শোয়ানো পুলিশের দেহের সামান্য স্পর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবার এক ভয়ার্ত বিকৃত চিৎকার তুলে মিঃ দত্ত এক লাফে দূরে সরে গেলেন। এইবার আমি তাঁর ডান হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এলাম। টেবিলের কাছে এসে তাঁর ডান হাতটা রেখেছিলাম সেই ছুরির ওপর। দেখলাম এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে কাঁপছে তাঁর হাত, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন শিউরে শিউরে উঠছে তাঁর সারা দেহ। ধীরে ধীরে থামলো সেই কম্পন। ঝড়ের পর শান্ত প্রকৃতির মতন নিথর নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ দত্ত। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতে চেপে ধরলেন শায়িত ব্যক্তিকে, যাতে সে নড়তে না পারে। ডান হাতে বাগিয়ে ধরলেন টেবিলের ছুরি। উঠে গেল সেই ডান হাত, শূন্যে মুহূর্তের জন্য দুলে উঠলো ছুরি। প্রচণ্ড বেগে শায়িত ব্যক্তির ঘাড় লক্ষ্য করে নামবার মাঝ পথেই আমি ধরে ফেললাম সেই ডান হাত। মুহূর্তের এদিক ওদিকে সেদিন দ্বিতীয় হত্যা সংঘটিত হবার সম্ভাবনা ছিল।

'এই পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম এই অন্ধ লোকটির ঠিক যন্ত্রের মতন চলাফেরার ভাবভঙ্গী এমন কি আধফেরা ঘাড়ে আঘাতের স্থানটির নিশানা করা পর্যন্ত দেখে। মনে হলো যেন এই ব্যাপারের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর মুখস্থ। আর একটা সমস্যার সমাধানও আমি করতে পারলাম না। কিছুতেই ভেবে পেলাম না যে ঘাড়ের শির ছিঁড়ে যাবার পরও মিঃ বিচামের পক্ষে বিছানা থেকে দরজা পর্যন্ত কি করে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। আমাদের ডাক্তার অবশ্য বললেন যে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দেহের প্রচণ্ড উৎক্ষেপে এইভাবে ছিটকে পড়া অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের মতটা মেনে নিতে পারিনি। পারিনি তার কারণ কেবিনের তছনছ অবস্থা এবং এখানে সেখানে রক্ত দেখে একটা ধস্তাধস্তি সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। অথবা ধরে নিতে হয় যে আহত ব্যক্তির দরজার দিকে যাবার চেষ্টায় খুনী বাধা দেবার ফলেই এই বিশৃঙ্খল অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সবটাই অনুমান মাত্র। এই সমস্যা দুটোর সমাধান আমি আজও করতে পারিনি। মিঃ দত্ত যতদিন চুপ করে থাকবেন ততদিন হয়তো করাও যাবে না।

'এই সঙ্গে আমি আর একটা পরীক্ষাও করেছিলাম। আমি একজন পুলিশকে মিঃ বিচামের পায়জামা পরা অবস্থায় মৃতদেহ যেখানে যেমনভাবে ছিল ঠিক সেইভাবে হাঁটুগেড়ে হাতলধরা অবস্থায় বসিয়ে দিলাম। তারপর মিঃ দত্তকে দরজার দিকে দুই প্রহরীর মাঝখানে হেঁটে যেতে দিলাম। তিনি

হাত সামনে বাড়িয়ে সন্তর্পণে পথ চিনে এগিয়ে চললেন। দরজার কাছে এসে হাতড়াতে গিয়ে আঙুল আমার সাজানো পুলিশের ঘাড়ে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ম এক আর্তনাদ তুলে তিনি ছিটকে চলে গেলেন কেবিনের অপর প্রান্তে। প্রহরী দু'জন ধরে টেনে আনতে গেল। তিনি সটান তাদের উল্টে ফেলে মেঝের উপর শুয়ে পড়লেন। দেখলাম দৈত্যের মতন শক্তি এই লোকটির গায়ে। বুঝলাম টেনে তাঁকে দরজার কাছে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। চকিতে আর একটা মতলব এসে গেল মাথায়। মনে হলো এই মুহূর্তে লোকটির মানসিক সংযম একের পর এক আঘাতে শিথিল হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এই দুর্বলতার সুযোগে মনের কথা টেনে বার করার চেষ্টা করা যেতে পারে। একটু পরে তিনি উঠে বসতেই আমার দোভাষী কাজে লেগে গেল। কিন্তু বৃথা, মিঃ দত্তর অদ্ভুত সংযমের কাছে আমার সব মতলবই ব্যর্থ হলো। একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে তখন তাঁর আঙুলের ছাপ নিলাম। দেখলাম বিছানা, টেবিল ইত্যাদি থেকে তোলা ছাপের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তাঁর আঙুলের ছাপ। এই কাজ শেষ করে আবার একবার দোভাষীকে লাগালাম প্রশ্নের উত্তরের আশায়। বহু প্রশ্নের মধ্যে উত্তর পেলাম একটি মাত্র প্রশ্নের— আপনি কি মিঃ বিচামকে খুন করেছেন? ত্বরিতে উত্তর এল 'হ্যাঁ' করেছি, যা করেছি তা ঠিকই করেছি এবং প্রয়োজন হলে আবার করতে দ্বিধা করবো না। প্রশ্ন করলাম—কাগজকাটা যে ছুরি তাঁর হাতে দিয়েছিলাম সেইরকম ছুরি দিয়ে হত্যা করেছেন কি না। উত্তরে তিনি শুধু কাঁধটা একটু দোলালেন অর্থাৎ খুন যে করেছি এইটুকুই তো যথেষ্ট, কি দিয়ে করেছি তা অবান্তর। পরের প্রশ্ন—এই মাত্র তাঁর শায়িত ব্যক্তিকে আক্রমণের চেষ্টার সঙ্গে মিঃ বিচামকে আক্রমণের মিল আছে কি?—এর কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। এবং তারপর মিঃ দত্ত নিস্পন্দ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন। হাল ছেড়ে দিয়ে কেবিনটা ভাল করে খোঁজা হলো। কিছু চুরি গেছে বলে মনে হলো না। বেশ বোঝা গেল যে কিছু চুরি করা খুনের উদ্দেশ্য নয়। খুনের আগে মিঃ দত্ত যে মিঃ বিচামকে জানতেন না এও প্রায় নিশ্চিত। সুতরাং খুনের উদ্দেশ্য নির্ধারণের মতো কোনো সূত্রই আমি পাইনি। মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে যে এমন বিচিত্র হত্যা এক মাত্র কোনো উন্মাদ অথবা স্যাডিস্টের পক্ষেই সম্ভব। পরে আমারই হেফাজতে মিঃ দত্তকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।'

পরের সাক্ষী এলেন শহরের এক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসক। বিচারপতি বললেন, 'দীপক দত্তের দৈহিক এবং মানসিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত কমিশনের সভাপতি হিসাবে পরীক্ষার ফলাফল আদালতকে জানানোর জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।'

সাক্ষী বললেন:

'কমিশনের অন্য দু'জন সভ্য এবং আমি নিজে সবসুদ্ধ ছ'বার মিঃ দত্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করেছি। আমাদের পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ পুলিশের কাছে আছে। আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে মিঃ দত্ত আজন্ম

অন্ধ-মূক-বধির হলেও অন্যান্য সব বিচারে একজন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। শুধু তাই নয়, তাঁর ধীশক্তি সাধারণ মাপকাঠির তুলনায় অনেক, অনেক উচ্চস্তরের। এই বিশেষ দৈহিক অবস্থার উপযোগী, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ভাব আদানপ্রদানের প্রচলিত প্রত্যেকটি মাধ্যম তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। সুতরাং তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিলে ধরে নিতে হবে যে স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন না। আর বেশী কিছু জানবার থাকলে আদালত আমাদের লিখিত রিপোর্ট দেখতে পারেন।'

অতসী এতক্ষণ একমনে একের পর এক সাক্ষীর জবানবন্দী শুনছিল। মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসকের বক্তব্য শেষ হতে সে একবার বিপ্রদাসের পানে না চেয়ে পারল না। দেখল বিপ্রদাস চেয়ারে বেশ এলিয়ে বসে চোখ বুঁজে কি যেন খুব গভীরভাবে ভাবছে। চশমাটা যে ঝুলে নাকে এসে পড়েছে সেটুকুও খেয়াল নেই। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে অতসী বলল, 'কেমন বুঝছেন বলুন তো?'

বিপ্রদাস চোখদুটো একবার মিট্‌মিট্‌ করে একটু হেসে বলল, 'ভদ্রে, ধৈর্য ধর······।' তার পরই চোখ বুঁজে ডুবে গেল চিন্তায়।

অতসী বুঝল দীপক দত্তের মতনই তার শিক্ষক এখন মনের কথা বলতে একান্ত নারাজ। ঘাড় ফেরাতে যাবে, শুনল বিপ্রদাস নিজের মনেই যেন বিড় বিড় করে বলছে, সম্ভবতঃ চিন্তার পর টানছে উপসংহারের কোনো রেখা। কান পাততেই বিপ্রদাস যেন তাকে শুনিয়েই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'প্রথম দিন নথীপত্র পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটা মাত্র প্রমাণ সর্বক্ষণ আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে রয়েছে। আঙ্গুলের ছাপ·····এই সর্বনাশা আঙ্গুলের ছাপের প্রমাণেই দেখছি ভরাডুবি হবে। আমার ধারণা হতভাগাটা ইচ্ছে করে কেবিনের সর্বত্র আঙ্গুলের ছাপ ছড়িয়ে রেখেছিল। এখন ওই এক প্রমাণেই বাছাধনকে না গলায় ফাঁসির দড়ি পরতে হয়।'

অতসী চোখ ফিরিয়ে চাইল ঘরভর্তি লোকগুলোর পানে। মনে হলো সকলের চোখেই ভাসছে ওই এক সংশয়—আসামীকে ফাঁসির দড়ি না পরতে হয়। এতক্ষণ সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনে সংশয় ক্রমশঃ দৃঢ় হয়েছে। সেই সংশয় প্রায় প্রত্যয়ের রূপ নিয়েছে আসামীর অস্বস্তিকর নীরবতায়, তার নির্বিকার স্বীকৃতিতে। ঘনীভূত মেঘের প্রান্তে আলোর রেখার মতন ক্ষীণ আশা আসামীর তিন প্রধান ইন্দ্রিয়ের পঙ্গুতা। হয়তো এর ফলেই জুরীদের অনুকম্পা আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়ির বাঁধন থেকে বেঁচে যাবে তার গলাটা। কিন্তু বড় ক্ষীণ মনে হচ্ছে এই আশার আলোটুকু। এই শিখাটুকু জ্বালিয়ে রাখার ভার আসামীর কৌঁসুলীর ওপর। সবার চোখ ক্ষণে ক্ষণে গিয়ে পড়েছে আত্মস্থ বিপ্রদাসের ওপর। ওই নিঃসঙ্গ সরল, সহজ লোকটি কি পারবে এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে? এই এক 'ব্রীফলেস' ব্যারিস্টারের পক্ষে কি সম্ভব হবে অসাধ্য সাধন?

অপর পক্ষের পানে তাকালে এই প্রশ্নটার উত্তর যেন আর হাতড়াতে হয় না।

শ্যামল পালিতের দীপ্ত ভঙ্গিমা দেখলেই মামলার ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। তাঁর সঞ্চয়ে চোখা চোখা বাণ রয়েছে। তাদের যে-কোনো একটা দিয়েই যুদ্ধ জয় করা যাবে। সুতরাং আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ছড়িয়ে এখন থেকেই অভিনন্দন কুড়োবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন তরুণ ব্যারিস্টার। যদি বা কিছু সন্দেহ থাকতো, এ্যাডভোকেট জেনারেলকে পাশে পেয়ে এখন স্বচ্ছন্দে বিজয় গর্বে ফুলে ওঠায় আর কোনো বাধা নেই! এখন পর্যন্ত আশ্চর্যরকম নীরবতা নিয়ে বসে আছেন নগেন সোম। কিন্তু অন্যে আশ্চর্য হলেও শ্যামল পালিত এতে আনন্দই পাচ্ছেন। থমথমে আবহাওয়াতেই থাকে কালবৈশাখীর রুদ্রলীলার প্রতি গোপন আহ্বান।

অতসীও শুনতে পাচ্ছিল সেই আহ্বান। আসামীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে বিশেষ সন্দেহ ছিল না। মৃত্যুর সম্মুখীন এই লোকটির দিকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে আবার ফিরে তাকাল। হয়তো অনুকম্পার বশেই মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো এই মানবরূপী দানবের মুখ। তার মনে হলো মাদাম ট্যুসোর গ্যালারিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খুনী হিসাবে এই মুখের ছাপ রাখলে অন্যায় হবে না। সে ভেবেই পেলো না কেমন করে এই পুরুষকেই কোনো মেয়ে ভালোবাসতে পারে! অন্ততঃ সে নিজে স্বপ্নেও এমন কথা ভাবতে পারতো না। হঠাৎ বিচারকের কণ্ঠস্বরে তার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেল। শুনল সপ্তম সাক্ষীকে ডাকা হচ্ছে।

সপ্তম সাক্ষী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য, নিহত রবার্ট বিচামের পিতা মিঃ হেনরী বিচাম ধীর পদে আদালতে প্রবেশ করলেন। প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পোশাকে এবং দেহভঙ্গীমায় আভিজাত্য পরিস্ফুট। মুখে শোকের কালো ছায়া। বিচারপতি মিঃ বিচামকে সুদূর ইংলণ্ড থেকে স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য আদালতের সামনে পেশ করার অনুরোধ করলেন। উন্মুখ আগ্রহে থম্‌থম্‌ করছে আদালত কক্ষের আবহাওয়া। তারই মাঝে শোনা গেল মিঃ বিচামের ধীর, অকম্পিত কণ্ঠস্বর।

'রবার্ট আমার একমাত্র সন্তান। ১৯২৫ সালে লণ্ডনে তার জন্মের পরই আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মাতৃহীন এই শিশুকে মানুষ করার ভার নিয়ে কোনোদিন আমায় একটুও বিব্রত হতে হয়নি। পিতামাতার কাম্য সব গুণ ছিল এই স্বাস্থ্যবান শিশুর। ধীরে ধীরে এই সব গুণের স্ফুরণ হলো। সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রবার্ট পড়তে গেল অক্সফোর্ডে। দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে এই সময় থেকেই ভারতের প্রতি তার আকর্ষণ আমার চোখ এড়ায়নি। ভাগ্যের আশ্চর্য বিধানে সেই ভারতবর্ষে যাবার সুযোগ তার এসে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের কিছু পরে আঠারো বছরের তরুণ রবার্ট রাজকীয় বিমান বাহিনীতে যোগ দিল। এক বছর বাদে তার ইউনিট ভারতে প্রেরিত হলো। এইখান থেকেই জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে সে অংশ গ্রহণ করে এবং চারবার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য সম্মানিত হয়। জাপানের পরাজয়ের পর সে

লণ্ডনে ফিরে গেল বটে, কিন্তু মন তার পড়ে রইল ভারতবর্ষের মাটিতে। তারপর ভারত স্বাধীন হলো। বিপর্যস্ত, দ্বিখণ্ডিত ভারতকে তার দুর্দিনে সবরকম সাহায্য দেবার জন্য তৎপর হলো রবার্ট। এই সময় তার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো দেখা হতো আমার কারণ রেড-ক্রশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতকে সাহায্য দেবার ব্যাপারে সে অধিকাংশ সময় থাকতো লণ্ডনের বাইরে। অনেকদিন পর হঠাৎ যখন দেখা হতো তার সঙ্গে, তখন বেশ ক'দিন আমরা দু'জনে বন্ধুর মতন একসঙ্গে আনন্দে উল্লাসে কাটিয়ে দিতাম। সেই সব দিনের মধুর স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার বুকে। রবার্টের মতন ছেলের সম্বন্ধে গর্বিত না হয়ে উপায় ছিল না। পিতার প্রতি তারও ছিল অসীম শ্রদ্ধা আর অটুট ভালোবাসা।

'ভারতবর্ষের প্রতি তার আকর্ষণ লক্ষ্য করে এইসময় আমিই তাকে ভারতবর্ষে গিয়ে সেই দেশকে, সেই দেশের মানুষকে পরিপূর্ণ ভাবে জানবার পরামর্শ দিই। আমার প্রস্তাবে সে সানন্দে সম্মত হলো। কিন্তু এই সম্মতির আড়ালে সামান্য দ্বিধার ভাব আমার চোখ এড়াল না। যাত্রার দিন স্থির করার ব্যাপারে তার টালবাহানায় এই দ্বিধা আরো পরিস্ফুট হলো। এই দ্বিধার কারণও আমি জানতাম। জানতাম যে রবার্ট লণ্ডনের এক অভিনেত্রীর প্রতি প্রেমাসক্ত। ব্যাপারটায় আমার সম্মতি ছিল না কিন্তু এই নিয়ে উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে মনোমালিন্য করতেও আমি চাইনি। ভারতবর্ষে গেলেই তার মোহমুক্তি হবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। শেষ পর্যন্ত সে আমার অনুরোধে রাজী হলো। 'জলযাত্রা' জাহাজে ওঠবার আগে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে এই ভ্রমণের পরিকল্পনায় সে খুশী হয়েছে কিনা। সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই হেসে উত্তর দিয়েছিল—নিশ্চয়ই ! তোমার এই ব্যগ্রতা" কারণও আমি জানি। তোমার ধারণাই ঠিক—আমার জীবনে অভিনেত্রীর কোনো স্থান না থাকাই উচিত। কিন্তু তুমি খুশী হয়েছো তো ? আমি আন্তরিক স্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে সেদিন আমার খুশীর পরিমাণ জানিয়েছিলাম। রবার্টের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।' কথা শেষ করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ হেনরী বিচাম। মুহ্যমান শোকার্ত পিতার শেষ কথাগুলোর রেশ ছড়িয়ে রইল কক্ষের বাতাসে। এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে শ্রোতাদের মুক্তি দেবার জন্যই যেন নগেন সোম দাঁড়িয়ে উঠে জুরীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নিহত পুত্র সম্বন্ধে মিঃ বিচামের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অন্তরের আকুতির কথা বলেননি। বলেননি যে নিহত পুত্রের পিতার শোকার্ত অন্তর আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে সুবিচারের আশায়, প্রার্থনা জানাচ্ছে হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি। ভারতের বন্ধু মিঃ বিচাম ভারতের বিচারশালায় এসেছেন সুবিচারের আশায় যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের নির্দয় হত্যার ঘটনা আর না ঘটে। শুধু মিঃ বিচামই আসেননি, তাঁর মাধ্যমে ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই আদালতে এসেছে এইটুকু দাবী নিয়ে যে তাদের বীরসন্তানেরা যেন এরপর এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়ে ভ্রমণ করতে পারে লণ্ডন থেকে ভারতের পথে।

এই দাবী পূরণের ভার, এই জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আপনাদের ওপর ন্যস্ত। মনে রাখতে হবে যে সারা ইংলণ্ড সাগ্রহে অপেক্ষা করছে এই মামলার রায় শোনবার আশায়।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে বক্তব্য শেষ করে আসন গ্রহণ করলেন নগেন সোম।

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল বিপ্রদাস। ঝুলেপড়া চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, 'একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত বিচলিত মিঃ বিচামের মানসিক অবস্থা বিচারের ক্ষমতা আসামী পক্ষের নেই এমন নয়। কিন্তু আমার বন্ধু এইমাত্র যে সব মন্তব্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তার মধ্যেকার অতিশয়োক্তিটুকুর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য। রবার্ট বিচামের মৃত্যুতে সুবিচারের দাবী করবার অধিকার যদি ইংলণ্ডের জনসাধারণের থাকে তাহলে যেসব ভারতীয় ইংলণ্ডের মাটিতে খুনীর হাতে জীবন দিয়েছে, তাদের হয়ে সেই একই দাবী আমরাও তুলতে পারি। কিন্তু বর্তমান মামলার ব্যাপারে এই আন্তর্জাতিক প্রশ্নটার সত্যিই কোনো গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। আশা করি মহামান্য জুরীও আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং খেলো যুক্তিটাকে কোনো মূল্যই দেবেন না। এ কথা বোধহয় না বললেও চলে যে খুন সব দেশেই হয় এবং খুনী জাতের বিচার করে খুন করে না।'

সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রান্ত থেকে ধ্বনিত হলো অ্যাডভোকেট জেনারেলের তীক্ষ্ন বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর, 'মামলার শুরু থেকে সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে একটা আবেগানুভূতির সুর তুলে আসামী পক্ষের সবকিছু জট পাকিয়ে তোলার এই প্রচেষ্টার অর্থ আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'আসামী পক্ষের একমাত্র প্রচেষ্টা হচ্ছে সত্যানুসন্ধান, বক্তৃতার তুবড়ি ছুটিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া নয়।' মুহূর্ত বিলম্ব না করে বিপ্রদাস ছুঁড়ে দিল তার তীক্ষ্ন প্রত্যুত্তর।

বিচারক হাতুড়ীর আঘাত তুলে সকলকে চুপ করবার নির্দেশ দিলেন। তারপর মিঃ বিচামের দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, আসামী সম্বন্ধে আপনার ধারণা আদালতকে জানাবেন কি?'

'কোনো ধারণাই আমার নেই, আর থাকা সম্ভবও নয়। আসামীর আজন্ম পঙ্গুতার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে কিন্তু তা বলে আমি কিছুতেই রবার্টের মতন, সুন্দর সুস্থ এবং তার সম্পূর্ণ অপরিচিত এক তরুণকে হত্যার অপরাধ ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারছি না। আমি স্থিরনিশ্চয় যে রবার্টের সঙ্গে আসামীর পরিচয় হলে সে তার স্বভাবকারুণ্যে এই পঙ্গু মানুষটিকে সর্বতো-ভাবে সাহায্য করার জন্য উৎসুক হতো। আর্ত মানবের সেবাই ছিল রবার্টের একমাত্র লক্ষ্য। আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

কথা শেষ করে নতমস্তকে আদালত কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন মিঃ হেনরী বিচাম। অতসী ঘরের চার পাশে চোখ বুলিয়ে দেখল সকলের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছে এই শোকার্ত কিন্তু আত্মমর্যাদায় দৃঢ় প্রৌঢ়ের প্রতি আন্তরিক

শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। একটু পরেই সেই সব ক'জোড়া চোখের দৃষ্টি ঘুরে পড়ল দীপকের প্রতি। সিনেমার ছবির মতন মুহূর্তে বদলে গেছে সব চোখের ভাষা। জোড়া জোড়া চোখের তারায় চমকে উঠছে ঘৃণার ঝিলিক। একটু পরেই অন্ধ নির্বিকার দীপকের অঙ্গে প্রতিহত হয়ে সেই অগণিত দীপ্ত দৃষ্টির ঘৃণা ঝরে পড়ল তার পক্ষের ব্যারিস্টারের মাথায়। বেচারি বিপ্রদাস!

আত্মভোলা এই বৃদ্ধের পানে চেয়ে অতসীর বুকও কেঁপে উঠল অনুকম্পায়। সত্যিই, বেচারি বিপ্রদাস! তার উকীল হবার ইচ্ছায় বিপ্রদাসের আপ্রাণ বাধার কারণ আর অস্পষ্ট রইল না। অকারণ এই অগণিত মানুষের ঘৃণার পাত্র হওয়ার চেয়ে সারাজীবন স্কুলে মেয়ে পড়িয়ে দরিদ্র থাকাও বোধ হয় ভালো। ভাবতে ভাবতে এই ভালোমানুষ লোকটির প্রতি রাগ হলো তার। কেন সাধ করে এই মামলার দায়িত্ব নিলেন ভদ্রলোক!

ভাবতে ভাবতেই অতসীর চোখের সামনে ফুটে উঠল একটা ছবি—সুন্দর, সুঠাম, সর্বজনপ্রিয় তরুণ রবার্ট বিচামের ছবি। এমন সম্ভাবনাময় একটি জীবনের বীভৎস পরিণতির কথা ভাবতেই ব্যথায় ভরে উঠল তার বুক। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল শোকার্ত পিতার কথা। কি অসীম বেদনা বুকে চেপেই না এই প্রৌঢ়, অভিজাত ব্যক্তিটি এসেছিলেন সাক্ষী দিতে। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই সবকিছু ব্যথা, বেদনা, বিপর্যয়ের মূলে হচ্ছে ওই বিকলাঙ্গ অর্ধোন্মাদ দীপক দত্ত। পুলিশ অফিসারের কথাই ঠিক। রবার্ট বিচামকে খুন যে করেছে হয় সে এক রক্তপিপাসু উন্মাদ আর নয়তো এক স্যাডিস্ট যে নিজের দৈহিক পঙ্গুতার প্রতিশোধ নিয়েছে এক সুদেহী সুন্দর তরুণকে হত্যা করে। চিন্তার তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে উঠল অতসী। শুধু অতসী কেন আদালত কক্ষের প্রতিটি দর্শকের চোখেই ভাসছিল চাপা উত্তেজনার আভাস। এই উত্তেজনার অন্যতম কারণ বোধহয় তাদের ঘৃণার কেন্দ্রস্থল আসামী দীপক দত্তের নির্বিকার নিশ্চল উপস্থিতি। সব অনুভূতি ওই পাষাণে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে বলেই বোধহয় তা বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠছে, তার আভা ঠিকরে পড়ছে সকলের চোখের আলোয়। পাষাণ ছাড়া আর কি! দোভাষীর অঙ্গুলিসঙ্কেত মারফত প্রতিটি ঘটনা সে জানতে পারছে, শুনছে প্রতিটি কথা। কিন্তু কিছুতেই সামান্যতম পরিবর্তন নেই তার সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখের। নিহত রবার্ট বিচামের পিতার উপস্থিতি জানল সে, শুনল তাঁর করুণ বর্ণনা। কিন্তু সারাক্ষণ সামান্য একটা রেখাও পড়ল না দীপক দত্তের মুখে, এমন কি একবারও চোখের একটা পাতাও একটু কাঁপল না।

অষ্টম সাক্ষীর জবানবন্দী শুরু হতেই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল বিপ্রদাস।

'নাম?'

'কল্যাণী বসু,' কাঠগড়ায় ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে উত্তর দিলেন এক আধুনিকা।

'আসামীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ?'

'আসামী আমার সহোদর ভাই।'

'আপনার ভায়ের সম্বন্ধে যা জানেন তা আদালতকে জানাবেন কি ?'

চট্‌পট্‌ উত্তর দিলেন সাক্ষী, 'দীপক দোষী কি না তা আমি জানি না কিন্তু খবরের কাগজে তার এই কীর্তিকাহিনী পড়ে আমি একটুও বিস্মিত হইনি। ঠিক বলতে কি তার সম্বন্ধে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতাই আমায় বিস্মিত হবার সুযোগ দেয়নি। দশবছর পর্যন্ত দীপক আমাদের বাড়ীতে ছিল এবং এই সময়ে প্রায় প্রত্যেকদিন তাকে নিয়ে বাড়ীর সকলের আশঙ্কার সীমা ছিল না। তার সুখ-সুবিধা যত্নের জন্যে আমরা সবকিছু করতাম। কিন্তু পরিবর্তে আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ছিল তার অপরিসীম ঘৃণা। সাত বছর বয়স থেকেই আমাদের কেউ তার কাছে গেলে সে ক্ষেপে উঠতো। মনে পড়লেও ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। আমার বাবা এইসব দেখে বাধ্য হয়ে আমার গভর্নেসের মেয়ে রুবিকে তার দেখাশোনার ভার দিলেন। এই তো গেল বাল্যের অভিজ্ঞতার কাহিনী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনে দীপকের প্রভাব আজও ছড়িয়ে আছে ; ওর জন্যেই আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল ...'

'অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্য আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

'দীপকের যখন সাত বছর বয়স সেই সময় আমার বিয়ে হয়। এই বিকলাঙ্গ শ্যালকটির প্রতি আমার স্বামীর স্নেহ ও সহানুভূতির অভাব ছিল না। তিনি আমাদের বাড়ী এলেই তার জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসতেন। দীপক কিন্তু একটা জিনিসও নিত না। হাতে দেবামাত্র তা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিত। এক স্বামী ছাড়া আমার শ্বশুরবাড়ীর আর কেউ আমার যে একটি বিকলাঙ্গ ভাই আছে এ খবর জানত না। আমরা ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা সযতনে গোপন করেছিলাম। কারণ ভয় ছিল যে বংশগত কোনো দোষের কথা ভেবে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী এই বিয়েতে মত না দিতেও পারেন। আমরা ভালো-বেসে বিয়ে করেছিলাম। তাই স্বামীও এই গোপন করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন। আমার বিয়ের তিন বছর পরেই দীপক রামপুরহাটের মিশনে চলে যায়।

'তারপর আর দীপকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সে শুধু দূরেই গেল না আমার মন থেকে মুছেও গেল বলা যায়। কিন্তু মুছল না আমার স্বামীর মন থেকে। ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন আমার স্বামী। তিনি যে তখনো আমাকে ভালোবাসতেন না তা নয়। কিন্তু ভয়, এক অদ্ভুত ভয় পেয়ে বসল তাকে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে আমাদের সন্তান যদি তার মামার মতন হয় ! সংশয় ক্রমশঃ নিশ্চিত সত্যের আকার নিল তাঁর অন্তরে। নিজের অন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। ছেলের এই পরিবর্তন আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর চোখ এড়াল না। চাপে পড়ে বাবা এবং মায়ের কাছে সব কথা স্বীকার করলেন তিনি। সেদিন থেকেই আমার জীবনে ঝড় উঠল, মেঘে মেঘে

ছেয়ে গেল আমার আশা আর আনন্দের আকাশ। শুরু হলো আমার ওপর অত্যাচার—অত্যন্ত সন্তর্পণে কিন্তু সাংঘাতিক হীন আর হিংস্ররূপে। বিকলাঙ্গ পুত্রের অস্তিত্ব গোপন করার জন্যে আমার বাবা এবং মাও অপমানের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। শেষ পর্যন্ত আমিই বাধ্য হয়ে আদালতে দরখাস্ত করে আলাদা হলাম, সরে এলাম স্বামীর জীবন থেকে। দীর্ঘ চোদ্দ বছর পার হয়ে গেছে তারপর। আজ নিঃসঙ্গ, নির্যাতিত, ক্লান্ত আমি ; কারুর বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই, দীপকের বিরুদ্ধেও না। কিন্তু তবুও এ কথা না বলে পারছি না যে দীপকের জন্যেই আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।'

'আপনি বলেছেন যে দীপক রামপুরহাটে চলে যাবার পর তার সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়নি। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে গত সতেরো বৎসরের মধ্যে আপনি একবারও আপনার ভায়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেননি।'

'ঠিক তা নয়। দীপক চলে যাবার এক বছর পরেই মা তার সঙ্গে রামপুরহাটে দেখা করতে যান। ফিরে এলে দেখলাম ছেলের শিক্ষার উন্নতিতে তিনি খুশী হয়েছেন ঠিকই কিন্তু তার রূঢ় ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছেন তারচেয়ে অনেক বেশী। আমার মনে আছে তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, দীপক আমাদের পর হয়ে গেছে। আমাদের সামান্যতম সান্নিধ্যে আসবার ইচ্ছেও আর তার নেই। এরপরই আমার ভগ্নহৃদয় বাবার মৃত্যু হলো এবং তার কিছুদিন পরেই শেষ হলো আমার দাম্পত্য জীবন। পরে প্রতি বছরেই মা রামপুরহাট গেছেন দীপককে দেখতে। ভাইকে দেখবার প্রবৃত্তি বা প্রেরণা আমি কিন্তু আর সংগ্রহ করতে পারিনি।

'বারো বছর পর হঠাৎ একদিন দীপকের লেখা বই নিয়ে হৈ চৈ কানে এল। তখুনি বইটা কিনে পড়লাম। দেখলাম অন্ধ-মূক-বধির নায়ককে কেন্দ্র করে দীপক প্রায় তার আত্মজীবনী লিখেছে। নায়কের বাল্যকাল বর্ণনায় ফুটে উঠেছে আমাদেরই বাড়ীর ছবি। নায়কের বোনের বিকৃত চরিত্রে আমার ছায়া দেখে লেখকের প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় দুঃখ পেলাম।...'

দাঁড়িয়ে উঠে বেশ অন্তরঙ্গ সুরে বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'কিন্তু লেখকের প্রচেষ্টা সত্যিই ব্যর্থ হয়েছে কি ?'

মধুর আড়ালে হুলটুকু তরুণীর মনোযোগ এড়ায় নি। বেশ রাগতস্বরে তিনি উত্তর দিলেন, 'ব্যর্থ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমার সঙ্গে দীপকের বর্ণিত চরিত্রের কিছু মিল আছে ঠিকই। কিন্তু সব মিলিয়ে তার এই অংকিত চরিত্র একটা অপটু ক্যারিকেচার ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনশো পাতার বই ভরে আছে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যথেচ্ছ কটূক্তিতে—অথচ এই আত্মীয়-স্বজনেরাই তার মঙ্গলের জন্যে করেনি এমন কাজ নেই। এই যদি সাহিত্যের নিদর্শন হয় তাহলে নিষিদ্ধ করার মতন বই আর বাজারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং এই সবকিছু অন্যায় অভিসন্ধির পেছনে আছে একটি মানুষ—দীপকের গুরু ফাদার লরেন্স।'

বিপ্রদাস আগের মতনই শান্তস্বরে বলল, 'কিন্তু আমার ধারণা যে ফাদার

লরেন্স দীপকের ভার না নিলে আপনাদের সংসারে অশান্তির সীমা থাকতো না।'

'প্রথমে আমরা তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে মত বদলাতে বাধ্য হই। ক্রমশঃ আমরা বুঝতে পারি যে ফাদার লরেন্স তাঁর গবেষণার সার্থকতা প্রমাণের জন্যই দীপককে চেয়েছিলেন, আমাদের মুখ চেয়ে বা আমাদের হিতার্থে নয়। আর ঠিক একই উদ্দেশ্যে তিনি রুবিকে হাত করেছিলেন। তিনি যখন প্রথম আমাদের বাড়ীতে আসেন তখন রুবির বয়স বারো— দীপকের চেয়ে তিন বছর বেশী। এই বয়সেই সে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে আরম্ভ করেছিল, লালায়িত হয়েছিল সম্মান আর সম্পদের লোভে। তার মনের কথা নিশ্চয় বুঝেছিলেন এই ধূর্ত ফাদার লরেন্স। তা না হলে দীপকের যাওয়ার কিছু পরেই তাকে এবং তার মা-কে হঠাৎ রামপুরহাটের মিশনে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? শুধু নিয়ে যাওয়াই হলো না সেখানে দিনের পর দিন তাকে পরমযত্নে শিক্ষা দেওয়া হলো অন্ধ-মূক-বধিরদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের প্রত্যেকটি পদ্ধতি। তারপর একদিন আমাদের অজান্তে তরুণী এবং বলা যায় সুদর্শন রুবির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দীপকের। রামপুরহাটের গির্জায় বিয়ে হলো সম্পূর্ণ গোপনে—আমরা আমন্ত্রণ তো দূরের কথা সামান্য আভাসও কেউ পেলাম না। এইভাবে এক চক্রান্তের ফলে আমারই গভর্নেসের মেয়ে হঠাৎ হয়ে দাঁড়াল আমার সহোদর ভায়ের বউ।'

বিচারপতি বিপ্রদাসের পানে চেয়ে বললেন, 'আপনার আর কিছু প্রশ্ন করবার আছে কি?'

'না' উত্তর দিল বিপ্রদাস। বসতে যাচ্ছিল সে কানে ভেসে এল অ্যাডভোকেট জেনারেলের বিদ্রূপভরা মন্তব্য, 'অ্যাঁ, কিছুই বলবার নেই! আশ্চর্য ব্যাপার মনে হচ্ছে।' সোজা হয়ে দাঁড়াল বিপ্রদাস। চশমাটা নাকে বসিয়ে নিয়ে জুরীদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'প্রশ্ন করবার কিছু নেই কিন্তু আপনাদের কাছে সামান্য কিছু পেশ করবার আছে। সব শোনবার পর আমরা কি বিশ্বাস করবো যে এই মামলায় সাক্ষী দিয়ে ফরিয়াদী পক্ষকে সাহায্য করাই সাক্ষীর একমাত্র উদ্দেশ্য? আমরা কি ভাবতে পারি না যে অসহায় পঙ্গু ছোট ভাই যার সঙ্গে বাল্যে সামান্য ক'টা বছর ছাড়া আর দেখাই হয়নি, সেই ভাইকে শুধু আঘাত দেবার উদ্দেশ্যেই আজ দীর্ঘকাল পরে দিদি এসেছেন এই আদালতে! বালক দীপকের দুর্দান্ত স্বভাবের কথা বলেছেন সাক্ষী। তাঁর এই উক্তি সত্য হলেও, কি করে তিনি ভাবলেন যে এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর ভাই বিন্দুমাত্রও বদলায়নি? সময়ের প্রভাব কে এড়াতে পারে? তিনিই কি বলতে পারেন, সতেরো বছর আগে যা ছিলেন আজো তাই আছেন? এই সব প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর আমার মনে আসছে! একটিমাত্র উত্তর যে এই সাক্ষী, আসামীর দিদি আজ এসেছেন স্বার্থের তাড়নায়, আত্মতুষ্টির প্রেরণায়। পরে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে বলবার ইচ্ছে আমার আছে, তাই এখানে এই ভূমিকার অবতারণা করলাম।'

'স্বার্থ' কথাটা ব্যবহার করে কি বোঝাতে চান আপনি, কি ধরনের স্বার্থ, পরিষ্কার করে বলবেন কি?' শোনা গেল অ্যাডভোকেট জেনারেলের বিদ্রূপ-মিশ্রিত প্রশ্ন।

'সময় আসলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যখন হবে তখন আশা করছি যে আমার মাননীয় প্রশ্নকর্তার বিস্ময়ের আর সীমা থাকবে না। সাক্ষী বলতে চেয়েছেন যে রুবির সঙ্গে দীপকের বিয়ের মূলে আছে রুবির উচ্চাশা আর তার আভিজাত্য আহরণের লোভ। উত্তরে আমি শুধু এই মন্তব্যের অসারতাটুকু দেখিয়ে দিতে চাই। তাঁর মতে, 'সুদর্শনা বলা যায়' এমন এক বুদ্ধিমতী তরুণী এক অন্ধ-মূক-বধিরকে বিয়ে করার মাঝে তার জীবনের উচ্চাশা পূরণের, স্বপ্ন-সাফল্যের পথ খুঁজে নেবে এর চেয়ে হাস্যকর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন সাক্ষী, 'দীপককে বিয়ে করলে সমাজের উঁচু মহলে তার স্থান হবে আর তাহলেই আসবে তার উচ্চাশা পূরণের সম্ভাবনা, এ কথা বুদ্ধিমতী বলেই রুবির বুঝতে দেরী হয়নি।'

'সমাজের উঁচু মহলের প্রতি সকলের লোভ কি সমান?' মৃদু মন্তব্য করল বিপ্রদাস।

সে কথায় কান না দিয়ে বলে চললেন সাক্ষী······'তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে লেখক হিসাবে ধনী এবং বিখ্যাত হবার পরই দীপকের সঙ্গে রুবির বিয়ে হয়। ইংলণ্ডে এই বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, আজও হচ্ছে।'

বিপ্রদাস চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বলল, 'অর্থাৎ রুবি মাঝে না থাকলে দীপকের এই অর্থ তার দিদির ভোগে আসা অসম্ভব হতো না। মোদ্দা কথা, যেদিক দিয়েই দেখি প্রমাণ সেই একটা কথাই হচ্ছে যে সাক্ষী, আসামীর দিদি আজ এখানে এসেছেন স্রেফ স্বার্থের তাগিদে।'

'এই মন্তব্যে আমার আপত্তি আছে······' দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন শ্যামল পালিত কিন্তু বিচারকের হাতুড়ি বাজতেই একটু বিরক্ত হয়ে বসে পড়লেন। পরের সাক্ষীকে ডাকার হুকুম দিলেন বিচারক।

দীপক দত্তর ভগ্নীপতি এসে দাঁড়ালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। বিচারপতি বললেন, 'আপনার শ্যালক সম্বন্ধে আপনি যা জানেন দয়া করে আদালতকে জানাবেন কি?'

'দীপক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কল্যাণীর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয় দীপকের বয়স তখন সাত কি আট। বাড়ীর পিছনে একটা ছোট্ট ঘরে তাকে আটকে রাখা হতো। তাকে সকলের চোখের সামনে থেকে আড়াল করে এই বন্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা আমার ভাল লাগত না। আমার শ্বশুর বা শাশুড়ীর কাছে আমি এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অবশ্য ফল না হওয়ার কারণও ছিল। তখন পর্যন্ত দীপক যে কি চায়, কি পেলে খুশী হয় তা বাড়ীর কেউই বুঝতে

পারতো না। ফলে তাকে নিয়ে প্রত্যহ একটা না একটা অনর্থের সূত্রপাত হতোই হতো। মানে পোষ-না-মানা বন্য পশু নিয়ে যেমন হয় আর কি।

'থেকে থেকে সে রাগে ফেটে পড়ত। সাতবছরের বালকের সেই রুদ্ররূপ কল্পনা করাও কঠিন। চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে, হাতের কাছে যা পেতো তাই এলোপাথাড়ি ছুঁড়ে একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করত সে। তারপরই সম্ভবতঃ নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে শুরু হতো তার মেঝেয় গড়াগড়ি। চরকির মতন ঘুরতো সে, গোঁ গোঁ করতো আর মুখ দিয়ে তার সাদা সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ত—সে এক বীভৎস দৃশ্য। অসীম শক্তি ছিল এই বালকের দেহে। সময় সময় আমার শ্বশুরমশাই এবং আমি দু'জনে চেষ্টা করেও সামলাতে পারতাম না তাকে।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'বালকের এই হঠাৎ ক্ষেপে ওঠার কারণ কিছু বলতে পারেন?'

'কোনো বিশেষ কারণ মনে পড়ে না···মানে বাড়ীর কেউ তার কাছে গেলেই সে ক্ষেপে উঠতো। বাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণী সম্বন্ধে তার অদ্ভুত বিরাগ দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য যে আমার বিয়ের পর থেকেই আমিও তার বিরাগের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম; অর্থাৎ তার আত্মীয়দলভুক্ত হবার পর থেকেই। আজও বুঝতে পারি না কি করে তার পক্ষে তাদের সংসারের সঙ্গে আমার নতুন সম্বন্ধ অনুমান করা সম্ভব হয়েছিল।'

'ছেলের এই ব্যবহার আপনার শ্বশুর এবং শাশুড়ী কি চোখে দেখতেন?'

'আমার ধারণা এই পঙ্গু ছেলের প্রতি শ্বশুরমশায়ের বিশেষ দুর্বলতা ছিল।'

'শাশুড়ীর?'

'এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ইচ্ছে আমার নেই।'

'আপনার স্ত্রীর?'

'এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ বহুদিন আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রয়েছি।'

'আপনার স্ত্রী বলেছেন যে আপনাদের সন্তান হলে সে তার মামার মতন হতে পারে এই ভয় আপনাদের বিয়ের পর আপনাকে পেয়ে বসেছিল। এবং তাঁর মতে আপনার এই ভয়ই আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের কারণ?'

'স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং ও সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করলেই ভালো হয়।'

এই সময় বিপ্রদাস দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করল, 'আপনার কি এমন কারুর কথা মনে পড়ে যে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত ক্রোধোন্মত্ত দীপককে শান্ত করতে পারতো?'

'হ্যাঁ, কল্যাণীর গভর্নেসের ছোট্ট মেয়ে রুবি।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'কি করে এটা সম্ভব হতো?'

'তা জানি না। তবে সম্ভব যে হতো তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি।'

'পদ্ধতিটা বলবেন কি?'

'খুব সহজ পদ্ধতি। রুবি এগিয়ে গিয়ে তার ছোট্ট হাত দীপকের মুখে দু'চারবার আলতোভাবে বুলিয়ে দিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যেন যাদুমন্ত্রের স্পর্শে শান্ত হয়ে যেতো ক্ষিপ্ত দীপক।'

'কি আশ্চর্য!' বিচারপতির অস্ফুট মন্তব্য শোনা গেল। তারপরই তিনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, 'রামপুরহাট যাবার পর দীপকের সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়েছিল কি?'

'না, তবে তার বই আমি পড়েছিলাম।'

'আপনার কি মনে হয় যে তার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে সে তার আত্মীয়-স্বজনের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছে?'

'সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

'নাম?' প্রশ্ন করা হলো পরের সাক্ষীকে।

'লিলি বসাক,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন প্রৌঢ়া মহিলাটি।

বিচারপতি বললেন, 'আপনি দীপক দত্তের পরিবারে প্রায় আট বছর গভর্নেস হিসাবে কাজ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দীপক দত্ত সম্বন্ধে আপনার ধারণা আদালতকে জানাবেন কি?'

'দীপকের সম্বন্ধে ধারণা? ঠিক কি বলবো বুঝতে পারছি না। ও সাধারণ পর্যায়ের নয় বলেই ওর সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত।'

'দীপককে বিয়ে করে আপনার মেয়ে কি সুখী হয়েছে?'

'কে, রুবি? দীপককে বিয়ে করে কি কোনো মেয়ের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব? রুবির জন্যে আমার ভাবনার শেষ ছিল না। দীপকের জেল হয়ে আমি তবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি, দুর্ভাবনার হাত থেকে তবু রেহাই পেয়েছি।'

'অর্থাৎ আপনার মেয়ের এই বিয়েতে আপনি খুশী হননি?'

'খুশী? একটা বিকৃত বিকলাঙ্গের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কোনো মা খুশী হতে পারে নাকি? অতি শান্ত সরল মেয়ে রুবি, অত্যন্ত ভালোমানুষ। আর তার এই সরলতার, ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে সবকিছু করেছেন ফাদার লরেন্স। ফাদার লরেন্সই আমাকে আর রুবিকে রামপুরহাটে নিয়ে যান। আমি ছোট ছোট অনাথ ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতাম আর রুবি দীপকের সঙ্গে থাকতো, তার লেখাপড়ায়, তার পরীক্ষা দেবার ব্যাপারে সাহায্য করতো। তারপরই হঠাৎ একদিন দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। আমি তাকে শুধু অসংখ্যবার বোঝাইনি, তার পায়ে মাথা খুঁড়েছি, যাতে সে বিয়ের প্রস্তাবে মত না দেয়। কোনো ফল হয়নি। আমারই চোখের সামনে আমার একটি সুস্থ, সুন্দর, ধনবান জামাই করার স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেল। এরপর ভাববার চেষ্টা করেছি, কেন রুবির মতন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ে দীপককে বিয়ে করলো।

ভালোবেসে নিশ্চয়ই নয় ; একজন পঙ্গু, বিকলাঙ্গ পুরুষকে কোনো মেয়েই ভালোবাসতে পারে না। অনুকম্পা, স্রেফ অনুকম্পার বশে বিয়ে করেছে ও। আর তার ফল ফলতেও দেরী হয়নি। বিয়ের একমাস পরে পুরী থেকে হনিমুন করে ফিরল ওরা। মেয়ের মুখ দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠল। একবার একান্তে পেয়ে জানতে চাইলাম তার মনের কথা। কথা বললো না মেয়ে, বলবে না তা জানতাম। মেয়ে আমার শুধু কেঁদে লুটিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। পরদিনই আমার মনের আশংকা জানালাম ফাদার লরেন্সকে। তিনি রুবিকে ডেকে বোঝালেন, ধৈর্য ধরবার উপদেশ দিলেন, শেষে আসন্ন ইউরোপ ভ্রমণের রঙীন ছবি এঁকে বললেন যে বিদেশে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক যে কেমন হয়েছে তা আর আজ কারুর অজানা নেই। দীপক জেলে বসে আছে আর মেয়ে আমার লজ্জায় লুকিয়ে আছে, কোথায় কে জানে! খুনীর স্ত্রী কোন মুখ নিয়ে আর সমাজে ঘুরে বেড়াবে?'

এইখানে বিপ্রদাস দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমার মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে মামলার ফলাফল ঘোষণার আগে আমার মক্কেল সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য করবার কোনো অধিকার সাক্ষীর নেই।'

বিচারপতি বিপ্রদাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে সাক্ষীর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি প্রথমে বলেছেন যে আসামী সম্বন্ধে কিছু বলা আপনার পক্ষে শক্ত। আপনার পরবর্তী সব মন্তব্য কিন্তু এই উক্তির সমর্থনসূচক নয়।'

সাক্ষী প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'মানে ছোট্ট দীপককে দেখেছি, ছেলে সে খারাপ ছিল না। অবশ্য কোনো শিশুকেই সত্যিকারের খারাপ বলা যায় না। তবে দীপকের মেজাজ শিশুর মতন ছিল না। থেকে থেকে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তো সে। আর এইসব সংকট মুহূর্তে একমাত্র আমার ছোট্ট মেয়ে রুবিই তাকে সামলাতে পারতো। কি যাদু সে জানতো কে জানে!'

বিপ্রদাস আবার মন্তব্য করল, 'তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে বিয়ের আগে ভালোমন্দ ভাববার সুযোগ আপনার মেয়ের যথেষ্টই ছিল।'

'আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি যে এই বিয়ের মূলে আছে ফাদার লরেন্সের প্রচেষ্টা ও পরামর্শ। দীপকের বিয়ে দেবার ব্যাপারে ভদ্রলোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। অথচ আমার মতে এইসব পঙ্গু ব্যক্তির বিয়ে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত যাতে এদের সন্তান সমাজের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়।'

বিপ্রদাস চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলল, 'আপনার মেয়ে এখনো মা হননি, অতএব...।'

বাধা দিয়ে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে সাক্ষী বলল, 'ওইটুকুই যা রক্ষে। ছেলে হলে তার চেহারা কি হতো ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।'

এইবার অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মেয়ে তার দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কখনো কি আপনার সঙ্গে আলাপ করেছে?'

'না, আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছু জানতে পারিনি।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'বাড়িতে যতদিন ছিল ততদিন পঙ্গু ছেলের প্রতি তার বাবা-মার ব্যবহার স্বাভাবিক ছিল বলে আপনার মনে হয় ?'

'স্বাভাবিক ··ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। ধনীর ছেলে, অতএব যা কিছু তার প্রয়োজন তা প্রচুর পরিমাণে পেতো। কিন্তু স্নেহ সে পায়নি, একমাত্র রুবি ছাড়া কারুর কাছেই পায়নি।'

'ধরে নেওয়া যায় যে আপনার মতন দীপকের আত্মীয়-স্বজনেরও এই বিয়েতে আপত্তি ছিল ?'

'তাতো কোনো সন্দেহই নেই ; অবশ্য তাঁদের ক্ষেত্রে কারণটা ভিন্ন। গভর্নেসের মেয়ে হঠাৎ বধূ হয়ে তাঁদের সংসারে প্রবেশ করবে এটা তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি। এইসব অভিজাত ধনীদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। আমি দেখেছি এঁরা প্রত্যেকে সাংঘাতিক স্বার্থপর এবং অর্থ ছাড়া আর কোনো বস্তুই এঁদের কাছে সম্মান পায় না।'

'তাহলে এ বিয়েতে কার সম্মতি ছিল ?'

'আমি তো বলেছি—একমাত্র ফাদার লরেন্সের।'

'এ কথা আপনি কেন বলছেন ? আপনি জানেন যে ফাদার লরেন্স একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সুতরাং আদালত কি করে বিশ্বাস করবে যে এইরকম একজন নিঃস্বার্থ, সেবাপরায়ণ, সাধু ব্যক্তি তাঁর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে একটা 'প্রজাপতির আসরে' পরিণত করবেন।'

'আমি ঠিক ও-কথা বলতে চাইনি। দীপকের আগেও অন্ধ-মূক-বধির ছাত্র পেয়েছিলেন ফাদার লরেন্স। কিন্তু তাদের কারুরই বিয়ে হয়নি। দীপকের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন ফাদার লরেন্স। আর সেই সঙ্গেই তাঁর মাথায় খেলে গিয়েছিল এই ছাত্রটিকে নিয়ে এক নতুন পরীক্ষার প্রেরণা ; তার বিয়ে দিয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রেরণা। হয়তো দীপকের পাশে রুবিকে দেখে, দীপকের ওপর তার প্রভাব জেনে উৎসাহিত হয়েছিলেন তিনি। উৎসাহিত যে হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে এবং রুবিকে রামপুরহাট নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমটা অবশ্য এই অভিসন্ধি আমি বুঝতে পারিনি। যখন সচেতন হলাম তখন দেখি এই ভদ্রলোক আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ হাত করে ফেলেছেন।'

'এইসব সাধু সম্মানিত ব্যক্তি সম্বন্ধে আরো সাবধানে কথা বলা উচিত। পঙ্গু মানবের সেবায় এঁরা অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।'

'কৃতিত্ব ? হ্যাঁ তা দেখিয়েছেন বৈ কি ! এঁদের তৈরী শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে ওই কাঠগড়ায় দেখেই কৃতিত্বের পরিমাণ বোঝা যায়।'

'তা হলে আদালত কি এই বুঝবে যে আপনার বা দীপকের আত্মীয়-স্বজন কারুর পক্ষেই এই বিয়ে সুখের হয়নি ?'

'না, হয়নি।'

'এবং আপনি নিঃসন্দেহ যে আপনার মেয়ে দীপককে ভালোবেসে বিয়ে করেনি ?'

'অনুকম্পা, একমাত্র অনুকম্পার বশে বিয়ে করেছে রুবি।'

এরপর এসে দাঁড়ালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপক। তিনি বললেন ঃ

'দীপক দত্ত যেবার বি. এ. পরীক্ষা দেয়, সেই বছর আমি ইংরেজী অনার্সের প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। অন্যান্য ছাত্রদের মতন সেও লিখে পরীক্ষা দেয়। মানে ফাদার লরেন্স চেয়েছিলেন যে আমরা যেন পরীক্ষার ব্যাপারে পঙ্গুতার জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তাঁর ছাত্রকে না দিই। প্রশ্নের উত্তর দীপক 'ব্রেল' পদ্ধতিতে দিলে তা বিশেষ ভাবে নিযুক্ত নিরপেক্ষ একজন দোভাষী আক্ষরিক রূপান্তর করে দিতেন এবং সেই রূপান্তরিত উত্তরপত্র পাঠানো হতো পরীক্ষকদের কাছে। দীপক শুধু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলো না তার রচনাশৈলী এবং চিন্তার গভীরতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন প্রত্যেক পরীক্ষক। আমার দীর্ঘ অধ্যাপকজীবনে এত উচ্চমানের উত্তর খুব বেশী দেখিনি। এক কথায় এই প্রতিভাবান ছাত্রটিকে বিশ্ববিদ্যালরের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।'

'দীপকের আগে কি অন্ধ-মূক-বধির কোনো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল ?'

'না, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষা দেয়নি।'

'দীপকের পর ?'

'একজনও আর আসেনি।'

'ফাদার লরেন্সের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?'

'দীপকের সাফল্য দেখে অভিনন্দন জানিয়ে আমি ফাদার লরেন্সকে চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে রামপুরহাট গিয়ে সব দেখে আসবার আমন্ত্রণ জানান। আমি এবং আমার দুই অধ্যাপক বন্ধু রামপুরহাট গিয়েছিলাম। সব দেখে এবং ফাদার লরেন্স আর তাঁর দুই প্রধান সহকারীর সঙ্গে আলাপ করে এই সেবাব্রতী, স্নেহশীল মণীষীর সাধনার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে আসি আমরা।'

'দীপক সম্বন্ধে ফাদার লরেন্সের সঙ্গে কিছু আলাপ করেছিলেন কি ?'

'হ্যাঁ। পঞ্চাশ বছরের সেবাব্রতে অনেক অন্ধ-মূক-বধির ছাত্রকে মানুষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন ফাদার লরেন্স। কিন্তু দীপকের মতন এমন একজন শক্তিশালী লেখক হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমরা বিস্মিত হয়েছি দেখে বলেছিলেন যে দীপকের মতন তীক্ষ্ণধী চিন্তাশীল ছাত্রের কাছে অনেক কিছুই আশা করা যায়। তাঁর আশা সফল করে তিনবছর বাদে প্রকাশিত হলো দীপকের লেখা 'নির্বাসিত আত্মা'।'

'এই বই সম্বন্ধে আপনার মতামত জানাবেন কি ?'

'উঁচুদরের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্ধ-মূক-বধির মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়। নিখুঁত রচনাশৈলীতে পাকা হাতের স্পষ্ট ছাপ আছে। এক মাত্র চরিত্রচিত্রণে কিছু দুর্বলতা আছে। আশেপাশের সব মানুষকে লেখকের বিকৃত করে আঁকার প্রচেষ্টায় মন একটু ক্লিষ্ট হয়। রামপুরহাটে দীর্ঘ বারো বছর অজস্র স্নেহ-সহানুভূতি পাওয়ার পরও মানুষের প্রতি লেখকের এই বিরূপ মনোভাব দেখে একটু আশ্চর্য লাগে।'

এইসময় অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে লেখকের বুদ্ধি এবং বিবেচনা সম্বন্ধে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?'

'আমি তো আগেই বলেছি যে লেখক একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি।'

'আমি এইটুকুই জানতে চাইছিলাম' বললেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। তারপর জুরীর দিকে ফিরে বললেন, 'অর্থাৎ এর দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে আসামী কিছু করেছে, সম্পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ করেই করেছে। এইটুকু আমরা মনে রাখলেই আসামীর বহিরাকৃতি আর আমাদের বিভ্রান্ত করবে না। আসামীর অমানুষিকতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, তার কাজের মধ্যেই সেই অমানুষিকতার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এইটাই সব নয়। আমাদের প্রয়োজনে প্রধান বিষয় হচ্ছে এইটুকু জেনে রাখা যে এই অমানুষিকতার কেন্দ্রে আছে একটি চতুর চিন্তাশীল মন। সুতরাং জাহাজের খুন শুধু পূর্বকল্পিত নয়, সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যপ্রসূত।'

বিপ্রদাস দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ জানাল, 'আমার পূর্ববর্তী বক্তার অপরিণত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমি একমত নই। আসামীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে কারুরই সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই বুদ্ধি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আর যেহেতু তার বুদ্ধি আছে অতএব সেই বুদ্ধিকে সে দুরভিসন্ধির প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছে এই অনুমান—দুটো এক কথা নয়।'

পরবর্তী অন্ধ সাক্ষীকে হাত ধরে নিয়ে এল একজন। প্রশ্ন হলো:

'নাম?'

'সুবীর সরকার।'

'জন্মের স্থান ও তারিখ?'

'এলাহাবাদ, জুলাই ১৯২১ সালে।'

'পেশা?'

'সঙ্গীতশিক্ষক ও সুরকার।'

প্রাথমিক অন্যান্য প্রশ্ন ও শপথ শেষ হতে বিচারপতি সাক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি রামপুরহাটের শিক্ষায়তনে প্রায় এগারো বছর আসামীর সহপাঠী ছিলেন। এই মামলা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে আপনি স্বেচ্ছায় ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য আবেদন করেন। সেই আবেদনে আপনি জানান যে আদালতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আপনার বলবার

আছে। বলুন।'

'রামপুরহাট শিক্ষায়তনে দীপক প্রথম যেদিন এল সেদিনই অন্ধ-মূক-বধির বালকের প্রতি কেমন একটা মায়া অনুভব করেছিলাম আমি। এই অনুভূতির প্রথম কারণ হয়তো তার আমার চেয়ে তিনবছর কম বয়স এবং দ্বিতীয় কারণ তার তিন ইন্দ্রিয়ের পঙ্গুতা। দৃষ্টিহীন আমি কিন্তু কথা তো বলতে পারতাম ; আর তাছাড়া অস্বাভাবিক তীক্ষ্ন শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল আমার জীবনের অন্যতম সম্পদ। যার এই তিনটেই নেই, তার প্রতি স্নেহে, করুণায়, কেন কে জানে অন্তর আমার ভরে গিয়েছিল। তাই তার পাশে পাশে থাকতাম আমি, স্নেহ দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে, সাধ্যমত তাকে সাহায্য করতাম। তার শিক্ষার ভার ফাদার লরেন্স নিজের হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বছর শেষ হবার পর হঠাৎ একদিন আমায় ডেকে তিনি বললেন—দীপক ভাব-বিনিময়ের পদ্ধতি কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে। আমি দেখেছি তুমি ওকে স্নেহ কর। তাই এখন থেকে তুমি সর্বদা ওর সঙ্গে থাকবে, ওর সঙ্গে কাজ এবং খেলা করবে। এরপর ছ'বছর দীপকের শিক্ষা এবং পরিচর্যার ব্যাপারে আমি ফাদার লরেন্সের সহকারী ছিলাম। পাশে পাশে থাকতে থাকতে আমাদের অন্তরের বাঁধন দৃঢ় হয়েছিল। ছোট ভায়ের মতন ভালোবাসতাম ওকে, আমিই ছিলাম ওর একমাত্র বন্ধু। ওর যখন সতেরো বছর বয়স, আশ্রমে এলেন মিস রুবি বসাক আর তাঁর মা। দীপকের ভার মিস বসাকের হাতে তুলে দিলেন ফাদার লরেন্স। রামপুরহাটের শিক্ষায়তনে থাকতে নারীর সংস্পর্শে আসার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না। মনে হয় সেই ব্যবস্থাই ভালো ছিল। কারণ মিস বসাক এবং তাঁর মাকে আনার ফল খুব শুভ হয়নি। অবশ্য এও আমি জানি যে ফাদার লরেন্স শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই মিস বসাককে শিক্ষায়তনে এনেছিলেন।'

'মিস বসাক সম্বন্ধে সেই সময়ে আপনার কি ধারণা হয়েছিল ?'

'আমি অন্ধ, মিস বসাককে দেখবার সুযোগ আমার ছিল না। তবে আমার মূক-বধির বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম যে তিনি সুন্দরী। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতন স্পর্শাতুর শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছিল আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় একটি মন, যে মন তার সংকল্প সাধনের পথে কোনো বাধাকেই গ্রাহ্য করবে না।'

'কোন সংকল্পের কথা বলতে চাইছেন আপনি ?' দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করল বিপ্রদাস।

'তাঁর দীপককে বিয়ে করার সংকল্প,' সঙ্গে সঙ্গে এল সাক্ষীর উত্তর।

'আপনার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবনের স্থায়িত্ব কি এই কথাই প্রমাণ করে না যে পরিপূর্ণ বিচার এবং বিশ্লেষণই তাঁর এই সংকল্পের ভিত্তি ?'

'এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।'

'কারণটা পরিষ্কার করে বলুন,' দৃঢ়স্বরে দাবী জানাল বিপ্রদাস।

'এ সম্বন্ধে আর কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই।'

বিপ্রদাস কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে বিচারপতি বললেন, 'আপনি স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে এসেছেন। স্বভাবতঃই আদালত আপনার কাছে এইসব অসম্পূর্ণ এবং অনির্দিষ্ট হেঁয়ালি আশা করে না। কারণটা পরিষ্কার করে বলুন।'

'আমি তো বলছি আমার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব নয়······দীপক শুধু আমার প্রিয়তম বন্ধু ছিল না, সে ছিল দীর্ঘকালের স্নেহে-যত্নে আমার হাতেগড়া······'

বিচারপতি আবার বাধা দিয়ে একটু বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি একটু আগেই শপথ গ্রহণ করেছেন। সেই শপথের কথা স্মরণ করে সত্য যা তা আদালতকে জানতে দিন।'

কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সাক্ষী। তারপর মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'বেশ, আপনার আদেশই পালন করছি আমি। মিস বসাক যখন এলেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি আর দীপক তখনো সতেরো পার হয়নি। যৌবনোচ্ছল এক তরুণীর পক্ষে এই অপরিণত কিশোরকে ভালোবাসা সম্ভব ছিল না। মিস বসাক যে দীপককে ভালোবাসেনি এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

'ভালো যে বাসেননি তার কোনো প্রমাণ আপনার জানা আছে?'

'আছে। মিস বসাক নিজে একাধিকবার আমার কাছে স্বীকার করেছেন।'

'আশা করি আপনি আপনার এই বক্তব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত?'

'সম্পূর্ণ—এখন এবং এরপরই যা বলবো সে সম্বন্ধেও। আমার সমবয়সী হওয়ার দরুন এবং হয়তো আমি দীপকের সবচেয়ে প্রিয়জন জেনেই, মিস বসাক আমাকে তাঁর অনেক মনের গোপন কথা বলেছিলেন—সেইসব কথা যা তিনি ফাদার লরেন্স বা নিজের মার কাছেও বলেননি। দীপকের প্রতি তাঁর স্নেহের সীমা ছিল না—কিন্তু একটি কোমল প্রাণের স্নেহ আর তরুণীর অন্তরের প্রেম এক বস্তু নয়!'

'আপনার কি ধারণা যে দীপক মিস বসাককে ভালোবেসেছিল?'

'ঠিক বলতে পারবো না। বলতে পারবো না, কারণ দীপকের মনের পরিমাপ আমরা কেউই করতে পারতাম না। অত্যন্ত শান্ত, আত্মসমাহিত ছিল সে। শিক্ষার সাহায্যে পঙ্গুতার বাধা কিছুটা দূর হওয়াই হয়তো গড়ে দিয়েছিল এই গভীর, গম্ভীর ব্যক্তিত্ব। সঙ্গে সঙ্গে এই পঙ্গুতাই ছিল তার অন্তরের নিভৃত অন্দরে কোনও কিছু স্বেচ্ছায় একান্ত গোপন করে রাখার সহায়ক। আমরা, যারা দৃষ্টিহীন, এক অতীন্দ্রিয় শক্তির বলে যারা আমাদের সংস্পর্শে আসে তাদের মনের কথা বুঝে নিতে পারি। তারা জানতে পারে না যে তাদের অন্তরের অত্যন্ত গোপনীয় চিন্তাও আমাদের মনের বেতারে ধরা পড়ে গেছে। বাইরের দৃষ্টি আমাদের নেই বলেই, এই অনন্ত অন্ধকারের আড়ালে আমাদের ভিতরে জ্বলছে এক তীক্ষ্ণ, তীব্র আলোর রেখা, যা নিক্ষেপ করে মানুষের নিভৃত মনের পাতার অত্যন্ত ক্ষুদ্র লেখাও আমরা স্বচ্ছন্দে

পড়তে পারি।'

বিপ্রদাস দাঁড়িয়ে উঠে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হলো, 'কিন্তু বোবা দীপকের কণ্ঠস্বর শোনবার কোনো সুযোগই আপনার ছিল না।'

'ছিল না ঠিকই, কিন্তু স্পর্শ, স্পর্শের সুযোগ তো ছিল। ছ'বছর পাশা-পাশি ছিলাম আমরা দু'জনে। এই স্পর্শের শক্তি সম্বন্ধে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। তবুও জেনে রাখুন যে এই স্পর্শের মাধ্যমে দীপকের অন্তর অবারিত হয়েছিল আমার কাছে। পরস্পরের হাতে স্পর্শ দিয়ে ভাববিনিময় করতাম আমরা। আমি নিজেকে যতটা জানতাম, তার চেয়ে বোধহয় বেশী জেনেছিলাম দীপককে। তার অন্তর খোলা বইয়ের পাতার মতন প্রসারিত হয়েছিল আমার সামনে।'

বিচারপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি একটু আগেই বলেছেন যে আসামীর মনের পরিমাণ আপনারা কেউই করতে পারতেন না। এখন আবার ঠিক তার উল্টো কথা বলছেন।'

'ঠিকই বলছি আমি। যেহেতু দীপকের অন্তর একমাত্র আমার কাছেই অবারিত হয়েছিল, তাই একমাত্র আমিই ধরতে পেরেছিলাম তার স্বেচ্ছায় কিছু কিছু জিনিস সবার কাছ থেকে, এমন কি আমার কাছ থেকেও গোপন করার প্রচেষ্টা। বালক বয়সে এই প্রচণ্ড মানসিক শক্তি, দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের পরিচয় পেয়ে, যুবক দীপকের জীবনে তার কি ফল হবে ভাববার চেষ্টা করতাম আমি। বেশীদিন চেষ্টা করতে হলো না। মিস বসাক আসবার অর্থাৎ দীপক আমার রক্ষণাবেক্ষণ থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাস কয়েক পরেই একটা ঘটনা ঘটে গেল আমাদের শিক্ষায়তনে। আজ সেই ঘটনা জানাবার জন্যেই আমি স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে এসেছি। ঘটনাটা শুনলেই আপনারা বুঝবেন যে কেন ছ'মাস আগে দীপক, এক সময়ে আমারই হাতে গড়া দীপক খুন করেছে জেনে আমি একটুও বিস্মিত হইনি। তারপর সাক্ষী দেব কি দেব না—এই কথা দিনরাত ভেবেছি। ভেবেছি, কারণ জানতাম যে আমার বক্তব্য দীপকের বিরুদ্ধে যাবে। তারপর একদিন শুনলাম যে আসামী দীপক আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেছে, এমন কি তার পক্ষ কেউ সমর্থন করে এও সে চায় না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো যে সাক্ষী দেওয়া আমার কর্তব্য। আমার কর্তব্য তাদের ভুল ভেঙ্গে দেওয়া যারা ভাবছে যে দীপকের মতন একজন তিন প্রধান ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তির পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়। জানি এই ভাবনার পিছনে আছে মানুষের স্বাভাবিক অনুকম্পা। আমি সেই অনুকম্পার বাধা ভেঙ্গে দিতে চাই, জানাতে চাই যে দীপকের পক্ষে খুনের প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। বন্ধুর প্রতি স্নেহ আজো আমার অন্তর জুড়ে আছে। কিন্তু স্নেহের চেয়ে বড় আমার আদর্শ। সেই আদর্শ বলছে আমার বক্তব্য জানিয়ে বিচারের পথ সুগম করা।'

'আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।'

'ঘটনার তারিখ ২০শে এপ্রিল ১৯৪০ সাল, সময় রাত আন্দাজ দশটা। সেদিন বাইরে ছিল বসন্তের সুন্দর সমারোহ আর অন্তরে আমার সঙ্গীত ও

সুরকারের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হবার আনন্দ। মনে মনে সুরের জাল বুনতে বুনতে বাগানে পায়চারি করছিলাম। বাগানের পথ আমার নিজের হাতের আঙ্গুলের মতন চেনা। নিশ্চিন্তে পায়চারি করছিলাম আর সুরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন। দু'মাস পরেই আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায়। গ্রামোফোন কোম্পানীতে একটা চাকরী পেয়েছিলাম, ফাদার লরেন্সই ঠিক করে দিয়েছিলেন। বাইরের মধুর পরিবেশ আর অন্তরের স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় সুরটা ধীরে ধীরে রূপায়িত হতে লাগল। নতুন একটা পরিণতির আভাস পেয়ে সুরটা সম্পূর্ণ করে লিখে ফেলবার বাসনা হলো আমার। হাঁটতে হাঁটতে তখন বাগানের প্রান্তে এসে গেছি। একটু দূরেই মালীর যন্ত্রপাতি রাখবার আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রামের জন্য কাঠের ছোট্ট একটা ঘর। ঘরটায় জানালা ছিল না, ছিল একটা মাত্র দরজা। আগেও দু'একবার সেই ঘরে বসেছি আমি। জানতাম ঘরে বসবার জন্যে একটা টুল আর ছোট্ট একটা টেবিল আছে। টেবিলে একটা হ্যারিকেন আর দেশলাইও থাকতো। আমার অবশ্য আলোর প্রয়োজন ছিল না। আমার কাছেই 'ব্রেল' লিখনের সরঞ্জাম ছিল। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটাও যে মালী ডানধারের কোণে একটা হুকে টাঙ্গিয়ে রেখে যেতো তাও জানতাম। তাই টেবিলে বসে মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠা সুরটাকে সাজিয়ে সম্পূর্ণ রূপ দেবার জন্যে সেই ঘরের পানে এগিয়ে গেলাম।

'সেদিন হাত বাড়িয়ে হুকে চাবিটা পেলাম না। হাতড়াতে হাতড়াতে দেখি চাবি সমেত তালাটা কড়ায় ঝুলছে, দরজাটা খোলা। ভাবলাম মালীর ভুল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই কানে একটা অস্পষ্ট গোঁঙানির আওয়াজ এল ; যেন গলা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরা অবস্থায় কেউ সাহায্য চাইবার চেষ্টা করছে। এগোতে যাব, আমার মাথায় এসে পড়ল প্রচণ্ড এক আঘাত। কাঠের দেয়ালে ছিটকে পড়ে, মাথা ঠুকে মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারালাম। একটু পরেই কাঁধে কার নাড়া পেয়ে সম্বিত ফিরে পেলাম। শুনলাম মিস বসাক জোরে জোরে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছেন—উঠে পড় সুবীর, শীগ্‌গির উঠে পড়—ঘরে আগুন লেগে গেছে। দীপক আগুন লাগিয়ে, বাইরে তালা দিয়ে চলে গেছে। বন্ধ ঘরে আমাদের জীবন্ত পুড়ে মরতে হবে। উঠে বসলাম আমি। নাকে ভেসে এল পোড়া কাঠের গন্ধ, কানে এল কাঠ ফাটার আওয়াজ। চকিতে দাঁড়িয়ে উঠলাম। শুনলাম পাশে দাঁড়িয়ে মিস বসাক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। অসহ্য আগুনের তাপে মুহূর্তে ঘেমে নেয়ে উঠলাম, পায়ে পেলাম আগুনের স্পর্শ। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয় হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শরীরে হঠাৎ এল শক্তির জোয়ার। বিপুল বিক্রমে সর্বাঙ্গ দিয়ে ধাক্কা দিলাম বন্ধ দরজায়। একবার, দু'বার, তিনবার। হাঁফিয়ে পড়েছিলাম। আবার নিজেকে সংহত করে দিলাম ধাক্কা। দরজা ভেঙ্গে ছিটকে পড়লাম বাইরে, পেছনে আমার পর লাফিয়ে বাইরে এলেন মিস বসাক। ততক্ষণে দূর থেকে আগুন দেখে দু'জন শিক্ষক ছুটে এসে পড়েছেন। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে কাঠের ঘরটা,

পোড়া কাঠ ছিটকে এসে পড়ল আমার গায়ে। শিক্ষক দু'জন দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন আমাদের। আমরা দু'জনে একটু সামলে উঠতে একজন শিক্ষক কি হয়েছিল জানতে চাইলেন। আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই চটপট উত্তর দিলেন মিস বসাক—আমি কৌতূহলের বশে ঘরটায় ঢুকেছিলাম। অন্ধকার দেখে আলো জ্বালাতে গিয়ে জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা হাত ফসকে পাশের খড়ের গাদায় পড়ে আগুন জ্বলে উঠল। ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম আমি। সুবীর আমার চীৎকার শুনে আগুন অগ্রাহ্য করে ঘরে ঢুকে আমায় বাইরে বার করে এনেছে।

'মিস বসাকের মনগড়া এবং গায়েপড়া এই কৈফিয়তটা শুনে বিস্মিত হলাম, কিন্তু তখুনি কোনো প্রতিবাদ জানালাম না। ঘরে ফিরে যাবার পথে চুপি চুপি তাঁকে প্রশ্ন করলাম—আপনি সত্য যা ঘটেছে তাই না বলে বানানো ওই কাহিনীটা বললেন কেন? উত্তরে আমার হাত চেপে ধরে কাতর অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন—সুবীর, আমার একান্ত অনুরোধ—আমি যা বলেছি, কেউ জিগ্যেস করলে তুমিও তাই বলবে। মিছিমিছি দীপককে ঝামেলার মধ্যে ফেলায় লাভ কি বল! বুঝতেই তো পারছো, ওর মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নেই।

'আমি এই অনুরোধের মধ্যে অন্যায় কিছু দেখিনি। অনুরোধ আমি মেনেও নিয়েছিলাম। কাঠের ঘরটা পোড়া নিয়ে আর বিশেষ গোলমাল হলো না। কেউ আহত হয়নি এই শুনেই সকলে আশ্বস্ত হয়েছে মনে হলো। একটু পরেই দীপকের ঘরে গিয়ে দেখলাম সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, ঘুমোবার ভান করছে আর কি। রাত্রে বিছানায় শোবার পর সন্ধ্যার দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সুস্থির মস্তিষ্কে ভাববার সুযোগ পেলাম। মনে পড়ল কেমন করে দৈববলে সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত এড়িয়ে তারপর ঘটনাচক্রে নারীত্রাতা হলাম আমি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাইরের এই মিথ্যা আবরণটুকুর আড়ালে সত্যকে অনুভব করলাম। বার বার এই কথাই মনে হলো যে দীপক কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে মিস বসাককে ভুলিয়ে নিয়ে কাঠের ঘরে ঢুকেছিল। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে তার সব মতলব বানচাল হয়ে যায়। ক্ষেপে উঠে সে প্রথমে আঘাত করে আমায়, প্রচণ্ড আঘাতে আমার প্রাণহানি করতে চেয়েছিল সে। তারপর সে নিজের হাতে জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা উল্টে দেয় খড়ের গাদায় এবং আগুন জ্বলতেই বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে সরে পড়ে। আমাদের দু'জনকে সেই বন্ধঘরে জীবন্ত দগ্ধ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। অতীতের এই ঘটনা থেকে আজ একটা কথাই প্রমাণ হয়—প্রমাণ হয় যে, জাহাজে খুন করবার ঠিক দশ বছর আগে দীপক দত্ত দু'জন নিরীহ নরনারীর প্রাণহানিতে উদ্যত হয়েছিল।'

চকিতে সকলকে চমকে দিয়ে ঘরের সেই থমথমে আবহাওয়ার বুকে এসে বিঁধলো একটা মর্মভেদী আর্তনাদের তীব্র, তীক্ষ্ণ শলাকা। বিস্ফারিত চোখ মেলে সকলে দেখল দীপক দত্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে কাঠগড়ায়, শূন্যে তার বজ্রমুষ্টি

দুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে সেই মানবরূপী দানব। ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল পাশের প্রহরীরা। সঙ্গে সঙ্গে ভারী বস্তার মতন লুটিয়ে পড়ল তার ক্লান্ত বিশাল দেহ।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বিচারপতি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলেন দোভাষীকে, 'আসামী কি কিছু বলতে চাইছে?'

দোভাষী দীপকের হাতের চেটোয় কিছুক্ষণ আঙ্গুল চালনার পর জানালেন যে কিছুই বলছে না সে।

বিচারপতি তখন সাক্ষীর পানে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে।'

সামনের কাঠগড়া আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল সুবীর সরকার, কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘামের চিহ্ন। আর্তনাদের সেই শলাকা বোধহয় তারই বুকে এসে বিঁধেছিল। তাই মড়ার মতন সাদা মুখ তুলে নিরুত্তর সে তাকালো বিচারপতির পানে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে আচ্ছন্ন ঘরের এই আবহাওয়ায় উঠে দাঁড়াল বিপ্রদাস। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সাক্ষীকে প্রশ্ন করল, 'আপনি নিজেও বলেছেন এবং বেশ বোঝাও যাচ্ছে যে সেই কাঠের ঘরে আপনার আলোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাহলে সেই আলোটা জ্বাললে কে?'

'মিস বসাক। দু'দিন পরে মিস বসাক আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে সেই অন্ধকার ঘরে দীপকের সঙ্গে একা ঢোকার পরই ভয় পেয়ে তিনি আলোটা জেবলেছিলেন।'

'আপনি কি করে স্থিরসিদ্ধান্তে এলেন যে দীপকই ইচ্ছে করে জ্বলন্ত হ্যারিকেন পাশের খড়ের গাদায় ফেলে দিয়েছিল?'

'আমার ধারণা মিস বসাকের সমর্থন পেয়ে দৃঢ় হয়েছিল। পরের দিন মিস বসাক বলেছিলেন যে দীপকই আকস্মিক ক্রোধের তাড়নায় অমন কাজ করেছিল।'

'তাই যদি হয় তাহলে এও আপনার মনে হওয়া উচিত ছিল যে মিস বসাক দীপককে ভালবাসতেন বলেই তাকে হাঙ্গামা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন!'

'না, এই বাঁচাবার চেষ্টার মধ্যে ছিল দীপকের প্রতি তাঁর অনুকম্পার পরিচয়। শুধু অনুকম্পা আর কিছু নয়।'

জেরা শেষ হতেই অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে জুরীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি শুধু সাক্ষীর কয়েকটি কথার গুরুত্ব আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাক্ষী বলেছেন, জাহাজে খুন করার ঠিক দশ বছর আগে সাংঘাতিক ক্রোধের বশে আসামী দু'জন নিরীহ নরনারীর প্রাণহানিতে উদ্যত হয়েছিল। ক্রোধ, আসামীর এই ক্রোধের মধ্যেই নিহিত আছে মিঃ বিচামকে খুনের অন্তর্নিহিত কারণ। আমি এইটুকু মনে রাখতে বলছি যাতে আসামীর বর্তমান শান্ত নিরীহ রূপ দেখে আপনারা ভুল না বোঝেন। স্বেচ্ছায়, গভীর

মতলব নিয়ে এই মুখোশ পরেছে আসামী, এইভাবে সে আপনাদের অভিভূত করতে চায়, চায় আপনাদের করুণা আকর্ষণ করতে।'

বিচারপতি সাক্ষীকে যেতে বলে বিশ্রাম ঘোষণা করলেন।

আধঘণ্টার বিশ্রাম। অগণিত কণ্ঠের গুঞ্জনে ভরে উঠেছে ঘর। শ্যামল পালিত গট্‌গট্‌ করে চলে গেলেন অতসীর সামনে দিয়ে। মুখের উজ্বল ভাব দেখেই বোঝা গেল যে সাক্ষীদের জবানবন্দীতে খুব খুশী হয়েছেন ভদ্রলোক। কিন্তু বিপ্রদাস কোথায়? চোখ ফিরিয়ে অতসী দেখে বিপ্রদাস দোভাষীর সামনে দাঁড়িয়ে বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে কি যেন বলছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে একটু কাছে যেতেই কানে তার এল বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর 'একটু আগে দাঁড়িয়ে চীৎকার করা ছাড়া, আসামী শেষের কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী শুনতে শুনতে একবারও কি উত্তেজনা বা অখুশীর ভাব প্রকাশ করেছে?'

দোভাষী উত্তর দিলেন, 'না। আসামী সর্বক্ষণ শান্তভাবে সবকিছু শুনেছে। একটা আঙ্গুল নড়ে ওঠার লক্ষণও দেখতে পাইনি আমি।'

'আপনাকে কোন প্রশ্নও করেনি?'

'না। আমি যা সংকেতের মারফত জানিয়েছি, সব শান্তভাবে গ্রহণ করেছে সে। সামান্য কোনো মন্তব্যও তার কাছ থেকে পাইনি।'

'আত্মীয়দের জবানবন্দী শোনার সময় বিচলিত হবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল?'

'না। বরঞ্চ তার নির্বিকার ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আত্মীয়দের কথা তার মনে কোনো রেখাপাতই করেনি।'

'তাই হওয়াই অবশ্য উচিত। আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে তার মনের ভাব বোঝা খুব কঠিন হয়। আমার এক অধ্যাপক প্রায়ই বলতেন যে একমাত্র বাল্যের ঘৃণাই মানুষের মনে আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকে। দীপককে দেখার পর এই কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে আর আমার একটুও সন্দেহ নেই।'

এই সময় দোভাষী প্রশ্ন করলেন, 'এইসব সাক্ষীর জবানবন্দী শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে মিঃ বসু?'

'আমি ঠিক ওই একই প্রশ্ন আপনাকে করবো ভাবছিলাম,' হেসে বলল বিপ্রদাস।

'আমায় করলে আমি উত্তর দিতে পারবো বলে মনে হয় না। বেশ জোরালো সব সাক্ষী সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়—ঘটনার বিবরণ, প্রমাণ সবই বেশ জোরালো—মানে এক মিঃ বিচামের কেবিনে পাওয়া আঙ্গুলের ছাপের প্রমাণই তো যথেষ্ট! কিন্তু এইসব এবং সেইসঙ্গে আসামীর স্বীকারোক্তি বিচার-বিবেচনা করেও আমার কেমন মনে হচ্ছে যে আপনার মক্কেল নির্দোষ।'

'নির্দোষ? অবাক করলেন দেখছি!' বিস্ময়বিমূঢ় বিপ্রদাস না বলে পারল না।

'নির্দোষ মানে আমি বলতে চাই যে খুন করার তার ন্যায়সঙ্গত

কারণ ছিল।'

'তাই বলুন। আমিও আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু কি জানেন, খুন ব্যাপারটাই ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করা যায় না।'

কথা শেষ করে হাসতে হাসতে নিজের জায়গায় এসে বসল বিপ্রদাস। চোখ বুজে কি একটু ভেবে নিল। তারপর চশমাটা ঠিক করে নাকে বসিয়ে নিয়ে, সামনের প্যাড থেকে একটা কাগজ টেনে কি লিখতে শুরু করল। কৌতূহলের আতিশয্যে একটু বোধ হয় বেশি ঝুঁকে পড়েছিল অতসী। তার একটা চুল উড়ে বিপ্রদাসের গালে লেগে থাকবে হয়তো। লেখা থামিয়ে ফিরে তাকালো সে। লজ্জায় সরে যেতে চাইছিল অতসী। সহাস্যমুখে তাকে কাছে ডাকল বিপ্রদাস। তারপর যেন গোপন কিছু বলছে এইভাবে গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলল, 'আমি বলছি যে দীপক দত্ত খুন করেনি। তোমার কি মনে হয়?'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝবার কিছু নেই। আমি বলছি যে দীপক দত্ত মিঃ বিচামকে খুন করেনি।'

'এইবার বুঝেছি। কিন্তু এই কথা জুরীকে বোঝানো বোধহয় এত সহজ হবে না। অবশ্য সহজ হতে পারে যদি আপনি অপর কে মিঃ বিচামকে খুন করেছে তা বলে দিতে পারেন।'

'ধৈর্য ধর কন্যা,' রহস্যময় হাসি হেসে বলল বিপ্রদাস, 'এই টেলিগ্রাম লণ্ডনে পাঠিয়ে এখনই ফিরে আসছি আমি। তুমি ততক্ষণ চা ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করে নাও।'

নাকে ঝুলে পড়া চশমাটা সামলাতে সামলাতে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল বিপ্রদাস। আনমনা অতসীও এসে বসল বাইরের একটা কাফেতে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বার বার তার মনে ভেসে এল অ্যাডভোকেট জেনারেলের শেষ মন্তব্য—'স্বেচ্ছায়, গভীর মতলব নিয়ে এই মুখোশ পরেছে আসামী, এইভাবে সে আপনাদের অভিভূত করতে চায়, চায় আপনাদের করুণা আকর্ষণ করতে।' অর্থাৎ যেমন বিপ্রদাসের তেমনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের—আসামীর শান্ত নিরীহ রূপ সম্বন্ধে দু'জনেরই বিন্দুমাত্র ভুল ধারণা নেই। বিপ্রদাসও তাকে বলেছে যে এই মুখোশের তলায় লুকিয়ে আছে একটি বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন মন। তবে আসামী পক্ষের সঙ্গে ফরিয়াদী পক্ষের মতে যেটুকু পার্থক্য তা এই মুখোশের ভূমিকা সম্বন্ধে। ফরিয়াদী পক্ষ বলছে যে এই মুখোশ আসামীর বাঁচবার অস্ত্র। আসামী পক্ষ বলছে যে তা নয়। আর সেই জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করছে বিপ্রদাস এই মুখোশ অপসারিত করার। পারবে কি বিপ্রদাস, পারবে কি দীপক দত্তকে তার স্বরূপে প্রকাশিত করতে? সরিয়ে দিতে পারবে তার এই হিমশীতল নীরবতার আবরণ? বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন মন যার আছে সে 'পশু' নয়; অন্ততঃ অতসীর চোখে তো নয়ই। আর দীপক দত্ত 'পশু' নয় বলেই বিপ্রদাসের সাফল্য সম্বন্ধে ক্ষীণ আশা পোষণ করতে পারছে অতসী।

আশার কথায় মনে পড়ে গেল সুবীর সরকারের অভিযোগের উত্তরে দীপকের মর্মভেদী আর্তনাদ। বুকফাটা সেই আর্তস্বর ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে দিয়েছিল ঘরের প্রতিটি মানুষকে। অতসীও বাদ যায়নি। এখন তার মনে হচ্ছে যে সেই চীৎকারের মধ্যে শুধু অসহায়ের ক্রোধই প্রকাশ পায়নি। আরো কিছু ছিল, ছিল একটি আর্ত নিঃসঙ্গ নিপীড়িত অন্তরের কান্না। এই কান্না শোনার পর বিকলাঙ্গ অথচ অসহায় পুরুষটিকে করুণা না করে কি থাকা যায়!

বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো আদালতের কাজ। অতসীর মনে হলো শ্রোতার ভীড় যেন একটু বেড়েছে। অসংখ্য কণ্ঠের গুঞ্জন ধীরে ধীরে থেমে এল। শোনা গেল বিচারক পরবর্তী সাক্ষীকে বলছেন, 'আপনার পুত্র দীপক দত্ত সম্বন্ধে যা জানেন অনুগ্রহ করে আদালতকে বলুন। এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়া আপনার পক্ষে যে কত বেদনাদায়ক তা আমরা জানি। কিন্তু সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য আপনার সাক্ষ্য একান্ত প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজন নয়; আপনার কন্যা এবং জামাতার সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার প্রত্যেকটি কথাই হবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি জানি' অস্ফুটস্বরে বললেন দীপকের মা মিসেস রেবা দত্ত। অন্তরের আলোড়নের রেশ পাওয়া গেল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

বিচারপতি তাঁকে সামলে নেবার একটু সুযোগ দিয়ে অনুনয় করলেন তাঁর বক্তব্য শুরু করতে।

একটু থেমে বলতে আরম্ভ করলেন মিসেস দত্ত:

'দীপক এখন অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে ও এখনো শিশুই আছে; সেই শিশু, প্রথম দশ বছর যে আমার কাছটিতে ছিল। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, সদা-সশঙ্ক সেই শিশুর স্মৃতিই আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। অন্ধ-মূক-বধির এই শিশুকে আমরা সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য চেষ্টা করলেও দিতে পারিনি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না কারণ ও হয়তো অনেক কিছুই বলতে চাইতো কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম না কিছুই। অসহায় শিশুর এই নিষ্ফল প্রয়াস দেখে আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই প্রতিদিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছি তাকে সুখী করার। কিন্তু পারিনি, আর না পেরে শুধু ব্যথাই পেয়েছি আমরা। আমাদের করণীয় কিছুই নেই দেখে শেষে বাধ্য হয়ে ফাদার লরেন্সের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। একমাত্র ছেলেকে চোখের আড়াল করার কথা ভাবতে বুক ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু রাজী হয়েছিলাম এই ভেবে যে রামপুরহাটে গেলে ওর পঙ্গুত্বের অবসান হবে।'

'তাহলে ফাদার লরেন্সের দক্ষতায় আপনার এবং আপনার স্বামীর দু'জনেরই অসীম বিশ্বাস ছিল?'

'হ্যাঁ, প্রথমে তাই ছিল। ফাদার লরেন্স ভার নেবার ঠিক এক বছর পর আমি রামপুরহাটে গেলাম দীপককে দেখতে। তার শিক্ষার অগ্রগতিতে চমৎকৃত হলাম। কিন্তু আমার প্রতি তার ব্যবহারে মনে রূঢ় আঘাত পেলাম। একটা ঘরে বসে ফাদার লরেন্সের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ফাদার লরেন্স দীপকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অজস্র প্রশংসা করছিলেন। এমন সময় সেই ঘরে এল

দীপক। ফাদার লরেন্সই তাকে আমার আসার খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল।

'দীর্ঘকাল পর ছেলেকে দেখে আনন্দে ভরে উঠল আমার বুক। কত বড় হয়ে উঠেছে দীপক, কি সুন্দর সুগঠিত হয়ে উঠেছে তার দেহ। মাথা উঁচু করে, বুক চিতিয়ে নিঃশঙ্ক ভঙ্গীতে পা ফেলে ঘরে এল দীপক। আশ্চর্য হলাম দেখে যে হাতে কোনো লাঠির সাহায্য না নিয়েই একেবারে স্বাভাবিকভাবে সে চলাফেরা করছে। ঘরে ঢুকে এমনভাবে এগিয়ে এল যেন আমাকে দেখছে বা আমার কণ্ঠস্বর শুনেছে।

'আনন্দে বিহ্বল হয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিলাম। দীর্ঘকাল পরে ছেলেকে কাছে পেয়ে চোখ ফেটে জল এল আমার। যত আদর করতে যাই, ছেলে আমার ততই পাথরের মতন শক্ত হয়ে ওঠে, প্রাণপণ চেষ্টা করে আমার কাছ থেকে সরে দাঁড়াবার। কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার দিকে তার মুখ ফেরাতে পারলাম না। অসহায় চোখ তুলে তাকালাম ফাদার লরেন্সের দিকে। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দীপকের হাত টেনে নিলেন নিজের হাতে। তারপর অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাকে বললেন—ছিঃ দীপক, অমন করে না। কতদিন পরে তোমার মা এসেছেন, তোমার মা—যাঁর অপেক্ষায় তুমি এতদিন ছিলে, যাঁর কথা কত বলেছি আমি তোমাকে···। কিন্তু কিছুতেই ছেলের ঘাড় একটুও নড়ল না। ফাদার তখন ছেলের ডানহাত নিয়ে রাখলেন আমার মুখের ওপর। সেই কম্পিত স্পর্শের অভূতপূর্ব শিহরন ভোলবার নয়। ভ্রূ থেকে ধীরে ধীরে সেই স্পর্শ নাকের পাশ দিয়ে নেমে এল ঠোঁটে তারপর সরে গেল গাল বেয়ে চোখের কোণে। ভেজা চোখের পাতায় হঠাৎ যেন আটকে গেল তার আঙ্গুল। ক্ষণিক বিস্ময় বিমূঢ় দেখাল তাকে। তারপরই চকিতে ভেজা আঙ্গুলটা নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে স্বাদ নিল · কুঁকড়ে উঠল তার সারা মুখ, যেন এক তীব্র যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছে সে। বোধহয় পারল না, সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে নিঃসারিত হলো এক মর্মন্তুদ আর্তনাদ। ভয়ে ছেলেকে ছেড়ে দিলাম আমি। চোখের পলক না পড়তেই সে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তার আর্তনাদের রেশ তখনো মুছে যায়নি। মনে পড়ল যে বাড়ীতে প্রতি রাতে আমি তার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই শুনতে পেতাম তার কণ্ঠ নিঃসারিত ওই একই আর্তস্বর। আবার এখানেও এক বছর পরে হলো সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। হতাশ হয়ে চোখ তুলতে ফাদার এগিয়ে এসে অনেক সান্ত্বনা দিলেন আমায়। আমার মনে আছে আর সহ্য করতে না পেরে আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—বাড়ীতে প্রতিদিন তার এই আর্তস্বর শুনেছি। আজ এক বছর বাদে সেই একই স্বর তুলে সে পালিয়ে গেল তার মার কাছ থেকে। তাহলে তার কাছে এই স্বরটুকু ছাড়া কিছুই কি আমার প্রাপ্য নেই? এই কি আপনার শিক্ষার ফল?

'ফাদার বেশ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—কিন্তু ও যখন আপনার বাড়ীতে ছিল তখন আপনি যে কে তাই ও জানতো না।

'এই কথা শুনে সেই প্রথম আমার মনে হলো যে আমার ছেলে পর হয়ে

গেছে, আর তাকে ফিরে পাবো না আমার বুকে। রামপুরহাটের শিক্ষাই দীপককে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর এই শিক্ষার পিছনে ছিল ফাদার লরেন্সের গোপন অভিসন্ধি। ফাদার লরেন্সই মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন ছেলেকে। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর এই শিক্ষা আমাদের পক্ষে শুভ হয়নি। সেই সময় তাকে মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে সচেতন করার সামান্য চেষ্টা হলে ছেলেকে আমার আজ এই অবস্থায় দেখতে হতো না বলেই আমার বিশ্বাস।' এই পর্যন্ত বলে আবেগে ভেঙ্গে পড়লেন ভদ্রমহিলা; চোখে রুমাল চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু সময় দিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'তাই যদি হয় তাহলে সেই সময়েই আপনি ছেলেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন না কেন?'

'এই ব্যবস্থায় অনেক বাধা ছিল। প্রথম, অল্প সময়ে দীপকের শিক্ষার অগ্রগতিতে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ফাদার লরেন্সের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি আজও আমার শ্রদ্ধার শেষ নেই। আমার অভিযোগ ছিল নৈতিক শিক্ষার অভাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওই অভিযোগের কারণে ছেলের মানসিক সমুন্নতিতে, তার বুদ্ধিমান, বিদ্বান, মানুষ হওয়ার পথে বাধা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিক্ষা শেষ হলেই ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ফিরে এসেছিলাম রামপুরহাট থেকে। স্টেশনে ফাদার লরেন্স অবশ্য আমায় বলেছিলেন—আপনি নিশ্চিন্ত হোন। পরের বার এসে দেখবেন দীপক সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তার মা-কে ভালোবাসতে শিখেছে সে। আমার কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিল সে। কিন্তু তাতে তার মনের ভয় যায়নি। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ মন তার, এই প্রথম মায়ের বুকে ধরা পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বাড়ীতে যখন সে ছিল তখন 'মা' এই কথাটার অর্থই জানতো না সে, আপনার সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্য ছিল তার কল্পনার বাইরে। এখন সে জেনেছে আর তাই এখন নিশ্চয়ই সে আড়ালে কোথাও বসে বসে কাঁদছে। আমি গিয়েই তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে তার ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা করবো। আমার বিশ্বাস আমি ব্যর্থ হব না।

'এরপর প্রতিবছর একবার করে দীপককে দেখতে গেছি। তার কণ্ঠে সেই আর্তস্বর আর শুনিনি। কিন্তু বেশ বুঝতে পারতাম যে এক একটা বছর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে আমার কাছ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। বিভ্রান্ত আমি আড়ালে চোখের জল ফেলতাম। মায়ের কাছে এত কথা বলবার থাকে ছেলের। ছেলে আমার লেখাপড়া শিখছে, অন্য মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পদ্ধতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছে সে। সব শুনতাম, কিন্তু দীপকের পক্ষ থেকে একবারও আমার সঙ্গে, তার মায়ের সঙ্গে একান্তে মনের কথা বলবার আগ্রহ দেখিনি। উন্মুখ হয়ে থাকতাম কখন সে কথা বলবে, শুধু আমারই সঙ্গে কথা বলবে আর আমি বড় বড় অক্ষর সাজিয়ে দেব তার উত্তর, জানাবো মায়ের অন্তরের ব্যথা। কিন্তু সে সুযোগ আসেনি। কথা সে বলতো

ঠিকই, বলতো 'ব্রেল' পদ্ধতিতে। ফলে দোভাষীর প্রয়োজন হতোই। দোভাষীরূপে ফাদার লরেন্স প্রতিবারই উপস্থিত থাকতেন মা আর ছেলের মাঝে এক মূর্তিমান বাধা হয়ে।

'বছর পার হবার সংগে সংগে 'ব্রেল' পদ্ধতির সাহায্য নেওয়াও ছেড়ে দিল দীপক। আমার সামনে এসে নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকতো সে। প্রথম যেবার এই অবস্থার সম্মুখীন হলাম, ছেলের ব্যবহারে অভিভূত না হয়ে পারিনি। অসহায় আমি, ফাদার লরেন্সের সাহায্য চাইলাম, সন্তানের এই শিক্ষার পেছনে যে শিক্ষকের হাত আছে তা জেনেও। এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম আমি। ফাদার এগিয়ে মৃদু অনুযোগ জানিয়ে দীপককে বললেন—ছিঃ দীপক, তোমার কাছে এই ব্যবহার আমি আশা করিনি। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—অত্যন্ত বুদ্ধিমান আপনার ছেলে, শুধু তাই নয় অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ ওর মন। প্রতিভার এটা বিশেষ লক্ষণ। এক এক সময় আমিই ওকে সামলাতে পারি না। অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করতে হয় ওর সংগে। অর্থাৎ আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে দোষ যদি কিছু থাকে তা আমার ছেলেরই, তার শিক্ষকের নয়। উনিশ বছর বয়সে বি. এ. পাশ করল দীপক। আমি সেই বছর গিয়ে প্রথমেই ফাদার লরেন্সের মারফত আমার কাছে বাড়ীতে ফিরে যাবার প্রস্তাব করলাম। সোজা অসম্মতি জানালো সে। ফাদার লরেন্স কৈফিয়তের ভংগীতে বললেন যে আরো কিছুদিন রামপুরহাটে থাকলে দীপকের ভালই হবে, কারণ একটা বই লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে। প্রচেষ্টায় সফল হলে সম্মান এবং অর্থ দুই আসার পথে আর বাধা থাকবে না।

'কোন মা ছেলের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে বাধা হতে পারে? রাজী হলাম আমি। উৎসুক প্রতীক্ষায় রইলাম—কবে শেষ হবে তার বই লেখা। তিন বছর বাদে বার হলো সেই বই।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'এই বই সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?'

'নির্বাসিত আত্মা' পড়ে খুব ভাল লেগেছিল আমার। রাস্তায় চলতে চলতে শো কেসে সাজানো বইয়ের ওপর ছেলের নাম দেখে গর্বে বুক ভরে উঠতো।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'অন্ধ-মূক-বধির নায়কের আত্মীয়-স্বজনের বিকৃত বর্ণনা পড়ে মনে আঘাত পাননি আপনি?'

'মোটেই না। উপন্যাস উপন্যাসই।'

এইখানে দাঁড়িয়ে উঠে বিপ্রদাস বলল, 'নির্বাসিত আত্মার কথা উঠলো বলেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই উপন্যাসের মধ্যে নায়কের মা সম্বন্ধে একটা কথাও নেই।'

এই মন্তব্যে একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন মিসেস দত্ত।

বিপ্রদাস বসতেই বিচারপতি আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই বই বার হবার পর কি ছেলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'না, মুখোমুখি দেখা হয়নি। লেখক হিসাবে তার সুনাম শুনে গর্বিত

হয়েছিলাম আমি। কিন্তু অভিমানও কম ছিল না। অভিমান, কারণ একটা বই আমাকে পাঠানোও সে প্রয়োজন মনে করেনি। তবুও অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম! অনেকদিন অপেক্ষা করার পরও উত্তর পাইনি। তখন নিজেই রামপুরহাট যাওয়া স্থির করলাম। সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার জানতে পেরে আমার সঙ্গ নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দীপকের সঙ্গে সাক্ষাতের একটা বিবরণ লেখা।

'এতদিন যার আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছিল, এইবার সেই রূঢ় সত্য তার নগ্ন নখর সজোরে গেঁথে দিল আমার বুকে। দীপক সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু আমাকে তার সামনে যেতে দিতে রাজী হলো না। মায়ের বুক বুঝি পাথরে গড়া! তবু আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে রইলাম। এবার এলেন ফাদার লরেন্স। সান্ত্বনা বা সহানুভূতির ভণিতা না করে স্পষ্ট জানালেন যে আমার সঙ্গে দীপকের সাক্ষাৎ, দু'জনের কারুর পক্ষেই শুভ না হবার সম্ভাবনা। অতএব আমি যেন আমার ছেলের সঙ্গে আর দেখা করবার চেষ্টা না করি। অবশ্য এর সঙ্গে একটু টীকাও জুড়ে দিলেন চতুর ফাদার। বললেন যে দীপক এখন সাবালক হয়েছে। দেশ বিদেশে অচিরেই প্রচুর সম্মান অর্জন করবে সে। সুতরাং তাকে এখন স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়াই উচিত। অসুবিধেও তার কিছু হবে না। তাঁরই চেষ্টায় রুবির মতন সঙ্গিনী পেয়েছে দীপক। সব আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে রুবিই দীপকের বেশী আপনার হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় দু'জনের বিয়ে হলেই তিনিও দীপকের জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়াবেন। এই প্রথম আমি ফাদার লরেন্সের মুখে আমার ছেলে দীপকের সঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব গভর্নেসের মেয়ে রুবির বিয়ের কথা শুনলাম।'

বিচারপতি মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু মিসেস বসাক যে আপনাদের বাড়ীর কাজ যাবার পর রামপুরহাটে ফাদার লরেন্সের তত্ত্বাবধানে তাঁর মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এ কথা আপনি নিশ্চয়ই জানতেন।'

'হ্যাঁ, এবং জেনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম।'

'বিয়ের প্রস্তাব শুনে আপনি ফাদার লরেন্সকে কি বললেন?'

'আমি জানিয়ে দিলাম যে এই বিয়েতে আমার মত নেই। অবশ্য আমার মতের প্রয়োজন ছিল বলেও মনে হয় না কারণ দীপক তখন সাবালক হয়েছে। ভারাক্রান্ত মন, ভাঙ্গা বুক নিয়ে আমি ফিরে এলান। ছ'মাস পরে হঠাৎ বিয়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে চিঠি এল ফাদার লরেন্সের কাছ থেকে। চিঠি যেদিন পেলাম তার পরের সপ্তাহেই দেখলাম বিয়ের দিন। দীপকের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে একছত্র লেখাও পাইনি। আমার বিশ্বাস দীপক নিশ্চয়ই তার মাকে এই শুভদিনে কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল কিন্তু তার সেই ব্যাকুলতা আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি।'

'কে জানতে দেয়নি?'

'ফাদার লরেন্স আর দীপকের ভাবী স্ত্রী।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল এইখানে প্রশ্ন করলেন, 'তার স্ত্রী সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?'

ছেলের বউ সম্বন্ধে শাশুড়ীর মন্তব্য সহজভাবে মেনে নেওয়া কারুর পক্ষে এমনিতেই শক্ত। তাই ও-ধরনের কোনো মতামত প্রকাশে আমার আপত্তি আছে·····তবে রুবি আমাদের ভূতপূর্ব গভর্নেসের মেয়ে বলেই অর্থাৎ সামাজিক ব্যবধানের জন্যেই আমার অমত ছিল এমন কথা ভাবলেও ভুল হবে। রুবির একাধিক গুণ সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম। সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, হাসিখুশী মেয়ে রুবি, অসীম তার ধৈর্য······অত ধৈর্য না থাকলে দীপকের জন্যে কেউ তের বছর বয়স থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না।'

অত্যন্ত বিনয়নম্র স্বরে প্রশ্ন করল বিপ্রদাস, 'এই দীর্ঘ প্রতীক্ষাই কি দীপকের প্রতি তার প্রেমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় ?'

একজন পুরুষকে আয়ত্ত করবার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতীক্ষা আর তাকে ভালবাসা এক কথা নয়। তার প্রতীক্ষার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—উদ্দেশ্য দীপককে বিয়ে করা। অবশ্য এই পরিকল্পনার পিছনে ছিলেন ফাদার লরেন্স। তাঁরই উৎসাহে ধীরে ধীরে দীপকের মন তার আত্মীয়, স্বজন এমন কি তার মায়ের বিরুদ্ধেও বিষিয়ে তোলা হয়েছিল। দীপক তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল বলেই বিয়ের প্রস্তাবে মায়ের অমত তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। রুবির মা অবশ্য মেয়ের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। সব মায়েরাই পারে! কলকাতায় দেখা করে সে এই বিয়েতে যে তার মত নেই এ কথা আমার জানিয়েছিল। কিন্তু বিয়ে তাতে আটকায়নি। রামপুরহাটে, ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেরই মায়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও খৃষ্টান মতে বিয়ে হয়েছিল দীপক এবং রুবির।

বিয়ের পর দীপক, রুবি বা ফাদার লরেন্স কারুরই কোনো খবর আমি পাইনি। কেমন করে মনে নেই দীপকেব বিলেত যাবার খবরটা কানে এসেছিল। দীপক আমাকে জানায়নি বলে প্রথমটা একটু দুঃখ এবং অভিমান হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ক্রমশঃ এই ভেবে শান্ত এবং তৃপ্ত হলাম যে দীপক যাতে সুখী হয় তাই করুক। আমি আর ক'দিন—ও সুখী হয়েছে এইটুকু জানাই যথেষ্ট!

'কিন্তু যথেষ্টর বুঝি তখনও বাকী ছিল! হঠাৎ একদিন সকালে জাহাজে খুনের খবর পড়লাম। দীপক খুন করেছে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ক'টা দিন কাটিয়ে নির্দিষ্ট দিনে ছুটলাম জাহাজঘাটে। জাহাজ বন্দরে এল। হাতে হাতকড়া দিয়ে প্রহরীবেষ্টিত দীপককে আমারই পাশ দিয়ে নিয়ে গেল পুলিশের গাড়ীর দিকে। আমাকে যেতে দিল না ছেলের কাছে। ছেলে জানলো না তার পথের পাশেই দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে তার মা, সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল করে তাকে বুকে টেনে নেবার জন্যে উন্মুখ আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে তার হতভাগিনী মা। নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব দীপক চলে গেল পুলিশের পাহারায়। দেখলাম কেউ নেই তার পাশটিতে, তার স্ত্রীও নেই। দু'বছর পর

সেই প্রথম আবার এক মর্মান্তিক পরিবেশে দেখলাম আমার ছেলেকে।'

কথা শেষ করে নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস দত্ত। রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানল না আর। কাঠগড়ার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন রোরুদ্যমানা মা। বিপ্রদাস সান্ত্বনা দেবার জন্যে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল সেইদিকে। বিচারপতি অল্প বিরতির প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিসেস দত্ত। প্রাণপণ চেষ্টায় সামলে নিয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললেন ঃ

'না, বিরতির প্রয়োজন নেই। এখনও শেষ হয়নি আমার কথা। আমি এখানে এসেছি আমার ছেলের পক্ষ সমর্থন করতে, সমস্ত চক্রান্ত থেকে তাকে রক্ষা করতে।······দীপক খুন করেনি, দীপক সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি মা, আমার ছেলেকে আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না··· ···বাল্যে সে দুর্দান্ত এবং ক্রোধী ছিল বলেই আজ সে খুন করবে এ কেমন যুক্তি! আমি জানি এখানে সকলেই তার বিরুদ্ধে। এই বিরুদ্ধতার কারণ তার আকৃতি। কিন্তু আকৃতি অসাধারণ বলেই কি তার আন্তরসত্তাকে অস্বীকার করতে হবে। আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা—দীপককে ছেড়ে দেওয়া হোক, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক আমার বুকে। আমি ওকে নিয়ে সুদূরে কোনো বিদেশে, সকলের চোখের আড়ালে চলে যাব। মা আর ছেলে দু'জনে সমাজ সংসার থেকে দূরে থাকবো। কেউ আর দেখতে পাবে না দীপককে, জানবে না ওর অস্তিত্ব।'

কান্নায় ভেঙে পড়লো সাক্ষীর কণ্ঠস্বর। থরথর করে কাঁপছে তাঁর সারা দেহ, কপালে জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের জলের সঙ্গে মিশে ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে। ব্যথাতুর মাতৃহৃদয়ের এই আবেদনে অভিভূত হয়েছে ঘরের প্রতিটি মানুষ। থম্‌থম্ করছে ঘরের আবহাওয়া। বিচারপতি কিছুক্ষণ নীরব থেকে, গম্ভীর মুখ তুলে বললেন, 'নির্মম হলেও কর্তব্যের তাগিদে আর একটা প্রশ্ন আমায় করতে হচ্ছে—কারাগারে ছেলের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?'

'না, দেখা আমি করিনি। আমি জানতাম যে দীপক আমার সঙ্গে দেখা করবে না। কেমন করে বোঝাই যে ওকে আমি সবরকমে সাহায্য করতে চাই।'

আবেগের আতিশয্যে শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট শোনা গেল। কাঠগড়ায় ছেলের পানে ফিরে তাকালেন তিনি। নিস্পন্দ নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে আসামী। তার প্রসারিত হাতে আঙ্গুল দিয়ে সংকেত এঁকে প্রতিটি কথা দোভাষী পেঁাছে দিচ্ছে তার অন্তরে। দোভাষীকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠলেন সাক্ষী, 'দয়া করে ওকে বলুন যে ওর মা ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে ওকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। বলুন যে ওর মার একান্ত অনুরোধ, ও যেন স্বপক্ষ সমর্থনে দ্বিধা না করে। নিজের মঙ্গলের জন্যে, বংশের মর্যাদার কথা ভেবে, মৃত পিতার পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করে ওর উচিত স্বপক্ষ সমর্থনে তৎপর হওয়া। ওর সব দুর্ব্যবহার ভুলে গেছি আমি। আমি শুধু চাই ওর মঙ্গল, ওর মুক্তি ····' একটু থেমে সহসা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন সাক্ষী, 'দীপক শুনছিস্! ওরে দীপক, একবার এধারে

ফিরে দাঁড়া, দুটো হাত শুধু একটু বাড়িয়ে দে বাবা, তাহলেই বুঝবো আমার কথা তুই শুনেছিস্‌···দীপক, ওরে দীপক, শুনছিস্‌···'

বিচারপতি তাড়াতাড়ি দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসামীর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল ?'

'না।'

দোভাষীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ল সাক্ষীর অচৈতন্য দেহ। স্তম্ভিত শ্রোতাদের সামনে দিয়ে প্রহরীরা বাইরে নিয়ে চলে গেল তাঁর দেহ।

স্তম্ভিত, অভিভূত অতসীর চোখে পড়ল অচৈতন্য মায়ের মড়ার মতন ফ্যাকাশে মুখটুকু। ব্যথায় কেঁপে উঠল তার বুক। আহা, কি দুঃখ মায়ের ! মায়ের চেয়ে কে বেশী চেনে ছেলেকে, কে ভালো জানে ছেলের মন ! প্রতি কথায় তাঁর ঝরে পড়েছে ছেলের প্রতি স্নেহ, ভেসে উঠেছে ছেলের হৃদয়-মনের প্রশংসা। অথচ ছেলে ? কারুর কাছে কোনো দিন কি সহজ স্বাভাবিক রূপে দেখা দিয়েছে ওই দীপক দত্ত ? মায়ের সে সৌভাগ্য হয়নি। আজও মায়ের আকুল আর্তি শুনে মুখের একটা পেশীও একটু কেঁপে ওঠেনি তার। মায়ের কান্নায় যার মন ভেজে না, সে কি মানুষ ? কে তবে পারবে তার মনে সাড়া জাগাতে ?

অতসী আবার একবার দৃষ্টি ফেরাল আসামীর পানে। মমীর মতন ভাবহীন মুখে, দৃষ্টিহীন চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে সে। এ কি মানুষের মূর্তি ? মানুষ ঠিকই, কিন্তু এর মন বলে কিছু নেই। তিন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এর মনও মরে গেছে। কেমন একটু হতাশ হয়ে ফিরে তাকালো অতসী। দেখল বিপ্রদাস মিসেস দত্তের খবর নিয়ে ফিরে আসছে ঘরে। এও এক অদ্ভুত মানুষ—হঠাৎ মনে হলো তার। কেমন নির্বিকার, যেন কিছুই হয়নি। কেমন আপন মনে মাথা নীচু করে, রুমালে চশমা মুছতে মুছতে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের চেয়ারের দিকে।

যাজকের পোশাক পরনে, শীর্ণ, ন্যুব্জ দেহ বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন সাক্ষী দিতে। ফাদার লরেন্স। অতসীর চোখে পড়ল তাঁর মাথায় একমাথা এলোমেলো রুপোলী চুল আর দুই স্যাদা ভুর মাঝে দুটি বড় বড় চোখের উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় দৃষ্টি। চোখের পানে তাকালেই সহজ সরল সেবাব্রতী মানুষটিকে চেনা যায়। প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দময় এই বিদেশীকে ভারী ভালো লাগলো অতসীর।

প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর শেষ হবার পর ফাদার লরেন্স মৃদুকণ্ঠে শুরু করলেন তাঁর জবানবন্দী।

'সতেরো বছর আগে কলকাতায় যেদিন দীপককে আনতে যাই সেদিনকার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। প্রাসাদোপম বাড়ীর পেছনের একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসেছিল দীপক। একটা

একটা কাপড়ের পুতুলকে দু'হাত দিয়ে ক্রমান্বয়ে ঘোরাচ্ছিল সে। আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছিল পুতুলটার সর্বাঙ্গে যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বস্তুটা কেমন তা জানতে চায়। টেবিলের উল্টো দিকে বসেছিল তার চেয়ে বয়সে সামান্য বড় একটি মেয়ে—রুবি। দীপকের ভাবলেশহীন মুখের ওপর একাগ্র দৃষ্টি মেলে বসেছিল মেয়েটি, কোনো রহস্যময় বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের আগ্রহে যেমন বসে থাকে শিশুরা। দীপকের হাবার মতন মুখ আর রুক্ষ ঠোঁটে প্রাণহীনতার আভাস। আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। দীপক কিন্তু আমার উপস্থিতি জানতেই পারলো না। দীপকের পরিষ্কার হাত, মুখ, পাটভাঙা পোশাক এবং ঘরের পরিপাটি ব্যবস্থায় একটি নিপুণ স্নেহশীল হাতের ছাপ ছিল। এই অবস্থায় আমার ভাবী ছাত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম আমি।'

গলাটা একটু পরিষ্কার করে ফাদার বলে চললেন ঃ

'টেবিলের ধারে চেয়ার টেনে বসলাম আমি, উদ্দেশ্য ছিল দীপককে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা। প্রথমেই আমি তার চোখের বন্ধ পাতা খোলবার চেষ্টা করলাম। আমার আঙুলের স্পর্শ পাওয়া মাত্র সে শিউরে উঠে একটা অস্ফুট আর্তনাদ তুলে সরিয়ে নিল তার মাথা। আমি আবার চেষ্টা করলাম। এবার সে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো টেবিলটা, ঘোড়ার মতন প্রাণপণে ছুঁড়তে লাগলো তার পা দুটো। আমি দেখলাম যে রুদ্ধ রোষের তাড়নায় সারা শরীর তার থরথর করে কাঁপছে। এই অবস্থায় মেয়েটি এগিয়ে এসে তার চাঁপার কলির মতো আঙুলের স্পর্শ রাখলো দীপকের চোখে, নরম হাত বুলিয়ে দিল দীপকের সারা মুখে। যাদুস্পর্শে থেমে গেল ঝড়। আমি তখন মেয়েটির দিকে ফিরে জানতে চাইলাম তার পরিচয়, কতদিন সে দীপকের কাছে আছে ইত্যাদি······

আমাদের কথোপকথন এই রকমের হয়েছিল ঃ

'কতদিন তুমি এর কাছে আছো ?'

মেয়েটি বলল, 'তিন বছর।'

'তাহলে এর সঙ্গে তোমার খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছে বল ?'

'নিশ্চয়ই,' বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল মেয়েটি।

'আচ্ছা ও যে একেবারেই চোখে দেখতে পায় না এবং একটুও কথা বলতে বা কানে শুনতে পায় না এটা ঠিক তো ?'

'ঠিক নিশ্চয়ই ; অন্য কিছু হলে আমি অবশ্যই জানতে পারতাম। তিন বছর প্রায় সব সময়েই আমি ওর সঙ্গে রয়েছি।'

মেয়েটির আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই আমি প্রশ্ন করলাম, 'ও তোমায় খুব পছন্দ করে নিশ্চয়ই ?'

বিষাদকরুণ স্বরে উত্তর দিল মেয়েটি, 'তা তো বলতে পারি না। ও যে কথা বলতেই পারে না।'

'আর কিছুদিন পরেই তোমার সঙ্গী কিন্তু তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। তখন সে যদি জানায় যে তুমিই তার প্রথম এবং প্রিয়তমা বান্ধবী,

তুমি তা শুনে খুব খুশী হবে নিশ্চয়ই ?'

মেয়েটি বেশ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'অত আশা আমি করি না। তবে এও ঠিক যে এ বাড়ীতে একমাত্র আমাকেই ও পছন্দ করে। অন্য কারুকে ও ওর মুখ ছুঁতেই দেবে না…'

'ওর মা-কেও না ?'

মেয়েটি মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল, 'না।' তারপর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে আমার চোখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু আপনি কে বলুন তো ?'

'আমি ? তিন শো ছেলেমেয়ের বাবা আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'তিন শো ?' চোখ বড় করে বলল সে, 'সকলকেই আপনি ভালোবাসেন ?'

'নিশ্চয়ই ?'

এইভাবে কথার মালা সাজিয়ে ছোট্ট রুবির অন্তরে পৌছে গেলাম আমি। আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করল সে। তারপর নিজের থেকেই সে বলল, 'সকলে ভাবে দীপক কিছুই বুঝতে পারে না। দীপক যে কত চালাক তা ওরা কিছুই জানে না !'

'কিন্তু তুমি তা জানলে কেমন করে ?'

'কেন, বাবলুর মারফত !'

'বাবলু আবার কে ?'

'ওই যে ওই কাপড়ের পুতুলটা, দীপক যেটা নিয়ে খেলা করছে এখন। ওর তো আর কোনো খেলনা নেই।'

'তুমি ওই পুতুলটা নিয়ে খেলা কর না কি ?'

'তা কেন! আমি দীপকের সঙ্গে খেলা করি। ওর সঙ্গে খেলা করবার আর কেউ তো নেই। আমি ওকে পুতুলটা খেলা করবার জন্যে দিই আবার সময় মতো নিয়ে নিই। পুতুলটাকে ও খুব ভালোবাসে, তাই যখন তখন আমার কাছে চায়। এই চাইবার একটা সঙ্কেতও বার করেছি আমরা। আমার ডান হাতের চেটোয় ও কড়ে আঙুল ছোঁয়ালেই বুঝতে পারি যে ও পুতুলটা চাইছে। তখনই পুতুলটা দিই। আবার আমি ওর ডান হাতের চেটোয় কড়ে আঙুল ছোঁয়ালে ঠিক বুঝতে পারে ও। সঙ্গে সঙ্গে পুতুলটা ফেরত দেয় আমাকে।'

বিস্ময়ে অভিভূত আমি প্রশ্ন করলাম, 'ওর সঙ্গে কথা বলার এই মতলব তোমার মাথায় এলো কেমন করে ?'

'প্রথম দিন পুতুলটা সকালে দিয়ে দুপুরে খাবার সময় ফিরিয়ে নিলাম। ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠল। বুলডগের মতো গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে শুরু করে দিল মাটিতে গড়াগড়ি। বাধ্য হয়ে পুতুলটা ফিরিয়ে দিলাম ওকে। একটু পরেই পুতুলটা আবার নিয়ে নিলাম এবং নেবার সময় ওর ডান হাতের কড়ে আঙুলটা জোরে টিপে ধরে তুলে নিলাম। ও আবার রেগে শুরু করল গড়াগড়ি। বেশ কিছুক্ষণ চললো ওর দাপাদাপি। এবার কানই দিলাম

না আমি। কিছুপরে খুব সম্ভব ক্লান্ত হয়ে উঠে বসলো ও। তারপর কি ভেবে কে জানে ওর কড়ে আঙুলটা জোরে চেপে ধরলো আমার ডান হাতের চেটোয়। আমিও টুক্ করে পুতুলটা তুলে দিলাম ওর হাতে। জানেন, এখন রাত্রে ও পুতুলটা পাশে নিয়ে শোয়।'

'পুতুলটাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না ?'

'তা কেন হবে ? আমার মনে হয় পুতুলটা যেন আমাদের খোকা—আমার আর দীপকের।'

'তুমি ওকে আর কি শিখিয়েছ ?'

'ওর পছন্দমতন খাবার চাইবার কায়দা। আমার মা লুকিয়ে সেইসব খাবার করে দেন ওর জন্যে।'

'তোমার মা ?'

'হ্যাঁ, আমার মা তো এই বাড়ীতেই কাজ করেন।'

ছোট্ট রুবির কথা শুনে আমার বিস্ময় বেড়েই চলেছিল। এবার প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে তুমি বলছো যে দীপক ওর পছন্দ মতো খাবারের নাম সঙ্কেতে বুঝিয়ে দিতে পারে ?'

'না-না, সব খাবার পারে না। তবে যেগুলো খুব ভালোবাসে সেগুলো পারে। প্রথম ওর কাছে এসে দেখলাম যে ও রুটি আর ডিম খুব পছন্দ করে। একদিন একটা সেদ্ধ করা ডিম সামনে ধরতেই ছোঁ মেরে তুলে নিল। আমি ডিমটা কেড়ে নিলাম এবং নেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের চেটোয় আঙুল দিয়ে একটা গোল চিহ্ন এঁকে দিলাম। রাগে জ্বলে উঠে ও ঘুরে বসলো অর্থাৎ আমার হাতে গোল চিহ্ন এঁকে ফেরত নিতে রাজী নয়। আমিও ডিমের বদলে কিছু মাংস ওকে খেতে দিলাম সেদিন। মুখ ভার করে খেয়ে নিল মাংসটা কিন্তু তার আগে সারা টেবিল হাতড়াল ডিমটার জন্যে। পরের দিন আবার একটা ডিম দিয়ে কেড়ে নিলাম এবং নেবার আগে গোল চিহ্ন আঁকলাম ওর হাতে। এবার ও চট্‌পট্ গোল চিহ্ন আমার হাতে এঁকে দিল। ডিমটা পেয়ে সেদিন কি যে খুশী হলো ও। তারপর রুটি ইত্যাদি অন্যান্য খাবারের এক একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন ঠিক করে নিয়েছি আমরা।'

'রামপুরহাটে তোমাকে পেলে আমার কাজের যে কত সুবিধা হতো।' আমি না বলে পারলাম না।

'একটু অবাক হয়ে রুবি প্রশ্ন করল, 'আপনি কি কলকাতায় থাকেন না ?'

'না ; আমি দীপককে রামপুরহাটে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।'

'সে কি ! দীপক আবার কোথায় যাবে ?' কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল রুবি।

'আমার সঙ্গে যাবে। ও কি, তুমি কাঁদছো কেন ? আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে দীপকের। অবশ্য তুমি ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতন হতে গেলে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে ওকে। সেই জন্যেই আমার সঙ্গে ওর রামপুরহাটে যাওয়া প্রয়োজন।'

'দীপকের ভালোই তো আমি চাই। ও খুব চালাক, চট্‌পট্ সব শিখে

ফেলাবে দেখবেন। এক এক সময় আমার মনে হয় যে শুধু আমার হাত ছুঁয়ে ও আমার মনের সব কথা বুঝতে পারে। আরো আরো, যদি অনেক চিহ্ন বার করতে পারতাম আমি, তাহলে ওকে হয়তো এখানে রাখা যেতো। তাই না? কিন্তু কিছুতেই আর নতুন চিহ্ন মাথায় আসছে না। কাল রাতেই ভেবেছিলাম —কি করে ওকে বোঝাই যে আমার মতন ওরও একজন মা আছেন……'

'ভেবে কিছু বার করতে পারলে?'

'না, কিছুই পারলাম না।'

'তাহলেই বুঝতে পারছো, যে কাজ তুমি এমন সুন্দরভাবে আরম্ভ করেছো তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য এখন তোমার চেয়ে বেশী জানে এমন কারুর কাছে দীপকের শিক্ষার প্রয়োজন।'

'কেন, আমাকে শিখিয়ে দিলেই তো হয়! তাহলে আমি ওকে শেখাতে পারি। আমার কাছে শিখতে পেলে ও আর কোথাও যেতে চাইবে না।'

'তা ঠিকই। কিন্তু তাতে দীপক শুধু তোমার সঙ্গেই কথা বলতে পারবে, অর্থাৎ তোমাকে না হলে ওর চলবে না। অথচ স্বাভাবিক মানুষ হতে গেলে ওকে সকলের সঙ্গে কথা বলার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, যাতে যে কোনো লোকের কাছে 'বাবলু' বা একটা ডিম ও চাইতে পারে। এর জন্যে ওর প্রয়োজন অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় এবং তোমার আমার মতো তার ব্যবহার শিক্ষা।'

আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা আর সামলাতে পারল না রুবি। চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'কিন্তু দীপকের সঙ্গে শীগগির আবার আমার দেখা হবে তো?'

'এখানে ও কবে নাগাদ ফিরে আসবে তা এখুনি বলা বড় শক্ত। তবে তুমি ইচ্ছে করলেই রামপুরহাটে গিয়ে দেখা করে আসতে পারবে। আমি বলছি, ও তোমার কথা কিছুতেই ভুলতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন ফাদার লরেন্স। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, 'সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, যে ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে এত কথা বললাম আমি, সেই ভবিষ্যতে দীপকের স্ত্রী হবে।'

কথা শেষ করে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে উদাস দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফাদার লরেন্স।

বিচারপতি মন্তব্য করলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে আসামীর বাবা বা মা ছেলের সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিতেন না।'

'এমন কিছু আমার মনে হয়েছিল বলে স্মরণ হয় না। আমার কাজ মানুষের সেবা করা তাদের বিচার করা নয়।'

'আচ্ছা, এইবার রামপুরহাটের জীবন সম্বন্ধে বলুন।'

'বাড়ীর মোটরে রামপুরহাট গিয়েছিলাম আমরা। সঙ্গে রুবি ছিল, বাবলু ছিল—তাই পথে কোন অসুবিধা হয়নি। সন্ধ্যার পর পেঁাছে, দীপকের শোয়ার ব্যবস্থা আমার ঘর সংলগ্ন একটা ছোট্ট ঘরে করলাম। অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে হোস্টেলে ওকে রাখা সম্ভব ছিল না।'

'আর কোনো অন্ধ-মূক-বধির ছাত্র কি সেই সময় শিক্ষায়তনে ছিল ?'

'না। আমার শেষ অন্ধ-মূক-বধির ছাত্র ছ'মাস আগে শিক্ষান্তে চাকরী নিয়ে চলে গিয়েছিল। একটা প্রেসে দপ্তরীর কাজ জোগাড় করে দিয়েছিলাম তাকে। অবশ্য ওই ধরনের আর কোনো ছাত্র না থাকায় দীপকেরই সুবিধা হয়েছিল, ওর প্রতি একান্ত মনোযোগ দিতে পেরেছিলাম আমি। পূর্বের প্রত্যেক অন্ধ-মূক-বধির ছাত্রকে নিজে শিক্ষা দিয়েছিলাম আমি। দীপকের শিক্ষাও পরের দিন থেকেই আরম্ভ করবো বলে স্থির করলাম।'

এই সময় অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সাক্ষীর কাছ থেকে আসামীর শিক্ষার প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চাই আমরা। তাহলেই দশ বছরের এক ক্ষুদ্র শিশু কি করে স্বাভাবিক বুদ্ধিমান এক পূর্ণ-যৌবন মানুষে উন্নীত হলো বোঝা যাবে। আসামীর ওই ভয়ংকর আকৃতির আড়ালে যে শাণিত ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে তার পরিমাপের জন্য এই বিশদ বিবরণটুকু প্রয়োজন।'

বিচারপতি সাক্ষীর দিকে ফিরে বললেন, 'আশা করি বলায় আপনার আপত্তি বা অসুবিধা হবে না।'

মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন ফাদার লরেন্স ঃ

'রাত্রে ধ্যান ও ধারণার সাহায্যে নিজেকে প্রস্তুত করলাম আমি। পরের দিন দুরূহ দায়িত্ব মাথায় তুলে নেবার আগে এই প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীপকের ক্ষেত্রে কি ভাবে, কোন্ পথে আরম্ভ ঠিক হবে তা নিয়ে ভাবনার শেষ ছিল না আমার। রবি অবশ্য তার বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করেছিল। কিন্তু যদি আরম্ভ করে দেখা যায় যে খুব সাধারণ পর্যায়ের ছেলে সে। এমন অভিজ্ঞতা আমার পূর্বতন কিছু ছাত্রের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আমার শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে ছাত্রের আগ্রহ ও গ্রহণ-ক্ষমতার ওপর। যদি দীপকের জড় মন জেগে না ওঠে, যদি তা পঙ্গুতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে আলোর রাজ্যে প্রবেশের জন্য উৎসুক না হয় ? এই জেগে ওঠার জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয় ছাত্রকে, একান্ত আগ্রহে তীক্ষ্ম বুদ্ধির আলো ফেলে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সাগর পার হতে হয় তাকে। যদি দীপকের এই বুদ্ধি এবং শক্তি না থাকে, যেমন তার পূর্বতনদের অনেকেরই ছিল না।

'রবি অবশ্য আমার কাজ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। পুতুল, ডিম, চামচ, থালা, গ্লাস ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দীপকের। অত্যন্ত সন্তর্পণে এই জ্ঞাত বস্তুগুলিকে কেন্দ্র করে অজ্ঞাত অপরিচিত রাজ্যে পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম আমি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশবৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস ছিল আমার। যে শিশু বর্ণমালা দেখেনি, ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত নয় সেও বয়স্কদের অনেক কথার অর্থ আপনা থেকেই বুঝতে পারে। শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে এই বোধগম্যতা জন্মায়। আর তা ছাড়া এই কাজে সাহায্য করে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা যা তার প্রথম ক্রন্দনের

সঙ্গে সঙ্গেই স্ফুরিত হয়।'

'দীপকের ক্ষেত্রে আর একটা সুবিধা ছিল আমার। রুবির সাহায্যে তার হাত প্রাথমিক পটুতা অর্জন করেছিল। অতএব পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল সেই হাতকে দৃষ্টি এবং শ্রুতির পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা। অবশ্য আমি তখনই জানতাম যে ছাত্রের সংগে আমাকেও কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। হয়তো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে দীপকের সুপ্ত হয়তো বা লুপ্তও —চৈতন্য জাগরণের অপেক্ষায়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর হিমশীতল নীরবতার গভীরে কোথায় তলিয়ে আছে সেই দীপশিখাটুকু! পৃথিবীর আলো আর হাসি, গান আর কান্না থেকে কত দূরে, জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় আছে সেই চৈতন্য সম্পদ!

'পরদিন সকালে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল দীপককে। কিন্তু গোলমাল বাধলো মুখ হাত ধুয়ে স্নান করানোর ব্যাপারে। প্রথম ক'দিন তার সব দায়িত্ব আমি নিজে নিয়েছিলাম। স্নানের ঘরে গায়ে অপরিচিত হাতের স্পর্শ পেতেই ক্ষেপে উঠল সে। জলভর্তি টব উলটিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে যতবার সে টব উলটিয়েছিল ততবারই আমি টব জলে ভর্তি করে তাকে গা ডুবিয়ে বসাবার চেষ্টা করলাম। আমি জানতাম যে শারীরিক শক্তি দিয়ে সফল হবার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ছাত্রের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আমার ইচ্ছাশক্তির এই প্রথম সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী হলে পরের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার বাধা ক্রমশঃ শিথিল হতে বাধ্য। জানতাম যে প্রথম দিন প্রত্যেকটি কাজেই সে বাধা দেবে। কিন্তু এও জানতাম যে এই বাধার মধ্যে দিয়েই তার চরিত্রের সঙ্গে হবে আমার প্রকৃত পরিচয়। হয়তো শুধু একবার আর্তনাদ করবে সে, কখনো রেগে গোঁ গোঁ করে উঠবে, কখনো মুখ ভেঙচাবে, আবার কখনো বা পশুর মতন দেহভঙ্গী দিয়ে বাধা দেবে আমায়। চোদ্দ জন এই ধরনের ছাত্রকে শিক্ষাদানের পর এই প্রত্যেকটির অর্থ আর আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না।

'স্নানের মধ্যেই আমি আমার কাজ শুরু করে দিলাম। বরফগলা ঠাণ্ডা জল রেখেছিলাম একটা পাত্র ভরে। দীপকের ডান হাত সেই জলে ডুবিয়ে ধরে তার চেটোয় আঁকলাম এক একটা সংকেত-চিহ্ন। হাতটা অবশ হয়ে আসতে তুলে নিলাম। এইভাবে দশবার তার সেই ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাত বরফগলা জলে ডোবালাম আর ওঠালাম। এগারো বারের বার হাত বাড়াতে গিয়ে দেখি দীপকের বন্ধচোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর মতন দু' ফোঁটা অশ্রু। সত্যিই মুক্তো—অন্ধকার অতলে এই মুক্তোর, এই চৈতন্যসত্তারই সন্ধান করছিলাম আমি। আনন্দে ভরে গেল আমার অন্তর। দীপকও দেখলাম সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করেছে। হিমশীতল এই অনুভূতিটুকু সে স্বীকার করে নিয়েছে বুঝেই আমি তার সেই ডান হাতটা টেনে নিয়ে রাখলাম আমার গালে। তার মুখের ভাবে বুঝলাম এই উষ্ণতাটুকু তার ভালো লেগেছে। শৈত্য

আর উষ্ণতার এই বিপরীত দুই অনুভূতি তার মনে গেঁথে দিতে পেরেছি বলেই আমার বিশ্বাস হলো !

'এরপর আমি তার হাতটা টবের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে বস্তুটার গঠন সম্বন্ধে একটা ধারণা করায় সাহায্য করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের চেটোয় আঁকলাম প্রথমটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর একটা চিহ্ন। হতভম্বের মতন চকিতে একবার চমকে উঠেই থমকে স্থির হলো দীপক। তারপরই তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল রক্তের উচ্ছ্বাস, উত্তেজনার প্রাবল্যে দেহ উঠল কেঁপে। বেশ বুঝলাম তার ধূসর চৈতন্যের বুক চিরে চমকে উঠেছে এক নবোন্মেষের বিদ্যুৎস্ফুরণ। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে এক নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে সে, বস্তুজগতের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের পথ। দুই বিভিন্ন সংকেত তাকে বলে দিয়েছে সদ্য-পরিচিত দুই বস্তুর অস্তিত্ব—ঠান্ডা তরল জল আর কঠিন পাথরের টব। আধার ও আধেয় এই দু'য়ের পার্থক্য এরপর তার পক্ষে বোঝা কঠিন হবে না। শুধু তাই নয়, এও সে বুঝেছে যে তার সামনে সম্পূর্ণ অজানা কে যেন একজন রয়েছে। সেই মুহূর্তে আমি তার কাছে অজানা ছাড়া আর কি! অজানা হোক তবু সেই তার একান্ত সান্ত্বনা কারণ এরপর সংকেতের মাধ্যমে ভাব বিনিময়ে আর তার অসুবিধে হবে না। রুবির সৃষ্ট ভাব বিনিময়ের ছোট জগৎ এবার বিস্তৃত হবে, প্রসারিত হবে এক নতুন দিগন্তে, এই আনন্দে দেখলাম ঝলমল করছে আমার নতুন ছাত্রের মুখ।

'নবীন উদ্দীপনায় সে নিজেই একটার পর একটা জিনিস স্পর্শ করে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে শুরু করে দিল। টেবিল, টব, তোয়ালে, ভিজে, শুকনো যা কিছু হাতের কাছে পেল তাই জানবার আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হলো সে। ভিজে স্পঞ্জটা হাতে নিয়ে চাপ দিতেই জলে ভিজে গেল গা, সাবানটা পিছলে পড়ে গেল হাত থেকে······। জিনিস নিয়ে নিজের থেকেই নাকের কাছে ধরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে বুকে এঁকে নিতে চাইলো প্রত্যেকটি বস্তুর বিশেষ পরিচয়। স্পঞ্জ আর সাবানটা নিজের থেকে জিভে বুলিয়ে, দাঁতে কেটে দেখলো। আমি তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিলাম দশ বছরের সুপ্ত জীবন শেষে এই প্রথম জাগরণের পর্বে। আশ্চর্য হয়ে আমি দেখছিলাম কি অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে, যে তিন ইন্দ্রিয় তার শিক্ষার মাধ্যম হবে, সেই তিন ইন্দ্রিয়কে সে কাজে লাগাচ্ছে তার এই বস্তু জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রচেষ্টায়। ঘ্রাণ আর আস্বাদকে সে নিপুণভাবে স্পর্শকে সাহায্য করার কাজে লাগাচ্ছে—নিপুণ-ভাবে কিন্তু শিশুর সরলতায়। দেখছিলাম দুরন্ত আগ্রহে শিশু দীপক প্রত্যেকটি বস্তু তার কম্পমান আঙুল দিয়ে স্পর্শ করছে, স্ফুরিত নাসা দিয়ে আঘ্রাণ করছে আর লুব্ধ ঠোঁট বাড়িয়ে গ্রহণ করছে আস্বাদ।

'দীপকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে আর আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। অপূর্ব বুদ্ধি তার, অলৌকিক তার মেধা। দেখলাম রুবির বিশ্লেষণে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। তিন ঘণ্টা চলল এই শিক্ষার পালা। প্রত্যেকটি নতুন জিনিসের সংগে তার উদগ্রীব হাতে বিভিন্ন সংকেত চিহ্ন এঁকে পরিচয় করিয়ে

দিলাম আমি। ক্রমশঃ তার হাত ভিজে উঠলো, উত্তেজনার প্রাবল্যে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলো সে। প্রথম দিনের পক্ষে অনেক হয়েছে স্থির করে আর অগ্রসর হলাম না। ভেবে নিলাম যে পরের দিন আবার আরম্ভ করতে হবে সদ্য-পরিচিত বস্তুগুলো দিয়ে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে যোগ করতে হবে নতুন কিছু কিছু।

'বিকালে তার বাইরের খোলা মাঠে বেড়াবার ব্যবস্থা করলাম। গাছ থেকে গাছে দড়ি বেঁধে তার জন্যে একটা পথ নির্দিষ্ট করে দিলাম। এই দড়ি ধরে ধরে পথ চিনে শুরু হলো তার পদচারণ। তিনদিন পরে সে কারুর সাহায্য না নিয়েই এই নির্দিষ্ট পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এইভাবে দূরত্বের সঙ্গে পরিচয় হলো তার। শুধু তাই নয়, গতির অর্থ তার অজানা রইলো না এবং নিজের ইচ্ছেমতো হেঁটে বেড়াতে পেরে নিজের শক্তির প্রতি নতুন বিশ্বাস ফিরে পেল সে।

'অবশ্য প্রত্যেকদিন আমি তার পাশে পাশে থাকতাম। কিন্তু প্রয়োজন না হলে সাহায্য করতাম না। পথটাও প্রত্যহই একটু একটু বদলে দিতাম। আমি জানতাম যে যত বৈচিত্র্যের সঙ্গে তার পরিচয় হবে ততই জাগবে তার সুপ্ত সত্তা।

'হাতে সংকেত চিহ্ন এঁকে পরিচয়ের পর্ব বেশ কিছুটা এগোতেই ড্যাক্‌টিল বর্ণমালার সূত্রপাত করলাম। মূক-বধিরদের এই বর্ণমালার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বর্ণমালার সাহায্যেই দোভাষী এখন দীপকের অন্তরে আমার প্রতিটি কথা পেঁাছে দিচ্ছেন। তারপর এল 'ব্রেল' পদ্ধতি। এই বিশেষ বর্ণমালার সাহায্যে অন্ধদের শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা পড়তে পারে। কিন্তু এ সবই তার প্রকৃত জাগরণের প্রস্তুতি মাত্র। শুধু বস্তুর সঙ্গে পরিচয় আর নির্দিষ্ট গোটাকতক কাজের সূত্রপাত দিয়ে চৈতন্যের সম্পূর্ণ উন্মেষ সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় একাধিক ভাবধারার সঙ্গে তখনো তার পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। আমি জানতাম যে এই পরিচয়টুকু না হলে সে আমার কাছে তার অন্তরের কথা বলতে পারবে না, স্থাপিত হবে না আমার সঙ্গে তার আত্মার আত্মীয়তা।

'প্রথমে আমি তাকে আয়তন সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলবার সুযোগ দিলাম। তারই দুজন সঙ্গী—একজন বেশ লম্বা, মোটাসোটা আর একজন রোগা আর বেঁটে—এই দুজনের দেহ পুঙখানুপুঙখভাবে পরীক্ষা করবার পর বড় আর ছোটর পার্থক্য বুঝিয়ে দিলাম তাকে। এইভাবে একটার পর একটা ধারণা তার মনে গেঁথে দেবার ব্যবস্থা করলাম। একদিন শিক্ষায়তনে এক ভিক্ষুক এল সাহায্যের আশায়। আমি দীপককে ভিক্ষুকের ছেঁড়া-কাপড় স্পর্শ করে অনুভব করতে দিলাম। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হলো তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত নিয়ে রাখলাম এক শিক্ষকের সদ্য পাটভাঙা নতুন কাপড়ের ওপর। খুশীর আলো ফুটে উঠল তার মুখে। সাংকেতিক ভাষায় সে আমায় জানালে—আমি গরীব হতে চাই না! ভিখারীকে আমি ঘৃণা করি!

আমি উত্তর দিলাম—ছিঃ ও কথা বলতে নেই। আমাকে তুমি নিশ্চয়ই একটু ভালোবাস?

'ভালোবাসার কথায় তার মুখে করুণ কোমল আভা ছড়িয়ে পড়ছে দেখে পরক্ষণেই বললাম—আমাকে তুমি ভালোবাস, অথচ জান না যে আমিও একজন গরীব মানুষ।

'এরপর গরীব হওয়ার মধ্যে যে লজ্জার কিছু নেই এই ধারণাটা বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করল সে। আর একদিন তার হাত নিয়ে রাখলাম আমার মুখের ওপর। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে সে নিজেই আমার মুখের বলীরেখা স্পর্শ করার সংগে সংগে নিজের মসৃণ গালে বার বার হাত বুলিয়ে নিল। এরপর বৃদ্ধ আর তরুণের পার্থক্য বোঝানো আমার পক্ষে কঠিন হলো না। কিন্তু বিপদ বাধলো বৃদ্ধ হতে তার আপত্তি নিয়ে। বার বার সে আমায় জানাতে লাগলো যে সে আমার মতন লোলচর্ম বৃদ্ধ হতে চায় না; সব সময়ে তরুণ থাকতে চায়। অনেক পরিশ্রম করতে হলো—সব মানুষকেই যে একদিন বৃদ্ধ হতে হবে—এই সত্যটা তার মনে গেঁথে দিতে। পরে সান্ত্বনা দিলাম আমি এই জানিয়ে যে বৃদ্ধ হবার মধ্যে দুঃখের কিছু নেই, আর তা ছাড়া অন্তরে তারুণ্য থাকলে দেহের বৃদ্ধত্ব মানুষের জীবনে কোনো বাধাই নয়। সান্ত্বনায় শান্ত হলো সে।

'একদিন মাঠে বেড়াতে বেড়াতে কালপ্রবাহের সংগে তার পরিচয় করাবার চেষ্টা করছিলাম। কিছুতেই পারছিলাম না। প্রখর বুদ্ধির প্রেরণায় সম্ভবত আমার অক্ষমতা বুঝতে পারলো দীপক। তখনই দড়ি ঘেরা বাঁধা পথ ছেড়ে সামনে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলল সে, যেন বলতে চাইলো—এই যে প্রসারিত অজানা পথ এই তো ভবিষ্যৎ। মানুষের জীবনপ্রবাহের সংগে পথ চলবার সাদৃশ্য নিশ্চয়ই সাড়া তুলেছিল তার মনে। তারপর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে কি তা বোঝাতে একটুও কষ্ট হলো না।

'জীবন ও জরার সঙ্গে যার এতদূর পরিচয় হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে তার পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। সুযোগও এসে গেল, হঠাৎ শিক্ষায়তনের একজন শিক্ষকের মৃত্যু হলো এই সময়। দীপককে বিশেষ স্নেহ করতেন এই শিক্ষকটি। দেখা হলেই তাঁর হাতে চকোলেট গুঁজে দিতেন। ফলে তাঁর প্রতি দীপকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। মৃত্যুর কথা জানিয়ে তাকে বললাম যে আর তিনি চকোলেট দিতে আসবেন না। সংগে সংগে সে প্রশ্ন করল—কেন?

'বুঝিয়ে দিলাম মৃত্যুতে কেমন চিরনিদ্রায় অভিভূত হয় মানুষ, কেমন করে মানুষ চলে যায় আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

'আবার এল তার শিশুসুলভ প্রশ্ন—তাহলে এরপর কে আমায় চকোলেট দেবে?

'এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তাকে নিয়ে এলাম মৃতদেহের সামনে। পরিস্থিতিটা জানিয়ে তার হাত রাখলাম মৃতদেহের উপর। শীতল কঠিন দেহের স্পর্শে ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠলো বিরক্তির রেখা। আমি তাকে

জানালাম যে সব মানুষকেই মরতে হবে, সকলের দেহই একদিন এমনি শীতল হবে। স্থির স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল সে, অকস্মাৎ তার সারা দেহ কেঁপে উঠলো আর পরক্ষণেই সে ফুঁপিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

'আদর দিয়ে শান্ত করে বাইরে নিয়ে এলাম তাকে। কিন্তু এই সুযোগ আমি ছাড়লাম না। মৃত্যু সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ বস্তুগত ধারণাটুকু নিয়ে থাকায় আপত্তি ছিল আমার। তাই সেই মুহূর্তেই করলাম আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রস্তাবনা।

'আমি জানতাম যে রুবির স্মৃতি দীপকের অন্তরে অস্পষ্ট কিন্তু অম্লান হয়ে আছে। সেই স্মৃতিরই সূত্র ধরে তাকে নিয়ে চললাম জ্ঞানের রহস্যময় রাজ্যে! একের পর এক প্রশ্ন করলাম আমি—তুমি রুবিকে ভালোবাস নিশ্চয়ই? কিন্তু তোমার কি দিয়ে ভালোবাস তাকে? হাত? পা? মাথা? প্রত্যেকটাতেই ঘাড় নেড়ে 'না' জানালো। তখন আমি বললাম—ঠিক বলেছ তুমি। মানুষের ভালোবাসার উৎস হচ্ছে তার অন্তরে······মানুষ তার আত্মা দিয়ে অন্য মানুষকে ভালোবাসে। মৃত্যুতে আমাদের আত্মা আর দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। এইমাত্র মৃতদেহ স্পর্শ করে তুমি দেখেছো যে তা বরফের মতো ঠান্ডা। আত্মাই প্রাণ, জীবনের অগ্নি। প্রাণ নেই তাই মৃতদেহ শীতল······ দেহ ছেড়ে আত্মা অনন্তে বিলীন হয়। শিক্ষকের দেহ নয় তাঁর আত্মাই তোমায় ভালো-বাসতো, আদর করে চকোলেট দিত। মৃত্যুর পরেও তাঁর আত্মার ভালোবাসা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না।

'দেখলাম আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এই কঠিন রহস্যঘন ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে দীপকের খুব কষ্ট হলো না। আনন্দিত এবং উৎসাহিত হলাম আমি। সাহস করে এগিয়ে গেলাম আত্মা থেকে আত্মার আধারে—ঈশ্বরজিজ্ঞাসায়। মাথার উপর আকাশে তখন প্রচণ্ড তেজে জ্বলছে দ্বিপ্রহরের সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করেই আমার ছাত্রকে দাঁড় করালাম চরম জ্ঞানের মুখোমুখি।

'উষ্ণতার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল দীপকের। খোলা মাঠে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করতাম রোদের স্পর্শ পেলেই সে থমকে দাঁড়াতো, আনন্দে হাত দুটো তুলে দিত আকাশের পানে—যেন হাত দিয়ে ধরতে চাইতো এই উষ্ণতার উৎস সবিতাকে। এমন কি কখনো কখনো সে গাছের একটু উঁচু ডালে উঠে শূন্যে হাতড়াতো ওই একই উদ্দেশ্যে। তাই সে খুব উৎসাহিত হলো আমি যখন বললাম আচ্ছা দীপক, সূর্য কে তৈরী করেছে? তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিলে রাঁধুনি। অসংখ্য ধারণা তখন গিজগিজ করছিল তার মস্তিষ্কে। রাঁধুনি আর তার উনুনের ধারণাটা তার ছিলই। তাই সূর্যকে উত্তপ্ত উনুনের সমগোত্র ভাবা তার ভুল হয়নি। আর উনুন রাঁধুনি ছাড়া কেই বা করবে! আমি তখন তাকে সূর্যের উত্তাপ আর উনুনের উষ্ণতার পার্থক্য বোঝালাম এবং বুঝিয়ে দিলাম যে কেন রাঁধুনির পক্ষে, শুধু রাঁধুনি নয়, কোনো মানুষের পক্ষেই সূর্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমি বললাম—জেনে রাখো দীপক যে সূর্য যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের মতো মানুষের

চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বদ্রষ্টা!'

'অসীম আগ্রহে মুগ্ধ শিশুর মতন শুনল সে। শুধু শুনলই না, আমার প্রত্যেকটি কথা মনে গেঁথে নিল। ধীরে ধীরে সেইদিনই আমি সৃষ্টির রহস্য থেকে শুরু করে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির প্রাথমিক জ্ঞান জানাবার চেষ্টা করলাম উৎসুক মেধাবী ছাত্রকে।'

'অন্ধ-মূক-বধির ছাত্রকে শিক্ষা দেবার জন্য যে দীর্ঘ প্রস্তুতি, সন্তর্পণ পদক্ষেপ এবং সাগ্রহ সাধনার প্রয়োজন বর্ণনা দিয়ে তা বোঝানো সম্ভব নয়। দু'চারটে বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে আমি তার আংশিক আভাস দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র। ক্রমশঃ পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে দীপকের ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হলো, প্রসারিত এবং পুষ্ট হলো তার ভাবধারা। বাইবেল পড়ার পর একদিন নিজেই সে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, যীশুকে যারা হত্যা করেছিল সেইসব দুষ্টু লোকের দলে কি আমার বাবাও ছিলেন? প্রশ্নটা শুনে দুটো জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হলো। প্রথম তার সময়ের ধারণা এখনও স্পষ্ট হয়নি এবং বাবার চিন্তা তার মনের অনেকখানি জুড়ে আছে। কালপ্রবাহে মাস, বছর, যুগ-যুগান্ত বিশ্লেষণ করে যীশুর সময় আর বর্তমান সময়ের ব্যবধান বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম তার বাবার প্রসঙ্গে। মানুষের জীবন, বংশ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির ভূমিকা বুঝিয়ে পাড়লাম তার বাবা ও মা-র কথা। তারও যে একজন মা আছেন, তিনি যে তাকে স্নেহ করেন এ সব সে প্রথম মানতেই চাইলো না। তার সেই এক প্রশ্ন—মা যদি আমাকে এতই স্নেহ করেন তো প্রায়ই আমায় দেখতে আসেন না কেন? সযত্নে বোঝালাম মায়ের পক্ষে প্রায়ই আসার বাধা। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করলো যে এরপর মায়ের জন্য সে প্রত্যহ প্রার্থনা করবে এবং মা-কে অন্তর দিয়ে ভালোবাসার চেষ্টা করবে। বুঝলাম তার মা যে শীঘ্র তাকে দেখতে আসবেন এই আশ্বাস আমার কাছে পেয়ে সে আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হয়েছে। তার আসার এক বছর পরে মা প্রথম এলেন ছেলেকে দেখতে। আমার আশা ছিল যে মা আর ছেলের এই মিলনের ফল বিশেষ শুভ হবে। আমার এই আশা কিন্তু সফল হয়নি।'

'আসামীর মা এ সম্বন্ধে সবকিছু আদালতকে আগেই জানিয়েছেন,' মন্তব্য করলেন বিচারপতি।

মন্তব্যটা শুনে বিস্মিত হলেন ফাদার লরেন্স। একবার মাথা নাড়লেন, যেন নিজের মনের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করে নিলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'মা নিশ্চয় এটুকু বলেননি যে ছেলে তাঁর সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তার অবস্থায় যতটুকু করা সম্ভব ছিল ঠিক ততটুকুই করেছিল সে।'

'ঘটনার বিবরণ আদালতের জানা দরকার।'

'বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই নিশ্চয়ই; তাই সংক্ষেপে বলছি আমি। মায়ের সামনে থেকে পালিয়ে দীপক তার দোতলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাকে তার খোঁজে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে উন্মাদের মতন লাফিয়ে উঠে

সামনের খোলা জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিল বাইরের মাঠে। সৌভাগ্যক্রমে ঘরের ঠিক নীচেই ছিল একটা খড়ের গাদা। তার ওপর পড়ে সে-যাত্রা বেঁচে গেল দীপক। দিন দু'য়েক বাদে সুযোগ বুঝে তার এই আচরণের কারণ জানতে চাইলাম আমি। একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল—মনে হলো আপনি আমাকে আবার মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। স্থির করলাম যে মরতে হয় সেও ভালো তবু যেখানে স্নেহ বলে কিছু নেই সেখানে ফিরে যাবো না। আপনি বলেছিলেন উনি আমার মা, কত ভালোবাসেন উনি আমায়। সব মিথ্যে, নিছক মিথ্যে! আমার ঘ্রাণ শক্তিতে ধরা পড়েছে ওঁর পরিচয়। কলকাতার বাড়ীতে উনি ছিলেন। কোনোদিন একটুও ভালোবাসেননি সেখানে, এখনো আমার প্রতি ভালোবাসা বলে কিছু নেই ওঁর অন্তরে। কলকাতায় এক রুবি ছাড়া কেউ আমায় ভালোবাসতো না।

'তার এই কথা শুনে প্রথমটা আমি চিন্তিত হলাম। তারপর মনে হলো যে বয়স ও জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর এই ধারণা বদলে যাবে। সময়ের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমার গত্যন্তরও ছিল না। তবুও আমি হাল ছাড়লাম না। সুযোগ পেলেই তাকে বোঝাতাম। ফলে পরের বছর যখন মা আবার এলেন তখন সে কোনো চঞ্চলতা বা বিরক্তি প্রকাশ করলো না। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মা ও ছেলের এই দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর আমি একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। নিঃসন্দেহ হলাম যে মা বা অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনকেই স্নেহের চক্ষে দেখা দীপকের পক্ষে সম্ভব নয়। দীপকের মতন বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ছেলের এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম...... ।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে বিদ্রূপমাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় পেয়েছিলাম......কলকাতা থেকে যখন দীপককে নিয়ে আসি তখন লক্ষ্য করেছিলাম যে তার রামপুরহাটে শিক্ষার ব্যবস্থায় সকলেই এমন কি তার মা পর্যন্ত যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। পঙ্গু এক শিশু সম্বন্ধে প্রিয়জনের এই মনোভাবে ব্যথা পেয়েছিলাম এবং তখনই বুঝেছিলাম যে রামপুরহাটে আমার নতুন ছাত্রকে কত স্নেহ এবং যত্নে লালন-পালন করতে হবে ; কত সন্তর্পণে তার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

'দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর আমি স্থিরনিশ্চয় হলাম যে মা এবং ছেলের এই মিলনের সুযোগ ভবিষ্যতে যত কম হয় ততই মঙ্গল। আমি কি ভুল করেছিলাম ? না, একেবারেই ভুল করিনি! আজও আমার দৃঢ় ধারণা যে দীপকের শিক্ষার সুষ্ঠু অগ্রগতির জন্য ওই সিদ্ধান্ত ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জোর করে মায়ের প্রতি তার মন ফেরাবার চেষ্টায় বিপরীত ফল হবার সম্ভাবনা ছিল। তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ এই কিশোরের মন হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার প্রতি এবং মিশন ও সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে বসতো। ফলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতো তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।'

'অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে তার ব্যবহার কি রকম ছিল ?'

'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মিষ্ট স্বভাব এবং তীব্র জ্ঞানস্পৃহার জন্যে সব ছাত্রেরই সে প্রিয় ছিল।'

'এদের মধ্যে একজন, সুবীর সরকারের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাই না ?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল।

'হ্যাঁ, হয়েছিল। অন্ধ এই ছাত্রটিকে আমি ইচ্ছে করেই দীপকের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। ফল ভালোই হয়েছিল, কালক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল দু'জনের মধ্যে।'

'কিন্তু মিস বসাক রামপুরহাটে আসার পর ?' বাঁকা সুরে মন্তব্য করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল।

'তখন দীপকের দেখাশোনার ভার আমি রুবির হাতেই তুলে দিয়েছিলাম। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল দীপক। এই প্রস্তুতির প্রথম পর্বে রুবির সাহায্য প্রয়োজন তো ছিলই, তাছাড়া বিশেষভাবে ভবিষ্যতের উচ্চতর পরীক্ষার কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা করেছিলাম। ছাত্র হিসাবে খুব ভালো ছিল সুবীর, দীপকের প্রতি তার বন্ধুত্বও ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু একটা ভুল করেছিল সে। দীপককে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে রাখতে চেয়েছিল। ফলে রুবি ভার গ্রহণ করায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে সে। আমি জানতে পেরে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলাম। তার পক্ষে দীর্ঘকাল দীপকের দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না কারণ ছ'মাস বাদেই চাকরী নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া তার স্থির হয়েই ছিল। সুতরাং তার স্থান রুবি নেওয়ায় তার পক্ষে বিক্ষুব্ধ হবার কিছুই ছিল না। সে যে সত্যিই বিক্ষুব্ধ হয়নি তার প্রমাণ পেয়েছিলাম দীপকের সঙ্গে রুবির বিবাহ-বাসরে। সুদূর বম্বে থেকে এসে বিবাহে যোগ দিয়েছিল। তার গানে-বাজনায়, উল্লাসে মুখরিত হয়েছিল এই উৎসব।'

তারপর শোনা গেল অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্ন, 'মিসেস বসাক এবং তাঁর মেয়েকে রামপুরহাটে নিয়ে যাওয়ার পেছনে প্রকৃত কি উদ্দেশ্যে ছিল আপনার ?

'প্রয়োজন, শুধুই প্রয়োজন—তাছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। দীপকের শিক্ষা একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই ক্ষণস্তব্ধ অবস্থা থেকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল মহত্তর, গভীরতর কোনো প্রেরণা। অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল এই ছেলেটির অন্তর যে ভালোবাসা দেবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে কাঁদছে এ আমার অজানা ছিল না। নিঃস্বার্থ স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে এই ছেলেটিকে কে অনুপ্রাণিত করবে, কে তার প্রাণে আবার দ্বিগুণ তেজে জাগিয়ে তুলবে পরিপূর্ণ মানুষ হবার বাসনা ? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই আমার চোখে ভেসে উঠলো কলকাতায় দেখা ছোট্ট মেয়ে রুবির ছবি। বিধাতার এক অনির্দেশ্য বিধানে কাছে এসেছিল দুটি পবিত্র অন্তর। রুবিরই আঙুলের স্পর্শে প্রথম জেগেছিল দীপকের সুপ্ত সত্তা! তাহলে রুবিকে দীপকের পাশে আবার এনে দেওয়ায় বাধা কোথায় ?

রুবিকে অবলম্বন করে দীপক পূর্ণ হবে এই হয়তো ঈশ্বরের নির্দেশ! শিক্ষায়তনের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ সেনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনিও আমার সঙ্গে একমত হলেন। যেহেতু পূর্ববর্তী চোদ্দ জন অন্ধ-মূক-বধির ছাত্র নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে অতএব দীপকও তাই করবে—এই যুক্তি মনে ধরলো না আমার। মানসিক গঠনের দিক দিয়ে অন্যদের সঙ্গে অনেক পার্থক্য দীপকের। প্রতিভাবান সে, দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতার মাঝে এই প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশই হয়তো বিধাতার অভিপ্রেত। এই দৈব-নির্দেশ ও বাস্তব-বিবেচনার সূত্র ধরেই আমি অগ্রসর হয়েছিলাম।

'অগ্রসর হবার আরো অনেক কারণও ছিল। দীপক আসার পর থেকেই রুবি নিয়মিত চিঠি লিখত তার কাছে। দীপকের তখন পড়বার বা উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তাই আমিই তার হয়ে উত্তর দিয়ে চিঠিগুলো আমার ড্রয়ারে যত্ন করে রেখে দিতাম। ক্রমশঃ দীপকের শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমি চিঠিগুলো 'ব্রেল' পদ্ধতিতে অনুবাদ করে তাকে পড়তে দিতাম। পড়তে পড়তে তার মুগ্ধ ও অভিভূত হওয়া আমার চোখ এড়াত না।

'রুবির সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর মা। পরে এ ব্যাপারে আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। বুদ্ধিমতী এই মেয়েটি সুশিক্ষা পেয়ে নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হোক এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কলকাতার এক বিখ্যাত মিশন স্কুলে পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে তার সম্বন্ধে খোঁজ পেতাম আমি। কিন্তু দীপকের জীবনের সঙ্গে তার জীবন জোর করে জড়িয়ে দেবার কোনো কল্পনাই এই সবের পেছনে ছিল না। আমরাও ভাবিনি, সেও ভাবেনি। দু'জনের বয়স হোক, শেষ হোক দু'জনের শিক্ষা, তারপর বিধাতার যা বিধান তাই হবে। যদি দু'জনের মিলন সম্ভব হয় তা হলে ভালোই হবে। রুবির বয়স বেশী জেনে আমি খুশী হয়েছিলাম। দীপকের জীবনে যদি কোনো নারী আসে, তাকে একাধারে মায়ের মমতা ও প্রিয়ার প্রেম দিয়ে পূর্ণ করতে হবে এই পঙ্গু মানব-সত্তাকে।

'শিক্ষার অগ্রগতি শুধু দীপকেরই হতে লাগলো না। রুবির শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় ছিল তার পরবর্তী মধুর চিঠিগুলোর প্রতিটি লাইনে। 'ব্রেল' পদ্ধতিতে অনুবাদিত এইসব চিঠি পড়তে পড়তে দীপকের কাছেও এই মেয়েটির স্নেহমধুর অন্তর গোপন থাকেনি। যার কাছ থেকে একদিন বাবলুকে পেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল সে, সেই বাল্যের সঙ্গিনী নতুন রূপে রসে, মণ্ডিত হয়ে অধিকার করছিল তার মন। ক্রমান্বয়ে সে আমাকে প্রশ্ন করতো—কবে দেখা হবে রুবির সঙ্গে। এই সময় মিসেস দত্তর বাড়ীতে রুবির মার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। আমার তখন সুবীরের জায়গায় দীপকের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন উপযুক্ত সঙ্গীর। রুবির বয়স তখন কুড়ি; কলেজের পড়াও তার শেষ হয়েছিল। তাই আমি রুবি এবং তার মা-কে নিয়ে এলাম রামপুরহাটে।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার ধারণায় তিন প্রধান ইন্দ্রিয়হীন এক

যুবকের পক্ষে মিস দত্তই ছিলেন আদর্শ সঙ্গিনী ?'

'আরো ভালো কিছু আমার অন্তত জানা ছিল না। আর ছিল না বলছি কেন! আজও দীপকের পক্ষে রুবির চেয়ে উপযুক্ত কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না।'

অ্যাডভোকেট জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সাক্ষী এই কথা বলছেন বটে কিন্তু খুনের পর থেকে স্ত্রীর প্রতি আসামীর ব্যবহার বিচার করলে উল্টোটাই মনে হয়; মনে হবে যে স্ত্রীর প্রতি তার আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাসের প্রতিবাদ শোনা গেল, 'এই বক্তব্যের স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ যখন নেই তখন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যে পরিপূর্ণ প্রেম ও বিশ্বাস বর্তমান ফরিয়াদী পক্ষের এইটাই ভাবা উচিত, অন্য কিছু কল্পনা করা অন্যায়।'

সারা ঘরে গম্ গম্ করে উঠলো নগেন সোমের তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর, 'আসামী পক্ষ তাহলে আসামীর জেলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হওয়ার কারণটা জানাবেন কি?'

'আসামী কারুর সঙ্গেই দেখা করেনি—না তার স্ত্রীর সঙ্গে, না বা তার মা'র সঙ্গে। এই অস্বীকৃতি তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বেরই প্রমাণ।'

বিচারপতি টেবিল ঠুকে বাধা দিলেন এই বাদানুবাদে। সাক্ষীর পানে ফিরে বললেন, 'এইবার আসামীর বিয়ের ঘটনাটা বিবৃত করুন।'

ফাদার লরেন্স শুরু করলেন ঃ

'রুবির সাহায্যে ও সাহচর্যে বি. এ. পরীক্ষায় অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলো দীপক। তারপর বই লেখার ব্যাপারে মত্ত হলো সে। এখানেও আশ্চর্য নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে তার প্রতিটি অভাব-অভিযোগ মেটালো রুবি। এমন হলো যে রুবি পাশে না থাকলে দীপক অসহায় হয়ে পড়তো। ইংরাজীতে 'নির্বাসিত আত্মা' বার হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল ইংলণ্ডে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায়। বইয়ের বাংলা অনুবাদ বার হবার পর দেশেও সে সে বিখ্যাত হলো। বাইরনের চেয়ে কম আকস্মিক নয় তার এই খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করা। ইংলণ্ড থেকে অবিলম্বে নিমন্ত্রণ এলো বক্তৃতা দেবার। আমি তার সঙ্গে এই বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারলে কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু রামপুরহাটের কাজ ছেড়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ এও আমি বুঝেছিলাম যে দীপককে কেন্দ্র করে আমার এই অন্ধ-কালা-বোবাকে শিক্ষা দেবার সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি শুধু বিশ্বে স্বীকৃতি পাবে তাই নয়, ওর মারফত এই প্রচারের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুন মর্যাদা পাবে আমাদের ক্ষুদ্র শিক্ষায়তন; হয়তো প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এইসব দেশ থেকে পেয়ে আমাদের পরিকল্পনার পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হবে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগও এই আমন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিল। সরকার দীপকের এই ভ্রমণের ব্যাপারে সব রকম সাহায্য করতে

প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থায় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না আরো এইজন্যে যে দীপক নিজে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সমস্যা অবশ্য তারও ছিল, রুবিকে ছেড়ে যাবার সমস্যা। নিজেই সে এই সমস্যার সমাধান করে ফেললে। একদিন সরাসরি আমাকে এসে জানাল যে সে রুবিকে বিয়ে করতে চায়। আমি তাকে খুব ভালো করে আবার ভেবে দেখতে বললাম। সে দৃঢ়ভাবে বলল যে ভাববার আর তার কিছুই নেই। দীর্ঘ পাঁচ বছর রুবির পাশে থাকতে থাকতে দিনে রাতে সর্বক্ষণ অনেক ভেবেছে এবং বার বার ওই একই সিদ্ধান্তে পেঁছেছে। আমি তখন রুবির সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হলাম।'

'মিস বসাক কি বললেন আপনাকে?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

'প্রস্তাব শুনে সে খুবই উল্লসিত হলো, তবে একেবারে দ্বিধামুক্ত হয়ে নয়। আমি তার এই দ্বিধার ভাব দূর করার জন্যে মনে করিয়ে দিলাম বাল্যের স্মৃতি; যেদিন তারা পরস্পরের কাছে এসেছিল, পরস্পরকে ভালোবেসেছিল।

'তিন মাস বাদে রামপুরহাটে শিক্ষায়তনের গির্জায় দীপকের সঙ্গে রুবির বিয়ে হলো। শিক্ষায়তনের ইতিহাসে অন্ধ-মূক-বধির ছাত্রের প্রথম বিয়ে। অপূর্ব উৎসাহ ও আনন্দের মধ্যে সমাধা হলো এই উৎসব। সেইদিন আমার বার বার মনে পড়েছিল বারো বছর আগের সেই বালক দীপকের কথা, যাকে আর যাই বলা যাক্ মানুষ বলা যেতো না! সেই দীপক আর বিবাহোৎসবের তরুণ দীপকের মধ্যে কত পার্থক্য! দীর্ঘ সমুন্নত দেহে, দীপ্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে দীপক, পাশে তার বধূ—যে তাকে প্রেমে পরিচর্যায় দিনের পর দিন নিয়ে যাবে পূর্ণতার পথে, অমৃতের অন্বেষণে।'

'নবদম্পতি কি তার পরই শিক্ষায়তন ছেড়ে চলে যায়?'

'হ্যাঁ, সেই রাত্রেই তারা পুরী যায় মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে।'

'তারপর কতবার এই দম্পতির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'মাত্র একবার—ইংলণ্ড যাবার আগে তারা রামপুরহাট এসেছিল সকলের সঙ্গে দেখা করতে।'

'তখন কি দু'জনকেই পরিপূর্ণ সুখী মনে হয়েছিল আপনার?'

ফাদার লরেন্সের প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বিপ্রদাস। তার মনে হলো এই প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন একটু থেমে গেলেন বৃদ্ধ ফাদার। তারপর চকিতে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন:

'হ্যাঁ ....মানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোনো কোনো ব্যাপারে কিছু অসুবিধার আভাস রুবি অবশ্য আমায় দিয়েছিল। আমি তাকে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিয়েছিলাম এবং এও মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে প্রচেষ্টা ও প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়েই আসবে তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মিলনের আনন্দ। মাস-খানেক পরেই লণ্ডন থেকে চিঠি এল রুবির—বেশ বড় চিঠি। এই চিঠি পড়ার পর সে যে সম্পূর্ণ সুখী হয়েছে এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না।'

'সেই চিঠি কি আপনার কাছে আছে?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল নগেন সোম।

'হ্যাঁ, রামপুরহাটে আছে।'

'আপনি আপনার ছাত্রকে পাঁচ বছর পরে আজ প্রথম দেখলেন, তাই না?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এইবার আর একবার ভাল করে দেখুন আপনার ছাত্রকে এবং বলুন যে পাঁচ বছর পরে তার মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন কি না।'

বৃদ্ধ ফাদার ঘুরে দাঁড়ালেন। মনে হলো একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিচারপতির আদেশ পালন করছেন তিনি। কাঠগড়ায় দুই প্রহরীর মাঝে বসেছিল আসামী। ধীরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করার পর ফাদার ফিরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, বহু পরিবর্তন হয়েছে দীপকের।'

আদালত ঘরে ততক্ষণে ঘনিয়ে উঠেছে এক বিস্ময়কর স্তব্ধতার আবহাওয়া। তারই মাঝে শোনা গেল বিচারপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

মুখে উত্তর দিলেন না ফাদার লরেন্স। সাক্ষীর নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে ধীরপদে এগিয়ে গেলেন আসামীর দিকে। আসামীর প্রসারিত হাতে সংকেত লিপিবন্ধ করে চলেছিল দোভাষী। দোভাষীর পাশে দাঁড়িয়ে, বিচারপতির দিকে ফিরে বললেন ফাদার, 'আমি আমার ছাত্রকে নিজে একটা প্রশ্ন করবার অনুমতি চাই।'

'প্রশ্নটা আগে আদালতকে জানান।'

'আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ দীপক, আমাকে বল যে কেন তুমি নিজের পক্ষ সমর্থন করতে রাজী নও।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

ফাদার লরেন্স তাঁর দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল রাখলেন আসামীর প্রসারিত হাতে। আসামীর দেহে ক্ষীণ কম্পনের রেশ জেগেই মিলিয়ে গেল।

'কিছু উত্তর পেলেন?' প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

'না, দীপক কাঁদছে' বিষাদক্লিষ্ট স্বরে শুধু এই ক'টি কথা বলে মাথা নীচু করে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন বৃদ্ধ।

বিস্মিত চোখ মেলে ঘর ভর্তি লোক দেখলো ঠিক যেন যাদুস্পর্শে খসে পড়েছে আসামীর মুখের মুখোশ। পুঞ্জীভূত বেদনার তাড়নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার কপালের শিরা, কাঁপছে তার চোখের পাতা। দেখতে দেখতে বন্ধ চোখের কোল বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা।

বৃদ্ধ সাক্ষীর দিকে ফিরে বিচারপতি বললেন, 'আপনি দরকার বুঝলে আরও কিছু প্রশ্ন আসামীকে করতে পারেন।' আগ্রহের রেশ ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। অন্য সকলের মতো তিনিও বোধ হয় ভাবছিলেন যে হয় তো এই

বৃদ্ধ শিক্ষকের পক্ষেই ছাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করা সম্ভব হবে।

হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন ফাদার, 'কোনো ফল হবে না। কিছুতেই কথা বলবে না দীপক। ওকে আমি ভালোভাবে জানি। এটা ও একগুঁয়েমি বা ঔদ্ধত্যের বশে করছে তা নয়। কিছু ও গোপন করতে চায় এবং কারুর সাধ্য নেই সেই কথা ওর মন থেকে টেনে বার করবার।'

নগেন সোম দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মনে হয় যে আসামী দোষী?'

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন ফাদার লরেন্স। অস্বস্তির আবহাওয়া থম্‌থম্‌ করতে লাগলো ঘরটায়। চকিতে দাঁড়িয়ে উঠে বিপ্রদাস বলল, 'সাক্ষী যে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন না এটা অপর পক্ষের বোঝা উচিত ছিল। প্রিয় ছাত্রের এই অদ্ভুত মনোভাবে, দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে সাক্ষীর পক্ষে সামান্য বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।'

'শিক্ষক বলেই তো ছাত্রের এই অদ্ভুত নিশ্চেষ্ট মনোভাবের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব।' নগেন সোম বেশ জোরালো গলায় পেশ করলেন তাঁর বক্তব্য।

বিপ্রদাসকে আর উত্তর দিতে হলো না। এই প্রথম বেশ দৃঢ় এবং দীপ্ত স্বরে বললেন ফাদার লরেন্স, 'আমার বিশ্বাস অন্যের দোষ স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে দীপক। প্রকৃত অপরাধী যে কে তা ও জানে কিন্তু বলবে না। কারণ আমার মনে হয় যে, যে-কোনো কারণেই হোক সেই প্রকৃত অপরাধীকে রক্ষা করবার ব্রত গ্রহণ করেছে ও। এইবার আর একটা প্রশ্ন আমি ওকে করবো, যদিও জানি যে উত্তর ও কিছুতেই দেবে না।'

আবার এগিয়ে গিয়ে আসামীর প্রসারিত হাতে সংকেত-লিপি আঁকতে আঁকতে তিনি মুখে বলে চললেন ঃ

'দীপক! .... উত্তর দাও, উত্তর তোমাকে দিতেই হবে! কে, কে খুন করেছে মিঃ বিচামকে? আমি জানি তুমি ইচ্ছে করলেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। দীপক, শুনছো! আমি জানি খুন তুমি করোনি, তুমি করতে পারো না। তোমাকে নিজের হাতে গড়েছি আমি, তোমাকে আমার মতন ভালো করে আর কে জানে! কেন তুমি প্রকৃত খুনীর নাম প্রকাশ করছো না...? সে কি তোমার কোনো প্রিয়জন? তাকে কি তুমি ভালোবাস? যদি তাই হয় তবুও আমার কাছে তার নাম তোমার প্রকাশ করা উচিত। সত্য প্রকাশে ভীত হওয়া তোমার উচিত নয়। এ তোমার কর্তব্য ঃ অন্যের দোষের শাস্তি গ্রহণ করবার কোনো অধিকার তোমার নেই। এখনও চুপ করে আছো কেন? তবে কি তুমি ভয় পেয়েছো? কিসের ভয়, কাকে ভয় তোমার? দীপক, আমার এই একান্ত অনুরোধ তুমি রাখলে না...তুমি যদি জানতে কত ব্যথা আমি পেলাম তোমার অদ্ভুত ব্যবহারে।'

নৈরাশ্যের বোঝা বয়ে ক্লান্তপদে বৃদ্ধ ফিরে চললেন নিজের জায়গায়। যাবার পথে তাঁকে বার বার বলতে শোনা গেল, 'দীপক খুন করেনি। দীপক

খুন করতে পারে না। প্রকৃত খুনীকে খুঁজে বার করবার ব্যবস্থা করা উচিত।'

সাক্ষীর অস্ফুট কথা ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ল নগেন সোমের তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর, 'সাক্ষীর বয়স এবং অভিজ্ঞতার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আসামী শুধু জবানবন্দী দিয়ে নয়, নিজের আঙুলের ছাপ দিয়ে তার দোষের স্বীকৃতি সাক্ষর করে রেখেছে।'

নগেন সোমের পানে বিশ্বাসদীপ্ত চোখ মেলে চাইলেন ফাদার। তারপর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'যত প্রমাণই থাক্ তবু আমি বিশ্বাস করি না যে দীপক খুন করেছে।'

বিচারপতি এইবার সাক্ষীকে বললেন, 'আপনি নিজেই বলেছেন যে আসামীকে আপনার চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ জানে না। সে ক্ষেত্রে আপনি কি আপনার অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন যে আসামী নির্দোষ?'

'হ্যাঁ বিশ্বাস করি,' বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন ফাদার।

'তাহলে প্রকৃত দোষী কে?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।'

'আপনার কি বিশ্বাস যে তার এই নিশ্ছিদ্র নীরবতা সত্ত্বেও আসামীর মানসিক সুস্থতায় সন্দেহ করবার কিছুই নেই?'

'না কিছুই নেই। কিছু গোপন করবার জন্যই ও স্বেচ্ছায় এই নীরবতা গ্রহণ করেছে।'

'আপনার কি বিশ্বাস যে আসামীর বুদ্ধি ও মনীষা অত্যন্ত উঁচুস্তরের?'

'সর্বোচ্চস্তরের বলতেও আপত্তি নেই।'

'অতএব ধরে নেওয়া যায় যে ও যা কিছু করেছে বা করছে সবই সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনার ফল। যাই হোক্ এখন বলুন আসামীর বই 'নির্বাসিত আত্মা' সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

'প্রত্যেক প্রকৃত সাহিত্যরসিক পাঠকের যা আমারও তাই,' খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন ফাদার।

'সম্পূর্ণ লেখাটা কি আসামীর নিজের না অন্যের সাহায্য আছে?'

'সম্পূর্ণ নিজের। ও 'ব্রেল' পদ্ধতিতে লিখেছিল আর আমি তারই আক্ষরিক বাদান্তর করেছিলাম ইংরেজীতে।'

'আপনার কি বিশ্বাস যে এই উপন্যাসে লেখক তাঁর অন্তরের অনুভূতিকেই রূপায়িত করেছেন?'

'তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই···আর সেই জন্যেই আমি শুধু ভাবছি যে যার লেখা এক উচ্চ আদর্শের আলোয় উজ্জ্বল, যার উপন্যাসের প্রতিটি ছত্র জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমতায় মুখর—সে কেমন করে অন্যের জীবন হানি করবে।'

শোনা গেল নগেন সোমের মন্তব্য, 'উচ্চ আদর্শের কথা অবশ্য সাক্ষী বলেছেন কিন্তু উপন্যাসের নিজের আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ ঠিক উল্টোটাই প্রমাণ করে।'

'উপন্যাসের কিছু কিছু অংশ আমিও সমর্থন করিনি। কিন্তু দীপককে কিছু পরিবর্তনে রাজী করানো সম্ভব হয়নি। আমি বার বার বলতে সে আমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল আমি যা ভাবি এবং বিশ্বাস করি শুধু তাই লিখেছি—এর একটা কথাও বদলালে আমার নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

সাক্ষ্য সমাপ্তির ঘোষণা করলেন বিচারপতি। ক্লান্ত দেহ বয়ে নতমস্তকে বার হয়ে গেলেন ফাদার লরেন্স। সকলেই অভিভূত হয়েছিল এই শান্ত সমাহিত বৃদ্ধের প্রতিটি কথায়। অতসীও হয়েছিল, সেই ব্রতী বৃদ্ধ শিক্ষকের জবানবন্দীতে আসামীর এক নতুন রূপ দেখতে পেয়েছিল সে। রহস্যের কুয়াশা ভেদ করে যেন হঠাৎ ধরা দিয়েছিল পরিচিত এক মানুষের পরিচয়। ব্যথায় কাঁপছে আসামীর কপালের স্ফীত শিরা, ভাবলেশহীন মুখে তার ছড়িয়ে পড়েছে বেদনার ম্লান ছায়া, চোখের কোল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। অন্তরের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা গলে ঝরে পড়ছে চোখের কোণ বেয়ে। ওই অশ্রুর আয়নায় অতসী দেখতে পেয়েছে আসামীর অন্তর, চিনতে পেরেছে প্রতিবন্ধীত্বের আড়ালে একটি পরিপূর্ণ মানুষকে। ক্ষণিকের জন্য দীপকের অশ্রুসিক্ত বেদনামলিন মুখ তার সুন্দর মনে হয়েছিল। হয়তো ভাবাতিশয্যের ফল? কিন্তু সেই ক্ষণিকের অভিজ্ঞতা একেবারে মিথ্যা না হতেও পারে।

কিন্তু সত্য হলেও আর হয়তো সেই মানুষটিকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। চকিতে মুখোশের আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে দীপক। কাঠগড়ার দিকে ফিরে তাকালো অতসী। তবে কি তার ভুলই হয়েছে, সকলেরই ভুল হয়েছে। খুব সম্ভব স্বপ্ন দেখছিল সে! না—অতবড় ভুল সম্ভব নয়·· কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পশু কি কাঁদে?

পরের সাক্ষী কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, কখন প্রাথমিক প্রশ্নাদির পর শুরু করেছেন তাঁর জবানবন্দী—এ-সব কিছুই অতসীর খেয়াল ছিল না। সম্বিত ফিরতে সচকিত হয়ে দেখলো ডাঃ বিজয় সেন পেশ করছেন তাঁর বক্তব্য:

'হ্যাঁ, চিকিৎসক-পরিদর্শক হিসাবে রামপুরহাটের শিক্ষায়তনে আমায় মাসে দু'বার করে যেতে হয়। এইরকম এক পরিদর্শনের সময়েই দীপককে প্রথম দেখেছিলাম, যতদূর মনে পড়ে ও সেখানে যাবার দিন দু'য়েক পরেই। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর ও যে এক স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান কিশোর এই মতই লিপিবদ্ধ করেছিলাম আমি। চমৎকার স্বাস্থ্য ওর। কখনো বিশেষ অসুখ-বিসুখ করেছিল বলে আমার মনে পড়ে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে এবং সুগঠনে খুশী হয়েছিলাম। ফাদার লরেন্সের শিক্ষার সাফল্যে ওর এই স্বাস্থ্যই যে অন্যতম সহায়ক এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আসামীর শিক্ষার ব্যাপারে ফাদার লরেন্স সফল হয়েছেন এই কি সাক্ষী বলতে চান?' শোনা গেল নগেন সোমের বিদ্রূপ মিশ্রিত প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। এবং যা বলছি তা একজন বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক হিসাবেই বলছি এ-ও মনে করিয়ে দিতে চাই। তিন প্রধান ইন্দ্রিয়হীন এক

কিশোরকে তার অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এক বুদ্ধিমান, শিক্ষিত রুচিবান তরুণে পরিণত করা ফাদার লরেন্সের শিক্ষা-পদ্ধতির চরমোৎকর্ষের প্রমাণ বলা যায়। আমি বিশ্বাস করি যে ধর্মকে বাদ দিয়েও মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার বাধা নেই। আর ঠিক এই কথাই দীপকের সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম ফাদার লরেন্সকে। দীপকের বুদ্ধির প্রশংসা করছিলেন ফাদার লরেন্স। আমি বলেছিলাম এমন ছেলের মস্তিষ্ক বাইবেলের উপদেশ ঠেসে না দিয়ে, উচ্চশিক্ষা দেবার চেষ্টা করা উচিত। ফাদার লরেন্স একটু হেসে বলেছিলেন যে আমি যদি ওর দেহের ভার নিই, তাহলে মনের সম্পূর্ণ ভার উনি নিতে প্রস্তুত আছেন। দু'জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় দীপক মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আজ এই অবস্থায় দাঁড়িয়েও বিনা দ্বিধায় আমি বলছি যে আমার এবং ফাদার লরেন্সের আশা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল।'

অর্থাৎ যে শিক্ষার গুণে এবং পরিবেশের প্রভাবে তাঁদেরই ছাত্র আজ খুনের অপরাধে ধৃত, ফাদার লরেন্সের সঙ্গে সেই শিক্ষা ও পরিবেশের দায়িত্ব সাক্ষী ভাগাভাগি করে নিতে চান তাই নয় কি?' নগেন সোম ছুঁড়লেন তাঁর মন্তব্যের তীক্ষ্ন তীর।

বক্তার দিকে একবার তাকিয়ে সাক্ষী দৃঢ়ভাবে বললেন, 'ফাদার লরেন্সের মতন মহৎ ব্যক্তিকে তাঁর সেবাব্রতে, অসহায় এবং অনাথদের মানুষ করার ব্যাপারে দীর্ঘকাল সাহায্য করবার সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। দীপকের বিরুদ্ধে বর্তমান অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তা আমার জানা নেই। কিন্তু অভিযোগের সঙ্গে তার রামপুরহাটে শিক্ষার কোনো সম্বন্ধ আছে, এর চেয়ে মূর্খ মন্তব্য আমি কল্পনাই করতে পারি না। ফাদার লরেন্সের সেবাব্রতের তুলনা নেই। এই সব অনাথ আতুর, অসহায় শিশুদের রক্ষা ও শিক্ষার ভার নিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠান সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে চলেছে। অন্যথায় এইসব শিশুরাই কালক্রমে সমাজের সমস্যা ও বোঝা হয়ে দাঁড়াতো। এমন একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি সারা দেশের শ্রদ্ধান্বিত হওয়া উচিত। দেশের এবং বিদেশের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার। এইটুকু আমি বলতে পারি যে রামপুরহাটের শিক্ষায়তনে নৈতিক এবং অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বোত্তম এবং সবদিক দিয়ে সফল।

ঈষৎ উত্তেজিত সাক্ষীকে বাধা দিয়ে বিচারপতি বললেন, 'ফাদার লরেন্স এবং তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি আমরা সকলেই শ্রদ্ধান্বিত। এখন আসামীর সম্বন্ধে আদালত আপনার কাছে কিছু জানতে চায়। রামপুরহাটে আসামীর দু'চারটে অদ্ভুত আচরণ, যেমন তার মায়ের সঙ্গে সেখানে প্রথম দেখা হওয়ার পর আত্মহত্যার চেষ্টা—এইগুলো সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসক হিসাবে আপনার অভিমত কি?'

'আত্মহত্যার ঘটনাটা ফাদার লরেন্সের মুখে শুনে আমিও কম বিস্মিত হইনি। দীপকের মতন শান্ত সুবোধ ছেলের এই আকস্মিক উগ্র, উন্মাদ ব্যবহার বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল আমাকে। ভেবে দেখলাম কলকাতায় এই

মহিলাটির প্রতি এক বিষম বিতৃষ্ণা বাসা বেঁধেছিল তার মনে। রামপুরহাটে ফাদার লরেন্স মা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ভাবপ্রবণ বালককে। হয়তো উৎসাহের আতিশয্যে একটা চড়া রঙে এঁকেছিলেন মায়ের রূপ। সেই রূপের ছাপ পড়েছিল ছেলের মনে, একেবারে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল। অসীম উৎসাহে স্বপ্নবিভোর ছেলে এগিয়ে গেল মহিলাটির কাছে, ফাদার লরেন্স বলে দিয়েছেন তিনিই তার মা। প্রথম সাক্ষাতেই ঘ্রাণশক্তি তাকে বলে দিল তার মা আর কেউ নয়, তার মা কলকাতার সেই মহিলা যাঁর প্রতি বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে আছে তার অন্তর। কল্পনা কুয়াশার মতন মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল তিল তিল করে গড়া রঙীন স্বপ্ন। এই মহিলা আর যেই হোক্, তিনি দীপকের মা নন, দীপকের মা তিনি কোনোদিন হতে পারবেন না। এই স্বপ্নভঙ্গের প্রতিক্রিয়াই রূপ নিয়েছিল আত্মহত্যার প্রচেষ্টায়।

'কথায় কথায় ফাদার লরেন্সও এই ধারণারই আভাস দিয়েছিলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, এই স্বপ্নভঙ্গের ফলে দীপক তাঁর ওপর বিশ্বাস না হারিয়ে বসে। যে-কোনো শিশুর মনে অবিশ্বাসের বীজ স্বভাবতই মারাত্মক, দীপকের পক্ষে তার ফল চিন্তার অতীত! অসহায় ফাদার এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে আমি বলেছিলাম যে এরপর মায়ের প্রতি দীপকের মন ফেরানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। অথচ স্নেহ ও সহানুভূতির কাঙ্গাল এই স্বপ্নালস সদাজাগ্রত শিশুর মন। সেই মনের অবলম্বন চাই, এমন একজন চাই যাকে সে সহজে সাগ্রহে ভালোবাসতে পারে। সেই সময়েই আমাদের মধ্যে মিস রুবি বসাকের কথা আলোচনা হয়। নারীর প্রেমের মাঝেই যদি একদিন তরুণ দীপকের পূর্ণতা আসে, তাতে বাধা দেবার কিছুই ছিল না। ফাদার লরেন্সও আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। এরপর দীপকের দৈহিক এবং মানসিক পুষ্টি সম্বন্ধে আমি বিশেষ যত্ন নিতে শুরু করেছিলাম।

'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে দীপকের মধ্যে যৌন-চেতনা অত্যন্ত প্রবল। নারী তার জীবনে একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় কামনার তাড়না শেষ পর্যন্ত সব পরিকল্পনা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে। দীপকের প্রতি রুবির আকর্ষণ সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল না। দীপকের মনের গোপন গভীরে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে যে এই তরুণীকে কেন্দ্র করে কামনার ক্ষীণ শিখা জ্বলছে না তাই বা কে বলতে পারে? কৈশোর এবং তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক কালাবোবা বা অন্ধ ছাত্রকেই যৌন-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানের সঙ্গে, জীবন-রহস্যের মূল প্রশ্নের সঙ্গে পরিচিত করা হয়। দীপকও সেই শিক্ষাটুকু পেয়েছিল। কিন্তু তার তিন প্রধান ইন্দ্রিয়ের অভাব আরো বেশী কিছু শেখবার পথে ছিল প্রধান অন্তরায়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে নর-নারীর মিলনের ক্ষেত্রে এই অল্পবিদ্যার বিষময় পরিণতি আমার অজানা ছিল না। দীপকের মতন পঙ্গুর পক্ষে তা অধিকতর মর্মান্তিক হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ ছিলাম আমি।'

'সজাগ ছিলাম বলেই বহু চিন্তা করেও মনস্থির করতে পারছিলাম না। ফুলের মতন শুচিশুভ্র মেয়ে রুবি, সে কি না এক অপটু, অনভিজ্ঞ তরুণের উদগ্র দৈহিক ক্ষুধার বলি হবে! শুধু কি তাই! প্রথম দৈহিক-মিলনের এই পাশবিক রূপ তার সুকুমার অন্তরে হানবে বজ্রের আঘাত। সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় স্বামীর প্রতি ঘৃণায় যদি সে মুখ ফিরিয়ে বসে! যদি সে অসীম ধৈর্যে সীমাহীন সহানুভূতি দিয়ে এই ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতার আঘাত জয় করতে না পারে! শেষে যদি দু'টি সম্ভাবনাময় জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়!

'কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না যে কি আমার করা উচিত। অত্যন্ত দুঃসাহসিক হলেও, বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি দীপককে বিয়ের আগে অন্য নারীসঙ্গের সুযোগ দেবার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু সে পথেও বাধা ছিল। বাধা নৈতিক বা ফাদার লরেন্সের আপত্তি নয়। কামনার শিখা একবার জ্বললে এক থেকে একাধিক নারীর সঙ্গসুখের মাঝে তা পর্যবসিত হবার আশঙ্কা ছিল। তাতেও রুবির প্রতি অন্যায় করা হতো। তার চেয়ে রুবিকে ঘিরে তার স্বপ্নকে রূপায়িত হবার সুযোগ দেওয়ায় অনেক সুবিধা ছিল। কর্মসহচরী একদিন প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে মর্মসহচরী যদি হয়ে ওঠে তো সেই ভালো। সময়ের হাতে সমস্যার সমাধান ছেড়ে দিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম আমরা।

'রামপুরহাটে রুবির সঙ্গে দীপকের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। বসেছিলাম আমরা—আমি, রুবি আর ফাদার লরেন্স। দীপক ঘরে এল। তরুণ দীপকের বিরাটাকৃতি দেখে রুবি ভয় পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার পরিচিত বালকের সঙ্গে তার সামনে দাঁড়ানো দীর্ঘাকার, সবল সুস্থ তরুণের কোনো মিল ছিল না। পাথরের মতন কঠিন হয়ে পাংশু মুখে বসেছিল রুবি। দীপক কিন্তু স্বচ্ছন্দ পায়ে এগিয়ে এল, যেন এক অলৌকিক রহস্য তাকে টেনে নিয়ে এল। রুবির সামনে দাঁড়িয়ে সে বারকয়েক জোরে নিশ্বাস নিলে। পরে আমার কাছে সে স্বীকার করেছিল যে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে নেমে এসেছিল এক পরম-লগ্ন। তার বাল্যের অতিপ্রিয় হারিয়ে যাওয়া রুবিকে সে ফিরে পেয়েছিল। বুক তার ভরে গিয়েছিল রুবির পারিজাতগন্ধী দেহ-সুবাসে যে সুবাস কলকাতার বাড়িতে বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার অন্ধকারে প্রতিদিন নিয়ে আসতো আদরের আশ্বাসের আলো, এবার তাই সে পালিয়ে গেল না। ধীরে ধীরে হাত দুটি বাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে রাখলো রুবির দুই গালে। রুবি তখনো বসেছিল নিস্পন্দ, রুদ্ধনিশ্বাস; হয়তো কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ দীপক দু'হাত দিয়ে অসীম আগ্রহে জড়িয়ে ধরলো রুবির দুই হাত। ফিরে পাওয়া সঙ্গিনীর পেলব হাতে মূর্ছনাহত বীণার তারের মতন কেঁপে উঠলো তার আঙুল, পুঞ্জীভূত আবেগ বিপুল বেগে সঞ্চারিত হলো সঙ্গিনীর অন্তরে।

'এই আনন্দমধুর মুহূর্তে কি যে দীপক বলেছিল রুবিকে তা আমি বা ফাদার লরেন্স কেউই জানি না। এরপর প্রায় পাঁচ বছর রুবি আর দীপক

পাশাপাশি ছিল। একজন তরুণীর এই নিরন্তর সাহচর্যে তরুণ দীপকের কিছু কিছু দৈহিক বৈকল্য ঘটা স্বাভাবিক। এমন কিছু হলেই সচেতন দীপক সোজা আমার কাছে তার কারণ জানতে চাইতো। সবকিছু নির্ভয়ে জেনে নেবার পরামর্শ আমিই দিয়েছিলাম। দীপকের মনের এই বিশেষ দিকটা গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমি। আমি জানতাম তার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি তরুণের যৌন-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হলে, কালক্রমে অতৃপ্ত কৌতূহল থেকে নানা মানসিক এবং দৈহিক বিকারের সূত্রপাত হতে পারে।

'চিকিৎসক এবং মনস্তাত্ত্বিক হলেও এই কৌতূহল নিবৃত্ত করার কাজ আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। দীপকের তিন প্রধান ইন্দ্রিয়ের অভাবই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। এ কথা আজ বলতে দ্বিধা নেই যে রুবির সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। নিঃসঙ্কোচে নিজের দেহ নিরাবরণ করে নারী দেহের প্রতিটি রহস্য উদ্‌ঘাটনের সুযোগ সে দিয়েছিল দীপককে। সে চেয়েছিল যে নারী বলতে একমাত্র তাকেই জানুক দীপক, তারই দেহরহস্যের সুষমায় মুগ্ধ হয়ে থাকুক। নিরাবরণ রুবির একের পর এক অঙ্গে হাত রেখে দাঁড়াতো দীপক, আর আমি দিতাম পরিচয় করিয়ে। স্তন্যপানের প্রক্রিয়া শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল দীপক। নর-নারীর যৌন-মিলনের বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর বিন্দুমাত্র বিক্ষিপ্ত হয়নি তার মন, সবটাই খুব স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেছিল সে। আমি তার মতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মার্জিতরুচি তরুণের কাছে এই ব্যবহারই আশা করেছিলাম। এই অত্যাশ্চর্য উপায়ে জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা করতে করতে প্রায়ই আমার মনে হতো, আমি যেন এক নিষ্পাপ শুচিশুভ্র নবীন আদমকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি চিরন্তনী ইভের সঙ্গে।

'এই পরিচয়ের ফলে যে কামনার দীপ জ্বলছিল অন্তরের নিভৃত কোণে, তাই মেললো শিখা। যা ছিল অব্যক্ত তাই ব্যক্ত হলো রুবিকে কেন্দ্র করে। আমি দীপকের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম কবে সে এসে রুবিকে পেতে চাইবে তার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে। অবশেষে একদিন তার মনের কথা ব্যক্ত করলো দীপক। তখন তার বয়স বাইশ আর রুবির পঁচিশ। সুতরাং বিবাহের কোনো বাধাই ছিল না। তিন মাস বাদে বিয়ে হলো তাদের।'

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'এই বিবাহ সুখের হয়েছে বলেই আপনার ধারণা?'

'একটি সন্তান হলে আরো সুখের হতো।'

'সন্তান হবার কোনো বাধা আছে কি?' প্রশ্ন করলেন নগেন সোম।

'কিছুই না। সুস্থ সবল দম্পতি, পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে তাদের, এরমধ্যে সন্তান হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অন্ধ, বোবা বা কালা বংশগত দোষ নয়। আমি আশা করি যে এই মামলার শেষে আবার তারা মিলিত হবে এবং একটি সন্তান এসে সার্থক করবে তাদের দাম্পত্যজীবন।'

'এই আপনার শেষ কথাগুলি শুনলে মনে হয়, আসামী যে নির্দোষ এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ।'

বিচারপতির এই মন্তব্যে একটু থেমে সাক্ষী বললেন, 'হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহ। এই খুনের সংবাদ পড়ার পর প্রথমটা আমার বিশ্বাসই হয়নি। স্বাভাবিক অবস্থায় দীপক যে খুন করতে পারে এ কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। অন্যথায় হয়তো কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা, কোনো অপ্রতিরোধ্য ঘটনা······কিন্তু কি সে অবস্থা, কি সে ঘটনা? কিছুই ভেবে পাইনি······অবশ্য একটা সম্ভাবনার কথা মনে একবার জেগেছিল কিন্তু তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি।'

'তুচ্ছ হলেও আদালতকে সেটুকু বললে ভালো হয়,' বিপ্রদাস উৎসাহিত করার সুরে বললে।

'বেশ বলছি······রুবির প্রতি দীপকের আকর্ষণের তীব্রতা অনুমান করা কঠিন নয়। তার কাছে রুবি শুধু আনন্দের উৎস নয়, প্রকৃষ্ট আশ্রয়ও। নিহত মিঃ বিচামকে আমি দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানিও না। তাঁর চরিত্রের প্রতি কোনো শ্লেষোক্তি আমার উদ্দেশ্য নয়। দীপকের প্রতি রুবির প্রগাঢ় প্রেমেও সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু না চাইলেও দুই আর দুয়ে চার হয়ই। রুবির মতন সুন্দরী মেয়েকে দেখে মিঃ বিচামেরও নিজের অজান্তেই কোনো দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়া অসম্ভব নয়। হয়তো এমন কিছু হয়ে থাকবে আর হয়ে থাকলে তা শুধু দীপকের তীক্ষ্ণ সদাসচেতন অনুভূতি শক্তিতে ধরা পড়ার অপেক্ষা। দানবের শক্তি তার দেহে; তার হাতে পড়লে সাধারণ মানুষ সাবধান হবারও সুযোগ পাবে না, বলিষ্ঠ পাঁচ আঙুলের চাপে মশার মতন মরে যাবে। এইরকম কিছু একটা ঘটনা ছাড়া তার বারম্বার স্বীকৃতির কারণ খুঁজে পাই না, বুঝতে পারি না তার আঙ্গুলের ছাপের রহস্য·'

কথা শেষ না হতেই লাফিয়ে উঠে বললেন নগেন সোম, 'আসামী পক্ষের এক স্বাক্ষীর এই বক্তব্যের প্রতি আমি জুরী মহোদয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্লেষণ। আসামীর খুন করার কারণ ও উদ্দেশ্য যে এখন সুপরিস্ফুট তাতে সন্দেহ নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল বিপ্রদাস, 'না, সাক্ষী নিজের মনগড়া একটা কাহিনী বলছেন, সত্যের ধার দিয়েও যেতে পারেননি তিনি। আসামীকে যদি সাক্ষীবর্ণিত কোনো ঘটনায় জড়িত ধরাই হয় তাহলে আমি বলবো যে কশাঘাতে ক্ষিপ্ত অশ্বের মতন কোনো এক মর্মবিদারী আঘাতের যাতনায় মিঃ বিচামকে খুন করতে ছুটে গিয়েছিল দীপক দত্ত। সেই আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে খুন করার অধিকার তার ছিল কিন্তু খুন সে করতে পারেনি।'

বিস্মিত বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বক্তব্য আরও একটু স্পষ্ট করে বলুন মিঃ বসু।'

'আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে খুনের দায়ে দীপক দত্ত অভিযুক্ত সেই খুন

সে করেনি।'

ক্ষণিকের জন্য আদালত কক্ষে ঘনিয়ে এল এক নিরেট নিস্তব্ধতা, লোক-গুলোকে মনে হলো যেন এক একটা পাথরের মূর্তি। এই জড়তা কাটিয়ে প্রথম কথা বললেন নগেন সোম। তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তাই যদি হয় তাহলে আসামীর স্বীকৃতি, তার আঙুলের ছাপ, এই সবই কি স্রেফ মায়া ?'

'মোটেই নয়। আঙুলের ছাপ যে আসামীর তা আমি অস্বীকার করছি না। এইখানে আদালতকে একটা কথা বিশেষভাবে জানাতে চাই। আমার বিশ্বাস যে খুব সম্ভব এই অতীব রহস্যময় হত্যার তদন্ত যত নিপুণ এবং নিখুঁতভাবে হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বক্তব্য আমি পরে পেশ করবো। আর আসামীর স্বীকৃতি ? হত্যা উদ্ঘাটনের পর থেকেই দীপক দত্ত যেভাবে বার বার জোরের সঙ্গে নিজের দোষ স্বীকার করে চলেছে তাতে আমিও কম বিচলিত নই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মামলা শেষ হবার আগে এই দীপক দত্তই দ্বিগুণ জোরে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করবে। এই ঘোষণার জন্য প্রয়োজন, সে যে নির্দোষ, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার সামনে তুলে ধরা। তাহলেই তার বর্তমান মুখোশ খসে পড়বে।'

'তাহলে আমাদের এখন এই বিশ্বাস করতে হবে যে আসামী গত কয়েক মাসে বিভিন্ন এজাহারে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে ?' বিচারপতি শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, মিথ্যা বলেছে ; প্রতিবারই সে মিথ্যা বলে ভুল পথে চালাতে চেয়েছে সকলকে।'

'কিন্তু কেন সে এমন অদ্ভুত আচরণ করবে ?' নগেন সোমের এই প্রশ্নে পুঞ্জীভূত বিরক্তি যেন ঝরে পড়লো।

ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল বিপ্রদাস, 'এই প্রশ্নের উত্তর জানলেই তো পাওয়া যায় রহস্য উদ্ঘাটনের পথ। ফাদার লরেন্স বলেছেন যে প্রকৃত খুনীর পরিচয় একমাত্র দীপক দত্তই প্রকাশ করতে পারে। আমারও তাই মত। প্রকৃত খুনীকে তার এই আড়াল করার কারণ জানা গেলেই, প্রকৃত খুনী যে কে তা জানাও কঠিন হবে না।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো নগেন সোমের বিদ্রূপমিশ্রিত কণ্ঠস্বর, 'আসামী পক্ষের এই কল্পিত প্রকৃত খুনীকে কোনোদিন জানা যাবে না, কারণ তার কোনো অস্তিত্বই নেই। এই মামলার আসামী একজনই—সম্পূর্ণ বাস্তব এবং সজীব একটি মানুষ, দীপক দত্ত তার নাম আর সে আমাদেরই চোখের সামনে ওই একটু দূরের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'ফরিয়াদী পক্ষের এই অসমীচীন অন্যায় উক্তির বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি,' গর্জে উঠল বিপ্রদাস।

নগেন সোম কিন্তু থামলেন না। সেই বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বলে চললেন, 'মনে রাখতে হবে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া আর কিছুরই মূল্য নেই আদালতের কাছে। শুধু কথার পর কথা সাজিয়ে আসামী পক্ষ বাজীমাৎ করতে চাইছেন।

কিছুই ফল হবে না এতে। 'প্রকৃত খুনী'র পরিচয় আদালতের সামনে পেশ করলে আমিই প্রথমে আসামীর মুক্তির জন্য আবেদন জানাবো। আমাদের সকলেরই লক্ষ্য সুবিচার, প্রকৃত দোষী শাস্তি পাবে এই আমরা চাই···এবং এই মুহূর্তে আমাদের সামনে দোষী মাত্র একজনই আছে।'

এই বাদানুবাদে যবনিকা টানলেন বিচারপতি। সাক্ষীর প্রতি লক্ষ করে তিনি বললেন, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

'এই বাদানুবাদ শোনবার পর আমার পূর্ব বক্তব্যকে আর একটু প্রাঞ্জল করা প্রয়োজন মনে করছি। আমি আমার নিজস্ব একটা অনুমানের উল্লেখ করেছি মাত্র এবং এ-ও বলেছি যে অনুমানটা আমার মনঃপূত হয়নি। মনঃপূত হয়নি তার কারণ দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে দীপকের মনের গড়ন, তার গতি-প্রকৃতি আমার জানা ছিল। আকৃতি দেখে ওর ভাবদর্শী, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক অন্তরকে ঠিক চেনা যায় না। কিন্তু আমি জানি কি যত্নে, কি নিষ্ঠায় ফাদার লরেন্স সেই অন্তরকে গড়েছেন, ফুলের মতন বিকশিত করেছেন তার মন ও বুদ্ধিকে। এমন যার অন্তর সে শুভ আর সুন্দর যা শুধু তাই করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এ ছাড়া দীপক বিদেশে গিয়েছিল এক মহান আদর্শের প্রেরণায়, অন্ধ-কালা-বোবাদের প্রতিভূ হয়ে, অভূতপূর্ব এক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতীক হয়ে। সেই লোক দেশে ফিরে আসবে খুনের অভিযোগ ঘাড়ে নিয়ে, এমন চিন্তা আমার কল্পনারও অতীত।'

সাক্ষ্য শেষ করে ডাঃ সেন আদালত কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে ভাবছিল অতসী। আসামী দীপককে কেন্দ্র করে তার মনে চিন্তার জাল যেন ক্রমশঃ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ডাঃ সেনের সাক্ষ্যে নতুন একটা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে সে। অন্ধ-কালা-বোবা দীপকের সঙ্গে তার স্ত্রী রুবির যৌন-সম্পর্ক নিয়ে যতই ভাবছে ততই খেই হারিয়ে যাচ্ছে যেন। প্রথমটা এই দম্পতির মধ্যে কোনও দৈহিক সম্পর্কের কথা সে ভাবতেই পারেনি। সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা মেয়ে রুবি জীবন্ত দানব দীপকের প্রণয়-আলিঙ্গনে ধরা দিচ্ছে, একথা ভাবতেও ঘৃণায় শিউরে উঠেছে তার অন্তর। কিন্তু ফাদার লরেন্সের এবং বিশেষভাবে ডাঃ সেনের সাক্ষ্য শোনার পর আর সেই ধারণা ধরে রাখা যাচ্ছে না। দীপক শুধু ভালোবাসেনি রুবিকে, প্রেমিক পুরুষের মতো সর্বস্ব সঁপে দিয়েছে তার প্রিয়তমার পায়ে। সত্যিই সৌভাগ্যবতী রুবি! একটা পশুর হাতে পড়ে জীবন ব্যর্থ হয়েছে রুবির, এ কথা যারা ভাবছে অতসী তাদের দলে আর নেই। দীপকের দিকে চাইলেই তার মনে নাড়া দিচ্ছে ওই বিরাট পুরুষের বলিষ্ঠ প্রেমের মাধুর্য, ওই বিশাল বক্ষে আশ্রয়ের রোমাঞ্চ! আর তা ছাড়া দীপক মোটেই পশু নয়, বুদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল তার চৈতন্য, ভাবানুভূতির কম্পনে স্পন্দিত তার অন্তর! চকিতবিস্ময়ে লক্ষ্য করল অতসী আসামীর প্রতি তার মনের সব বিরূপতা কোন এক অজ্ঞাত আবেগের তাপে গলে যাচ্ছে, কুয়াসার মতন মিলিয়ে যাচ্ছে তার পুঞ্জীভূত ঘৃণার বাষ্প। কেন কে জানে হঠাৎ রুবি দত্তকে দেখবার

এক উদগ্র আগ্রহ পেয়ে বসলো তাকে। মুখ তুলতেই চোখে পড়ল পরবর্তী সাক্ষীকে।

লম্বা আলখাল্লা পরা ফাদার কোলম্যান বেশ মোটাসোটা, হাসিখুশী, সদানন্দ মানুষ। বয়সের ভারে দেহ একটু নুয়ে পড়েছে। চোখে হাসি ফুটিয়ে আদালত ঘরের এধার-ওধার দেখছিলেন তিনি, যেন সবটাই একটা মজার ব্যাপার। বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'দীপক দত্তকে আপনি চিনতেন?'

'নিশ্চয়ই, রামপুরহাটে আমাদের কাছে কতদিন ছিল, সেই ছেলেবেলা থেকে!'

'আপনি কি তাকে দেখাশোনা করতেন?'

'শিক্ষায়তনের পরিচালক ফাদার লরেন্সের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছিল দীপক······তবে আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলতাম। বালকের অসাধারণ বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম আমি। পরে, মানে ওর আসার এক বছর পরে ওর পুতুল বাবলুর একটা নতুন জামা করে দিয়েছিলাম। সেই থেকে ওর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতার সূত্রপাত। 'বাবলু'কে নিয়ে ওর সঙ্গে প্রথম আলোচনা আমার এখনও মনে আছে। আমি ওকে রাগাবার জন্য বললাম 'বাবলুর জামাটা একেবারে পুরনো হয়ে গেছে!' সঙ্গে সঙ্গে ও প্রশ্ন করল, 'ওর নতুন পোশাকের রঙ কি হওয়া উচিত?' অন্ধ বালকের মুখে রঙ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন শুনে আমি প্রথমটা হতচকিত না হয়ে পারিনি। তারপর সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম 'কেন লাল রঙ······কিন্তু লাল রঙ সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা আছে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করলে দীপক, 'লাল বেশ উগ্র রঙ, তাই না?' আমি ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'তুমি তো ঠিক ধরেছো দেখছি······ ফাদার লরেন্স নিশ্চয়ই রঙ সম্বন্ধে তোমাকে শিখিয়েছেন?' শুনলাম রঙ সম্বন্ধে অনেক কথা ছাত্রকে শিখিয়েছেন ফাদার লরেন্স, এমন কি রামধনুর সাতটা রঙ সম্বন্ধেও বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ঘ্রাণ ও আস্বাদের সাহায্যে ওর মনে রঙের এই প্রাথমিক ধারণা জাগিয়েছিলেন ফাদার লরেন্স। অর্থাৎ কমলালেবু, কালো আঙুর, আর ন্যাসপাতির মধ্যে গন্ধের পার্থক্য দিয়ে ও কমলা, কালো আর হলুদ রঙের পার্থক্য নির্ধারণ করেছিল। এইভাবে বিভিন্ন রঙ সম্বন্ধে একটা আবছা জ্ঞান হওয়ার পর নিজের থেকেই রামধনুর রঙের সঙ্গে মিলিয়ে প্রত্যেক জিনিসের রঙ ভাববার চেষ্টা করতো।'

'দীপকের রঙ সম্বন্ধে এই ধারণা কি নির্ভুল ছিল?' বিপ্রদাস প্রশ্ন করল।

'না, নির্ভুল হওয়া সম্ভব ছিল না। তার এই মনগড়া রঙ নির্ধারণের ভুল আমি ধরতে পারলাম আবার একদিন 'বাবলু' সম্বন্ধে কথোপকথনের সময়। ও আমার কাছে বাবলুর চোখের রঙ জানতে চাইল। আমি বললাম যে বাবলুর চোখের রঙ নীল আর চুলের রঙ কালো। ও শুনে কেমন যেন মুষড়ে পড়ল। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বেশ জোরের সঙ্গে বললে, 'ও রঙ আমার

পছন্দ নয়। বাবলুর চোখের রঙ হলুদ আর চুলের রঙ নীল হলে ওকে আরও ভালো দেখতে হতো।' আমি প্রথমটা কিছু বললাম না। তারপর কথায় কথায় ওর রঙ সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণার একটা আভাস পেলাম। দেখলাম সতেজ যা কিছু তার সঙ্গে সবুজ রঙ, বল আর বীর্যের সঙ্গে লাল রঙ, পবিত্রতা আর পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সাদা রঙ—ওর ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অবশ্য এতে খুব আপত্তির কিছু ছিল না। অন্ধ না হয়েও তো কত লোক রঙ-কানা হয়, ছবিতে যে সব রঙ তুলি দিয়ে ফোটান হয় তার সঙ্গে সব সময়েই কি প্রকৃতির বুকে আঁকা রঙের মিল থাকে! তবুও আমি ওর এই ধারণা দূর করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হইনি!'

এইখানে নগেন সোম বাধা দিয়ে বললেন, 'রঙ সম্বন্ধে সাক্ষীর এই বিশ্লেষণ খুবই চমকপ্রদ সন্দেহ নেই কিন্তু মামলার ব্যাপারে এর কিছু মূল্য আছে বলে আমার মনে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিপ্রদাসের ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'আসামীর রঙ সম্বন্ধে এই মনগড়া ধারণা আদালতের জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমার বন্ধু হয়তো শুনে আশ্চর্য হবেন, যে হত্যার দায়ে আসামী অকারণে অভিযুক্ত সেই হত্যা-নাটকে এইরকম একটা বিশেষ রঙের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলেই আমার বিশ্বাস।'

তীক্ষ্ম বিদ্রূপের সুর বেজে উঠলো নগেন সোমের কণ্ঠে, 'আমার বন্ধু মিঃ বসু একের পর এক রহস্যজাল বিস্তার করে চলেছেন, শেষ পর্যন্ত হয়তো বটতলার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসকেও ছাড়িয়ে যাবেন তিনি।'

মুখে প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে আগের মতনই বলল বিপ্রদাস, 'ঠিকই, ডিটেকটিভ উপন্যাসের শেষ পাতায় পাওয়া যায় প্রকৃত খুনীর পরিচয়···এই মামলার শেষ অঙ্কে প্রকৃত খুনীর সন্ধান পেলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।'

'শেষ অঙ্কে কেন, এখন বলতেই বা আপত্তি কি?' মিছরির ছুরির মতন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন নগেন সোম।

প্রতিপক্ষের এই আঘাত হানার চেষ্টায় বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই বিপ্রদাসের। শোনা গেল তার অচঞ্চল উত্তর, 'প্রকৃত হত্যাকারী কে তা জানা আছে, এমন দাবী আসামীপক্ষ একবারও করেনি। আমি এইমাত্র জানি যে আমার মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং প্রকৃত হত্যাকারীকে সনাক্ত করার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করবো না এই তার দুর্জয় পণ। তার এই নীরবতার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে আঘাত দিতে হবে, সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্য ভেঙ্গে ফেলতে হবে এই বাধা। সে কাজের সময় এখনও আসেনি। এই মুহূর্তে আমি শুধু বলতে পারি যে হত্যার আনুপূর্বিক ঘটনা তিনজন ব্যক্তিকে সম্ভাব্য হত্যাকারী বলে নির্দেশ করছে। আমার মক্কেল অবশ্যই এই তিন জনের অন্যতম; কিন্তু সে যে হত্যা করেনি তা প্রমাণ করা কিছু কষ্টকর হবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তির আচরণ সন্দেহজনক কিন্তু তার স্বপক্ষেও প্রমাণের অভাব নেই। তখন বাকী থাকে তৃতীয় ব্যক্তি। এই তৃতীয় ব্যক্তিই প্রকৃত

হত্যাকারী। কিন্তু এই তৃতীয় ব্যক্তিটি যে কে তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। এইবার আমি রঙের ব্যাপার আলোচনা করতে চাই। আমার মাননীয় বন্ধুবর বলেছেন যে ফাদার কোলম্যানের সাক্ষ্যের এই অংশ মামলার পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। আমি আবার সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে তাঁর এই ধারণা ঠিক নয়। প্রত্যেক মানুষেরই প্রিয় কয়েকটা রঙ থাকে, তা সে বাস্তবলভ্য বা কল্পনাসৃষ্ট যাই হোক না কেন। আসামীর প্রিয় সব রঙই কল্পনায় গড়া, কিন্তু তার বর্ণবৈচিত্র্যের আনন্দানুভূতিটুকু মিথ্যা নয়……'

বিচারপতি হাতুড়ি বাজিয়ে ছেদ টানলেন এই বাকযুদ্ধে। তারপর সাক্ষীর পানে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মনে হয় যে আসামীর পক্ষে অভিযোগোক্ত হত্যা সম্ভব?'

'হত্যা! দীপকের পক্ষে।' বিপুল বিস্ময়ে বললেন সাক্ষী। একটু থেমে আবার বলে চললেন, 'শিক্ষায়তনের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট রয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত দীপকের মতন এমন ধীর, স্থির, সুবোধ ছাত্র আর দেখিনি। আমাদের বৃদ্ধ মালীর একটা মন্তব্য মনে পড়েছে। বর্তমান অভিযোগের কথা শুনে সে শুধু বলেছিল—যে দীপক ফুল এত ভালোবাসতো সে কি না নরহত্যা করেছে!

'বাইরে নোংরা কাজ করে এসে বাড়ীতে ফুলের সুগন্ধে বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো, এমন অনেক চরিত্র ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে।' চাবুকের মতন চমকে উঠলো নগেন সোমের শ্লেষোক্তি। ঈষৎ বিরক্তিভরে একবার অ্যাডভোকেট জেনারেলের দিকে চেয়ে বিচারপতি সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, 'শিক্ষায়তনের বাগানে এই মালিরই একটা কাঠের ঘর ছিল না?'

এই প্রশ্ন শুনে হাসিখুশী ফাদার বিস্মিত হয়েছেন বোঝা গেল। একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ…ছিল।' বিচারপতিকে তাদের শিক্ষায়তনে কখনও দেখেছেন বলে তাঁর মনে পড়ছিল না, অথচ……।

'সেই ঘরটা কি এখনও আছে?'

'আছে, মানে একটা অগ্নিকাণ্ডের পর নতুন করে তৈরী হয়েছে।'

'অগ্নিকাণ্ড?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ একটা সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছিল আর কি।'

'দুর্ঘটনার বৃত্তান্তটা একটু বিস্তারিত বললে ভাল হয়।'

'যতদূর মনে পড়ছে দূর থেকে প্রথম আমার আর সঙ্গী একজন শিক্ষকের চোখে পড়েছিল বাগানের মাঝখানে আগুন আর ধোঁয়া। কাছে গিয়ে দেখি কাঠের ঘরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন—রবি ও শিক্ষায়তনের ছাত্র সুবীর। দু'জনেরই পোশাক আগুনে ঝলসে গেছে, দু'জনেরই হাতে মুখে ধোঁয়ার কালি। এধার ওধার চেয়ে মালীকে কোথাও দেখতে পেলাম না।'

'আগুনের দিকে যাবার পথে আপনারা আসামীকে ছুটে স্কুল বাড়ীর দিকে যেতে দেখেছিলেন কি?'

'না। তবে আপনার প্রশ্নটা শুনে একটা একটু অস্বাভাবিক ঘটনা আমার মনে পড়ছে বটে। পরের দিন সুবীর এসে আমায় বলেছিল—রুবির আগের দিনের কৈফিয়ৎ যে তারই দোষে ল্যাম্প উল্টে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ল্যাম্প উল্টেছিল ঠিকই, তবে রুবির হাতে নয়। দীপক ইচ্ছে করে জ্বলন্ত ল্যাম্প ছুঁড়ে দিয়েছিল খড়ের গাদায়। তারপর আগুন জ্বলে উঠতেই তাকে আর রুবিকে ঘরে আটকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল সে। আমি আশ্চর্য হয়ে প্রথমে ধমকে উঠেছিলাম সুবীরকে; দীপকের নামে মিথ্যা অপবাদ দেবার চেষ্টা করছে বলে। দীপক তার বিশেষ বন্ধু আর তা ছাড়া সেই সময় সে সেই ঘরের কাছেও ছিল না। আমার এই ধমকে বিশেষ ফল হয়নি। একটুও বিচলিত না হয়ে বেশ জোরের সঙ্গে সুবীর যা বলেছিল তার অর্থ হচ্ছে যে দীপক সেই ঘরে ছিল, খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল দীপকই এবং সে যখন জ্বলন্ত ঘরে বন্দী হয়ে দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে তখন সুযোগ বুঝে দীপক পালিয়ে গিয়েছিল শিক্ষায়তনের বাড়ীতে। দরজা ঠিক সময়ে না ভাঙ্গলে সে আর রুবি দু'জনেই সেই অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ হতো। এই কাহিনী শুনতে শুনতে আমি প্রথমটা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। তবুও জানতে চাইলাম যে কেন দীপকের মতন ছেলে এমন নৃশংস কাজ করবে! একটু হেসে সুবীর উত্তর দিয়েছিল—কারণ দীপক আমায় হিংসে করে। তার ধারণা রুবি তাকে নয়, আমাকেই সত্যিকারের ভালোবাসে।

'এইসব কথা শোনবার পর বিশেষ বিচলিত হয়েছিলাম। ভালো ছাত্র বলে সুনাম ছিল সুবীরের। সে যে অকারণে মিথ্যা বলবে এমন ভাববার কোনো কারণ ছিল না। অথচ দীপককেও সন্দেহ করা কঠিন। এ অবস্থায় ফাদার লরেন্সকে প্রথমে কিছু না বলে নিজেই একট অনুসন্ধান করে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। সুযোগ পেয়ে একদিন দীপকের কাছ থেকে রুবি আর সুবীরের দুর্ঘটনার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম। সে নির্বিকারভাবে উত্তর দিল—ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি আমি—কারণ সুবীরকে আর আমার বন্ধু বলে মনে করি না।

'তারপর বহু চেষ্টা করে আর একটা কথাও তার কাছ থেকে জানতে পারিনি। সুবীরকে আবার একদিন প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম। সেও কেমন এড়িয়ে গেল। খুব সম্ভব প্রথম উত্তেজনা প্রশমনের পর ব্যাপারটায় তার আর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। এরপর আমিও এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করিনি। পরে দীপক আর রুবির বিয়েতে সুবীরকে উপস্থিত দেখে ব্যাপারটার তুচ্ছতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।'

'আসামীর স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

'এ বিষয়ে অধ্যক্ষ ফাদার লরেন্সের উচ্চ ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার কোনো অমিল নেই।'

'বিয়ের সময় বর ও বধূকে দেখে কি আপনার সুখী মনে হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই, দু'জনেই যে অত্যন্ত সুখী হয়েছিল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

'বিয়ের পর দু'জনের সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়েছিল ?'

'একবার, যখন বিলাত যাবার পথে দুজনে রামপুরহাটে এসেছিল।'

'তখনও আগের মতনই সুখী মনে হয়েছিল দু'জনকে ?'

'হ্যাঁ। আর তাই আমার বিশ্বাস, যে ঈশ্বর অসীম করুণায় যখন এত সুখ আর সমৃদ্ধি এসেছে দীপকের জীবনে, তখন আজ ঈশ্বরই করে দেবেন তার এই সঙ্কটমোচনের ব্যবস্থা।'

সাক্ষ্য শেষ হওয়ার নির্দেশ জানালেন বিচারপতি।

রুবি দত্তকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে আগ্রহে উন্মুখ হয়েছিল অতসী। শুধু অতসী কেন, আদালত কক্ষে উপস্থিত অনেকেই অপেক্ষা করছিল এই মুহূর্তটির আশায়। সকলকে নিশ্চিন্ত করে নীলনয়না, তন্বী, তরুণী রুবি দত্ত এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। বিচারপতির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, ভাবটা, মামলার আসামী তার স্বামীর দিকে চাইবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা। কৌতূহলের আতিশয্যে ক্ষণিক মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল ঘরভর্তি লোক। এই ক্ষীণাঙ্গী তরুণীকে বিশালদেহী দীপকের স্ত্রী কল্পনা করে নিতেও কিছু সময়ের প্রয়োজন!

একটু সময় অতসীরও লেগেছিল। রুবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। চোখের সামনে না দেখলে সে বিশ্বাসই করতে পারতো না যে দীপকের স্ত্রী এত রূপসী। এই চিন্তার মাঝেই হঠাৎ চমকে উঠলো সে। চমকে উঠলো একটু দূরের ওই দানবসদৃশ মানুষটিকে এত পরিচিত মনে হচ্ছে বলে। একটু আগে তার কাছে যার সংজ্ঞা ছিল আসামী বা পশু, এখন তাকেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের মনে বার বার দীপক বলে ফেলছে। শুধু তাই নয়, রুবিকে দেখার পর অন্তরের গোপন-গভীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব, দীপকের দৃষ্টিতে এইভাবে রুবির মতন সুন্দরীর পাশে প্রকাশিত হওয়ায় একটা ক্ষীণ লজ্জার ছোঁয়া। যেন এই মুহূর্তে দীপক দৃষ্টিহীন হওয়ায় তার কিছুই এসে যায় না, অথবা ভাবাবেগের আতিশয্যে সে ভুলে গেছে দীপকের তিন প্রধান ইন্দ্রিয়ের পঙ্গুতা। সাক্ষ্য শুরুর আওয়াজ কানে যেতেই চমক ভাঙলো অতসীর। চোখ ফিরিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিল রুবিকে। যে মেয়ে স্বামীকে জেলে বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে গা ঢাকা দিয়েছিল, তার মুখে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে আত্মসর্বস্বতার সুস্পষ্ট ছাপ!

রুবি ততক্ষণে তার বাল্যের কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছে। সে একে একে বলে গেল দীপকের সঙ্গে তার পরিচয়, অসীম স্নেহ ও সহানুভূতির প্রেরণায় গড়ে ওঠা দু'জনের সাথীত্ব, দীপকের বাবা, মা, এবং পরিবারের সকলের এই পঙ্গু বালকের প্রতি অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সাথীত্ব দৃঢ় হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত দীপক রামপুরহাট চলে যাওয়ায় তার বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা।

এইখানে বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'আসামী রামপুরহাট চলে যাওয়ার পর সাত বছর নিয়মিত তাকে চিঠি লিখতেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহে একখানা চিঠি লিখতাম। প্রথম দু'বছর ফাদার লরেন্স উত্তর দিয়েছিলেন। তারপর দীপক 'ব্রেল' পদ্ধতিতে উত্তর দিত। আমি এই পদ্ধতি শিখে নিয়েছিলাম। তাই তখন তার চিঠি পড়ায় বা উত্তর দেওয়ার কোনো অসুবিধা হতো না।'

'রামপুরহাটে আসামীর এক বন্ধু ছিল, নাম সুবীর সরকার—তার কথা মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ মনে আছে।'

'এই সুবীর সরকারের কাছে এক সময়ে কিছু গোপন কথা বলেছিলেন আপনি?'

'কি কথা? কখন বলেছিলাম?'

বিচারপতির নির্দেশে সুবীর সরকারের সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে শোনালেন একজন কর্মচারী। পড়া শেষ হলে বিচারপতি প্রশ্ন করলেন—

'মিঃ সরকারের এই উক্তি সত্য?'

'মিঃ সরকার হিরো হবার আগ্রহে খেই হারিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছেন। দীপক আমার প্রতি কোনো অসৎ আচরণের মতলব করবে, এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। অদ্যাবধি আমার প্রতি দীপকের ব্যবহার আদর্শ বললেও কম বলা হয়। কিন্তু ঠিক এই কথা সুবীর সরকারের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি বলতে পারছি না। ভদ্রলোক আমার প্রতি সব সময়ে অত্যন্ত অপমান-জনক ব্যবহার করতেন। কাঠের ঘরের দুর্ঘটনা তাঁরই জন্য ঘটেছিল।'

'আরও একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

'আমার যা বলবার সব বলেছি। আর তা ছাড়া অতীতের একটা ঘটনা, যার সঙ্গে এই মামলার কোনো সম্বন্ধ নেই, তার বিশদ বিবরণের কি সত্যিই প্রয়োজন আছে?'

'আচ্ছা, ও ব্যাপারটা এখন থাক। পরের প্রশ্ন—আসামীর উপন্যাস রচনায় আপনার কতটুকু সহযোগিতা ছিল?'

'রচনার ব্যাপারে একটুও না। লেখার কাগজপত্র গুছিয়ে দিতাম বা প্রয়োজনীয় বই এনে দিতাম এই পর্যন্ত। রচনার কৃতিত্ব একা দীপকেরই।'

'তবুও, এই উপন্যাসের প্রেরণা আপনি এবং এই সৃষ্টিতে যে আপনার প্রভাব আছে, এ কথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না; বিশেষ করে উপন্যাসের সেইসব অংশ, যেখানে নায়কের পরিবার সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।' নগেন সোম দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করলেন।

'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দীপকের বিরূপতার পিছনে আমার হাত আছে এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। বিয়ের আগে বা পরে, কোনো সময়েই, আমি এই ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামতের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিনি।'

'আচ্ছা এটা কি ঠিক যে আসামী নিজে আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেননি, মানে সেই মুহূর্তে প্রস্তাব করবার সাহস তাঁর ছিল না?' বিচারপতি

প্রশ্ন করলেন।

'জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তে যে কোনো তরুণের পক্ষে একটু বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। দীপকের প্রস্তাব ফাদার লরেন্স আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

'কি বলেছিলেন ফাদার লরেন্স?'

'এই ব্যক্তিগত বিবরণটুকু কি মামলার পক্ষে অপরিহার্য?' জানতে চাইলেন বিপ্রদাস।

'বিবাহের প্রস্তাবের পূর্বে এবং পরে আসামী এবং সাক্ষীর মনোভাব জানা আদালতের প্রয়োজন,' বুঝিয়ে দিলেন বিচারক।

মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল রুবি। মুখ তুলে যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হলো, তখন লজ্জার ঈষৎ আভা ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে। ধীর স্বরে সে বলতে শুরু করল ঃ

'রামপুরহাটে এক নতুন দীপকের সঙ্গে পরিচয় হলো আমার। ভাবানুভূতিতে বিভোর, স্বপ্নদর্শী, ধীর, স্থির, শান্ত এক তরুণ। অল্প দিনেই আমার প্রতি তার মনোভাবের আভাস পেলাম আমি। অদ্ভুত এক আনন্দ-শিহরনের পাশে সামান্য একটু আশঙ্কাও ছিল আমার মনে। আশঙ্কা ছিল কারণ তখনও দীপককে ভালোবাসিনি আমি। তার প্রতি আকর্ষণের অনেকখানি জুড়ে ছিল অনুকম্পা। অনুকম্পার পাত্রের জন্যে অন্তর কাঁদতে পারে কিন্তু প্রেমের আলোয় তা ভাস্বর হয় না। এইভাবে আলো-ছায়ার খেলায় কেটে গেল আরও পাঁচটা বছর। এরই মধ্যে দীপকের জীবন-সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দিলাম। তারপর এল তার উপন্যাস রচনার পালা।

'উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হলো দীপক। এই সময় একদিন রাতে আমার ঘরে এলেন ফাদার লরেন্স। চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ নীরবে লক্ষ্য করলেন আমায়, তারপর ধীরস্বরে বললেন—'এমন অসময়ে এসেছি বলে একটু আশ্চর্য লাগছে, না? তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে দীপক তোমায় ভালোবাসে। কিন্তু অত্যন্ত লাজুক সে, কিছুতেই সাহস করে তোমাকে মনের কথা বলতে পারছে না। দীপক আমার ছেলে—এ কথা তোমরা সকলেই মাঝে মাঝে বল। সেই ছেলের জন্য বৃদ্ধ পিতা আমি এসেছি—তুমি কি তাকে তোমার একান্ত আপনার করে নিতে পারবে? একবারও ভেবো না যে এই প্রস্তাবের পেছনে আমার ব্যক্তিগত কোনো দাবী আছে। যতদিন খুশী সময় নাও, বিচার বিশ্লেষণ করে দেখ তারপর আমাকে তোমার মতামত জানিও।

'ঘটনার আকস্মিকতায় মুহ্যমান আমি নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলাম। ফাদার লরেন্স আবার বলতে লাগলেন—আমার বিশ্বাস তুমিও দীপককে ভালোবাস। তার প্রতি তোমার মনোভাব—সেই বাল্যের স্নেহ ও প্রীতি দিয়ে তাকে সাথী করার আগ্রহ, প্রতি সপ্তাহে তাকে লেখা তোমার সুন্দর চিঠিগুলো এখানে তার সঙ্গে আবার মিলিত হওয়ায় তোমার সেই উল্লাস······তাকে

মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমার কাজে তোমার অনলস সাহায্য……এই সবই দীপকের সঙ্গে তোমার মিলনের অনুকূল। লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে দীপক, দিনে দিনে সে নিশ্চয়ই আরো সম্মান ও সুনাম অর্জন করবে। এখনই ইংলন্ড থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। এই বিদেশে প্রিয়তমা স্ত্রী পাশে থাকলে কত উৎসাহ আর উদ্দীপনা পাবে সে! তার অন্তরে তোমারই আসন পাতা, তার জীবনে আশা ও আনন্দ, প্রেম ও প্রেরণা দেবার শক্তি এক তোমারই আছে। আমি তোমায় আমার চিন্তাধারার একটা আভাস দিলাম মাত্র। কিন্তু রুবি, শেষ সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। একটা প্রশ্নের উত্তর তোমাকে, শুধু তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে—দীপককে ছেড়ে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব কি না? অনেক রাত হলো; আমি এখন যাই, কি বল?

'ফাদার লরেন্স চলে যাবার পর সারারাত ভাবলাম আমি। তাঁর সব প্রশ্নেরই উত্তর আমার জানা ছিল। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা? ভোরের আলোর মতন আমার অন্তর থেকে উত্তর আপনি উৎসারিত হলো। দেখলাম দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রতিদিন একান্ত আগ্রহে দীপককে গড়ে তোলার আড়ালে কখন তিলে তিলে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে অনুকম্পার শেষ বিন্দুটুকু। আমার অন্তর জুড়ে বসে আছে দীপক, আমারই কামনা আর কল্পনার প্রতীক হয়ে! আমাকে ছেড়ে আমি থাকি কেমন করে?·· তিন দিন পরে ফাদার লরেন্সকে জানালাম আমার উত্তর: বিবাহের সম্মতি দিলাম।'

'এই সম্মতি পরে অনুতাপের কোনো কারণ হয়নি নিশ্চয়ই?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

একটু ইতস্তত করে রুবি অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল, 'আমি সত্যিই সুখী হয়েছিলাম।'

'কিন্তু এখন?' বেরিয়ে এল নগেন সোমের বিদ্রূপতিক্ত প্রশ্নবাণ।

আঘাতে ভেঙ্গে পড়ল রুবি, তার চোখের কোল বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা! সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল এই প্রশ্নের বিরুদ্ধে বিপ্রদাসের প্রতিবাদ। নগেন সোম কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, দৃঢ়স্বরে জানালেন উত্তরের দাবী।

অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে রুবি একবার তাকালো বিপ্রদাসের পানে। শান্ত, সহাস্য ব্যারিস্টারের মুখে হয়তো ছিল কোনো আশ্বাসের ইঙ্গিত। দেখা গেল মুখ ফিরিয়ে বেশ ধীরস্বরে সে নগেন সোমের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছে:

'দীপক যে হত্যা করেনি এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। হত্যা করলেও আমি বিচলিত হতাম কিন্তু হতাশ হতাম না যদি জানতাম যে আমার প্রতি তার ভালোবাসা অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু জাহাজের সেই দুর্ঘটনার পর তার ব্যবহার আমাকে বিভ্রান্ত করেছে……একটা কথাও সে বলেনি আমার সঙ্গে, মিথ্যা জবানবন্দীর বোঝা কাঁধে নিয়ে চুপ করে, মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। জেলে সে

শত অনুরোধ সত্ত্বেও আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়নি। এমন কি ব্যারিস্টারদের কাছে বলেছে যে স্ত্রী সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই তার। এইসব থেকে বুঝছি যে আমার প্রতি যে কোনো কারণেই হোক ক্রুদ্ধ হয়েছে দীপক, হারিয়ে ফেলেছে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বাস। আর বিশ্বাস গেলে ভালোবাসার কিই বা থাকে!'

'ফাদার লরেন্স তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোনো কোনো ব্যাপারে কিছু অসুবিধার আভাস বিয়ের পরেই আপনি তাঁকে দিয়েছিলেন? এইসব অসুবিধা কি আপনার দাম্পত্য সুখের পথে বাধ্য হয়েই ছিল?'

'ফাদার লরেন্সের উপদেশ ও অনুমান মিথ্যা হয়নি। প্রচেষ্টা ও প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়েই পরিপূর্ণ সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা। সম্পূর্ণ সুখী হয়েছিলাম আমি।'

'ইংলণ্ডের দীর্ঘ প্রবাস-জীবনে এই সুখ অব্যাহত ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এই পাঁচ বছরে কোনো দিন মিঃ রবার্ট বিচামের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি?'

'না।'

'জাহাজের প্রথম তিন দিন আপনার বা আপনার স্বামীর, তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল কি!'

'না। জাহাজে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিতই ছিলাম না আমরা। দীপক দিনে দু'বার আমার সঙ্গে কেবিনের বাইরে যেত। প্রতিবার ঘণ্টাখানেকের জন্যে 'ডেকে' বেড়াতে যেতাম আমরা দু'জনে। বাকী সময় আমরা কেবিনেই থাকতাম, আমাদের খাবার সেখানেই দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।'

'তাই যদি হয় তাহলে আপনার স্বামী এমন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন কেন?'

'আমি স্থিরনিশ্চয় যে আমার স্বামী মিঃ বিচামকে হত্যা করেননি। কারুর সামান্য কোনো ক্ষতি করাও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।'

'তাহলে হত্যাকারী বলে কাকে আপনার সন্দেহ হয়?'

'সকলেই, মানে······'

বাধা দিলেন নগেন সোম, 'আপনি বললেন যে আপনার সঙ্গে ছাড়া আপনার স্বামী কেবিনের বাইরে যেতেন না। তাই যদি হয় তাহলে ঠিক দুর্ঘটনার সময়টিতে আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি অন্তর্ধান হলেন কি করে?'

'মধ্যাহ্ন ভোজের পর অন্যান্য দিনের মতো তন্দ্রাবিষ্ট হয়েছিল দীপক। এই অবসরে আমি 'ডেকে' গিয়েছিলাম, একটু খোলা হাওয়ায় পায়চারির উদ্দেশ্যে। কুড়ি মিনিট পরে কেবিনে ফিরে দেখলাম যে দীপক নেই। সন্দেহ হলো যে সে হয়তো জেগে উঠে আমায় দেখতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। জাহাজের গলি-ঘুঁজির মধ্যে তার পথ হারাবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হলাম,

তখুনি বার হলাম তার খোঁজে। আধঘণ্টা খুঁজে তার দেখা না পেয়ে ফিরে গেলাম কেবিনে। দেখি তখনও সে ফেরেনি। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় অন্তর কেঁপে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কোষাধ্যক্ষের অফিসে খবর দিতে ছুটলাম। পরবর্তী ঘটনা আদালতের নিশ্চয়ই জানা আছে…'

'না, সবকিছু জানা নেই,' দাঁড়িয়ে উঠে বলল বিপ্রদাস, 'একটা ব্যাপার অন্তত পুলিশ রিপোর্টে নেই। আপনি বললেন যে 'ডেকে' আপনি কুড়ি মিনিট ছিলেন। ঠিক কুড়ি মিনিটই কি ছিলেন ?'

'পঁচিশ মিনিটও হতে পারে, তবে আধ ঘণ্টার বেশী নয় ঠিকই।'

'বেশ,' বলল বিপ্রদাস, 'ধরা যাক্ আধঘণ্টাই। তারপর ফিরে এসে আপনি আবার স্বামীর খোঁজে বাইরে গেলেন, সেও প্রায় আধঘণ্টা। দু'য়ে মিলে হলো এক ঘণ্টা। আবার ফিরে এসে স্বামীকে কেবিনে না দেখে গেলেন কোষাধ্যক্ষ মিঃ ব্লেকের কামরায়। সেখানে মিঃ ব্লেককে সব ব্যাপারটা বলতে নিশ্চয়ই দশ মিনিট লেগেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের কেবিনে শেষবার দেখার প্রায় একঘণ্টা দশ মিনিট পরে জাহাজের কর্মচারীরা তাঁর খোঁজ আরম্ভ করেছিল। আচ্ছা, এইবার বলুন কতক্ষণ খোঁজার পর আপনার স্বামীকে প্রথম মিঃ বিচামের কেবিনে দেখতে পাওয়া যায় ?'

'অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'কোষাধ্যক্ষের কামরাতে। মিঃ ব্লেকই আমায় সেখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় মনে হয়েছিল যেন একটা যুগ ; ভয় হচ্ছিল যে আচমকা স্বামীর কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনার খবর আসবে। খবর এলো, নিয়ে এলেন মিঃ ব্লেক এবং জাহাজের কাপ্তেন। তাঁদের মুখে দীপকই হত্যা করেছে এই অনুমানের কথা শুনে নিজেকে সামলাতে পারিনি আমি। সংজ্ঞা হারিয়ে কতক্ষণ ছিলাম মনে নেই। জ্ঞান হলে কাপ্তেনের অনুরোধে জাহাজের 'সেলে', বন্দী দীপকের কাছে গেলাম। দীপকের বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে তার হাতে সংকেত এঁকে প্রশ্ন করলাম—বল দীপক, তুমি খুন করোনি ? সে সাঙ্কেতিক ভাষায় উত্তর দিল—'উতলা হয়ো না। আমি সব দায়িত্ব নেব। আমি তোমায় ভালোবাসি।' প্রতিবাদ জানালাম—'তুমি পাগলের মতো কথা বলছো, 'দীপক। আমায় ভালোবাস বলে যে দোষ তুমি করোনি, তার দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে কেন ?' নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল সে। কত অনুরোধ জানালাম, পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলাম, কিন্তু সেই পাষাণে সামান্য স্পন্দনও জাগাতে পারলাম না। আর তারপর কাপ্তেনের প্রশ্ন তাকে যখন জানালাম, সে বেশ শান্তভাবে উত্তর দিল—'আমি মিঃ বিচামকে খুন করেছি এবং তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই।' কলকাতায় জাহাজ পৌঁছবার আগে প্রতিদিনই চেষ্টা করেছি কিন্তু এই স্বীকৃতি ছাড়া আর একটা কথাও বলাতে পারিনি তাকে। এই স্বীকৃতিটা সে 'ব্রেল' পদ্ধতিতে লিখে সাক্ষীদের সামনে সই করে দিতেও দ্বিধা করেনি।'

নাকের ডগায় কালেপড়া চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে বিপ্রদাস আদালতকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এইবার আমি আবার সময়ের প্রশ্নে ফিরে আসতে চাই। আদালতের জ্ঞাতার্থে আমার নিবেদন হচ্ছে যে মিসেস দত্তর স্বামীকে শেষবার তাঁদের কেবিনে দেখা আর মিঃ পল কর্তৃক আসামীকে মিঃ বিচামের কেবিনে আবিষ্কার—এই দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব কম হলেও দু'ঘণ্টা……দীর্ঘ দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা কেন দশটা খুন হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই!'

'আপনার বক্তব্য আরও একটু সুস্পষ্ট হলে সুবিধা হয়, মিঃ বসু' শোনা গেল বিচারপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'আমি আগেই তিনজন সম্ভাব্য হত্যাকারীর কথা বলেছি। আসামী অবশ্যই এই তিনজনের একজন। কিন্তু তার শিক্ষা, দীক্ষা তার স্বপক্ষে। তার বিবেক এমন হীন কাজে প্রধান বাধা হওয়াই স্বাভাবিক। এই নৈতিক সিদ্ধান্ত বাদ দিলেও অতি বাস্তব এক বাধা তার ছিল। সে বাধা এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। এই দু'ঘণ্টার মধ্যে হত্যা একটাই হয়েছিল, দশটা নয়। যদি ধরেই নেওয়া হয় যে সে এই হত্যায় উদ্যত হয়েছিল, তাহলেও আমি বলবো যে এই দীর্ঘ সময়ের সুযোগে আমার মক্কেলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল প্রকৃত হত্যাকারী।'

'কিন্তু সেই প্রকৃত হত্যাকারীটি কে জানিয়ে দিলেই তো হয়,' নগেন সোম দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করলেন।

'সময় হলেই জানা যাবে।'

দু'জনের এই প্রশ্নোত্তরকে প্রশ্রয় না দিয়ে বিচারপতি সাক্ষীকে বললেন, 'আচ্ছা, এইবার বলুন তো, কলকাতায় পুলিশের হাতে আপনার স্বামীকে সমর্পণের পর আপনি কি করলেন?'

'আমি কলকাতাতেই ছিলাম। আমার মা জাহাজঘাট থেকে আমায় তার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; আমি যাইনি।'

'পুলিশের অনুসন্ধান চলার সময়টা কি আপনি লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন?'

'তা কেন; আমি করোনারের প্রত্যেকটি সমনে সাড়া দিয়েছি। করোনারের কাছে যখন জানলাম যে আর আমাকে প্রয়োজন নেই তখনই সংবাদপত্রের শ্যেনদৃষ্টির আড়ালে থাকতে চেয়েছিলাম।'

'আপনি বলেছেন যে স্বামী জেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হননি। তাহলে তারপর এই প্রথম আপনাদের দুজনের দেখা হচ্ছে।'

অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে 'হ্যাঁ' বলে লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল রবি দত্ত।

বিচারপতি এইবার দোভাষীকে প্রশ্ন করলেন, 'স্ত্রীর উপস্থিতি জানার পর আসামীর আচরণে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?'

'একটুও না।'

'স্ত্রীর জবানবন্দী শুনতে শুনতে আসামী আপনাকে কোনো প্রশ্ন করেছে কি ?'

'না।'

'আসামীর এই আচরণ শুধু আশ্চর্য নয়, অস্বস্তিকরও' বিচারপতি মন্তব্য করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর, 'আমাকে একটা পরীক্ষার সুযোগ দিলে, হয়তো এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান হতে পারে।'

'পরীক্ষা ? কিসের পরীক্ষা ?'

'আসামী তার স্ত্রীকে একবার স্পর্শ করবে, এইমাত্র।'

অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে নীচু গলায় একটু পরামর্শের পর সম্মতি জানালেন বিচারক। বিপ্রদাসের অনুরোধে আসামীর দিকে এগিয়ে গেল বটে সাক্ষী কিন্তু তার প্রতিটি দ্বিধাকম্পিত পদক্ষেপে পাওয়া গেল অনিচ্ছার ইঙ্গিত। কাছাকাছি হতেই বিপ্রদাস দোভাষীকে আসামীর ডান হাত নিয়ে সাক্ষীর গলায় জড়ানো সিল্কের স্কার্ফের ওপর রাখতে বললেন। স্ত্রীর স্কার্ফ স্পর্শমাত্রই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চমকে উঠলো দীপক, কণ্ঠ দিয়ে তার নিঃসারিত হলো এক তীক্ষ্ন আর্তনাদ। চমকে উঠে সকলে চেয়ে দেখলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ লতার মতো কাঁপছে আসামীর বিশালদেহ আর দোভাষীর হাতের চেটোয় দ্রুতলয়ে সংকেত এঁকে চলেছে তার স্বেদসিক্ত আঙুল।

'এইবার কথা বলছে,' সহাস্যমুখে বিচারপতির দিকে ফিরে জানালে বিপ্রদাস।

'কি বলছে আসামী ?' দোভাষীকে প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

'বার বার একই প্রশ্ন করছে আসামী, বলছে—'আমার স্ত্রীর স্কার্ফের রঙটা কি ?' আমি কি জানিয়ে দেব ?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতে যাচ্ছিলেন বিচারপতি। চর্কির মতো চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাস বলল, 'বলুন যে স্কার্ফের রঙ সবুজ।'

'কোথা সবুজ ! ধূসর রঙ অথচ…'

'জানি ধূসর' নগেন সোমের এই প্রতিবাদে দৃঢ়স্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠলো বিপ্রদাস, 'কিন্তু আমাদের ফাদার কোলম্যানের সাক্ষ্য মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে আসামীর কল্পনায় সৃষ্ট রঙের সঙ্গে বাস্তব রঙের কোনো মিল নেই। এই সঙ্গে আবার আমি আদালতকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, যে হত্যার দায়ে আমার মক্কেল অকারণে অভিযুক্ত সেই হত্যা-নাটকে একটা বিশেষ রঙের অত্যন্ত বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আমি ইচ্ছে করেই প্রয়োজনীয় এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নিয়েছি।'

তারপর দোভাষীর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি বলুন যে স্কার্ফের রঙ সবুজ।'

আঙুলের সঙ্কেতে পৌঁছে গেল উত্তর। চক্ষের পলকে দুই হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়লো সেই দীর্ঘ দেহ, বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো রুবি দত্তের গলায়

জড়ানো সিল্কের স্কার্ফ। দু'জন প্রহরী এগিয়ে গেল বাধা দিতে। ততক্ষণে সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে আসামীর আঙুল, এইবার এক টানে ছিঁড়ে ফেলবে সে সেই স্কার্ফ। রুবি দত্তের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়লো আদালত কক্ষে, থরথর করে কাঁপছে তার ক্ষীণ দেহ, লাল হয়ে উঠেছে মুখ, নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

চকিতে বিপ্রদাস আর দোভাষী দু'জনে ছুটে গেল প্রহরীদের সাহায্যে। চারজনের প্রাণপণ চেষ্টায় শিথিল হলো আসামীর বজ্রবাঁধন। কাঠগড়ায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, পূর্ববৎ পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ দেহ, মমির মতন ভাবলেশহীন মুখ। বিপ্রদাস বিপর্যস্ত রুবিকে সাবধানে এগিয়ে নিয়ে গেল একটা চেয়ারের দিকে, শোনা গেল তার অস্ফুট সান্ত্বনাবাক্য, 'সত্যিই আমি দুঃখিত মিসেস দত্ত···কিন্তু কি করবো বলুন, এই একান্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষাটুকু না হলে···'

প্রবল উত্তেজনা ঘনিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই তা মিলিয়ে গেল। উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে উঠেছিল যারা, সকলেই মুহ্যমানের মতন আবার বসে পড়লো। কি যে হয়ে গেল, অনেকে তখনও তা বুঝেই উঠতে পারেনি। বুঝে উঠতে অতসীও পারেনি। সংকটময় মুহূর্তে রুবির ভয়কম্পিত আর্তনাদে কান্না তার গলায় ঠেলে এসেছিল। নীচের ঠোঁটটা তখনও জ্বালা করছে—মরীয়ার মতো দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিল ঠোঁটটা। শুধু ঠোঁটই জ্বলছে না, সারা বুক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কেমন একটা অস্বস্তি। তাহলে সামনের ওই বিশালদেহ তরুণ, অতি হীন বর্বর এক পশু ছাড়া আর কিছুই নয়? সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে তার ভেসে গেল একটার পর একটা দৃশ্য—জেলের 'সেলে' বিপ্রদাসের কণ্ঠরোধের চেষ্টা, রামপুরহাটে জ্বলন্ত কাঠের ঘরে হত্যার আয়োজন, কলকাতার বাড়ীতে দুরন্ত ক্রোধে উন্মত্ত এক কিশোর। এরপর, এরপর কি ভাবা যায়······কিন্তু তবু কেন যেন তার মনে হলো ওই একান্ত নিঃসঙ্গ মানুষটিকে কেউই চিনতে পারছে না, সে নিজেও তো পারছে না। ঘুরে ফিরে, একটু আগের স্কার্ফকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ দৃশ্যটা বার বার ফিরে এল তার চোখের সামনে। সবুজ স্কার্ফের সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছে ওর কোনো একান্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। একমাত্র বিপ্রদাসই তার আভাস পেয়েছে আর তাই ভদ্রলোকের এই পরীক্ষার প্রচেষ্টা।

নগেন সোমের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো অতসীর। কেমন যেন মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, গলায় তেমন জোর নেই। প্রশ্ন করলেন, 'আসামী পক্ষ নিশ্চয়ই পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট?'

'অত্যন্ত,' নিজের চেয়ারে ফিরে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলল বিপ্রদাস।

বিচারপতি বললেন, 'মিঃ বসু, আপনার এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি আর কেনই বা আপনি স্কার্ফের রঙ সম্বন্ধে মিথ্যা বললেন আসামীকে, আদালতকে তা জানানো প্রয়োজন।'

হাসি মুখেই উত্তর দিল বিপ্রদাস, 'আমি জানি সকলেই একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। আমার সওয়ালে সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।'

সেদিনের মতো বিরতি ঘোষণা করলেন বিচারপতি। প্রহরীবেষ্টিত আসামী চলে যাবার সংগে সংগে শূন্য হয়ে এলো আদালত কক্ষ।

একমনে রুমাল দিয়ে চশমাটা পরিষ্কার করছিল বিপ্রদাস। অতসী পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'উঃ! সত্যিই আশ্চর্য!'

ঘাড় ফিরিয়ে বিপ্রদাস সস্নেহে বলল, 'কি আশ্চর্য?'

'ওই যে আপনার সন্দেহের বীজ বপণ করে জুরীকে দোমনা করে দেওয়া।' মৃদু হেসে, আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে ক্লান্ত ব্যারিস্টার বলল, 'হ্যাঁ, ওটুকু না পারলে এখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হতো। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর বহরটা দেখলে তো; প্রায় হতাশ হয়ে পড়বার অবস্থা হয়েছিল।'

'কিন্তু আপনি যা বললেন, মানে, আসামী যে নির্দোষ তা কি প্রমাণ করতে পারবেন?'

'তোমার কি মনে হয় বল তো?'

'আপনার মতো আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে দীপক নির্দোষ। ওর মতো বুদ্ধিমান মানুষ এমন একটা ছেলেমানুষি করতেই পারে না ··আর তা ছাড়া ওর ওই বীভৎস আকৃতির আড়ালে যে একটা কোমল অন্তর আছে তাও···'

বলতে বলতে হঠাৎ নিজের অন্তরঙ্গ সুরে নিজেই চমকে উঠলো অতসী। থেমে গিয়ে চেয়ে দেখল বিপ্রদাস তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, চোখে কৌতুকের আলো, মুখে মৃদু মৃদু রহস্যময় হাসি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাবার জন্য ব্যস্ত হলো অতসী! এতক্ষণ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভেবেছে সে। দীপককে দেখতে দেখতে বার বার তার মনে হয়েছিল যে ওই দানবরূপী মানুষটির একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে; হয়তো পাশবিক মাদকতা, কিন্তু তার প্রভাবে সম্মোহিত হবার লোকের অভাব নেই। সেও কি সম্মোহিত হয়েছে? প্রশ্নটা উঠতেই নিজের মনে হেসে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিল—একটু স্নেহ ও সহানুভূতি দিলেই বশ করা যায় ওই মানুষটিকে। হয়তো ওকে পরিতৃপ্ত করবার মতন পরিণত প্রেম রুবির নয়! হতভাগ্য ওই মানুষটির প্রয়োজন সত্যিকারের প্রেম, রুবি দত্তের প্রতারণা নয় · · · ·'

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিকারের মতন সেই মুহূর্তেই তার মনে হয়েছিল আচ্ছা, মিঃ বিচামকে রুবি দত্তই হত্যা করেনি তো? স্বামীর প্রতি আর একটুও আকর্ষণ নেই তার, তাই সেই অপরিচিত তরুণকে হত্যা করে দোষটা দীপকের ঘাড়ে চাপাবার ব্যবস্থা করেছে যাতে অবাঞ্ছিত স্বামীর হাত থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে। পরক্ষণে নিজের এই চিন্তার দৈন্যে নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিল সে।

এখন আবার নিজেকে ধিক্কার দিল প্রণম্য এই বৃদ্ধের সামনে এত প্রগল্ভ

হওয়ার জন্যে। পিতার মতো স্নেহশীল এই মানুষটি যদি জানতে পারেন তার মনের এইসব আবোল-তাবোল কথা। লজ্জায় রুমালে কপাল মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

'কি ব্যাপার হঠাৎ চুপ করে গেলে কেন ?' বিপ্রদাস স্নেহসিক্ত স্বরে জিগ্যেস করল।

'না, মাথাটা যেন ধরেছে মনে হচ্ছে।'

'এই বয়সে স্বাস্থ্য আরও ভালো হওয়া উচিত,' হেসে বলল বিপ্রদাস। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, 'কালকের টেলিগ্রামের উত্তর আজ সকালেই পেয়ে গেছি। লণ্ডন থেকে সরাসরি ট্রাংককল এসেছিল বাড়ীতে। টেলিফোনটা সত্যিই একটা আশ্চর্য আবিষ্কার। কিন্তু এর আবিষ্কর্তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি যে বহু যুগ পরে এই যন্ত্র কি অদ্ভুত উপকার করবে এক বৃদ্ধ ব্রীফলেস ব্যারিস্টারের।

সওয়াল—ফরিয়াদী পক্ষের

ফরিয়াদী পক্ষের সওয়াল শুরু করলেন ব্যারিস্টার শ্যামল পালিত! আদালত ও জুরীদের উদ্দেশ্য করে বিপ্রদাসের প্রতিপক্ষ বললেন:

'আমি প্রথমেই গত ৫ই মে 'জলযাত্রা' জাহাজে নিহত মিঃ রবার্ট বিচাম সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সেই পৈশাচিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু নিহত মিঃ বিচামের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করতে চাই সকলকে ·····অক্সফোর্ডের পাঠ শেষ করে অভিজাত বংশের সন্তান মিঃ বিচাম এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুখোমুখি। ছাত্র হিসাবে অক্সফোর্ডে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন এই আঠারো বছরের তরুণ। দর্শনের ছাত্র হিসাবে এই অক্সফোর্ডেই প্রথম তাঁর মনে ভারতের প্রতি আকর্ষণের জন্ম। চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেশের ডাকে সাড়া দিলেন এই নির্ভীক তরুণ। রাজকীয় বিমান বাহিনীর অফিসার মিঃ রবার্ট বিচাম অবিভক্ত বাঙলার মাটিতে বহুদিন ছিলেন। আমাদের এই কলকাতাতেও। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব চারবার স্বীকৃত হয়েছিল—প্রতিবারই সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। তারপর যুদ্ধ থেমে গেল, নিজের দেশে ফিরে গেলেন মিঃ বিচাম। যুদ্ধক্ষেত্রের অসহ্য ক্লেশ ও ক্লান্তির পর, অসংখ্য তরুণের মতন সাময়িকভাবে আনন্দোচ্ছল জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি তা করেননি। ভারতের সঙ্গে, বাঙলার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল এই আদর্শবাদী তরুণের। এখানকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়েছিলেন তিনি। দেশে ফিরে গিয়েই ভারতের মঙ্গলার্থে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

'মিঃ হেনরী বিচামের সাক্ষ্য আপনারা শুনেছেন। শুধু সুবিচারের আবেদন নিয়ে এই শোকার্ত পিতা, বিজ্ঞ, দায়িত্বশীল রাজনীতিক স্বেচ্ছায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছিলেন সাক্ষ্য দিতে; আসামীর প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে নয়। তাঁর মুখেই আপনারা শুনেছেন, স্বাধীন কিন্তু বিপর্যস্ত, দ্বিখণ্ডিত ভারতের দুর্দিনে সাহায্য দিতে কি ভাবে তৎপর হয়েছিলেন নিহত মিঃ বিচাম। ভারতবর্ষে যাওয়ার আগ্রহে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করতেও কুণ্ঠিত হননি এই সেবাব্রতী তরুণ। স্মরণ করুন জাহাজে ওঠার আগে তাঁর কথা ·····'আমার জীবনে অভিনেত্রীর কোনো স্থান না থাকাই উচিত—।' অর্থাৎ দুর্গতের সেবায় নিয়োজিত জীবনে প্রেমের আহ্বানও তুচ্ছ। ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসার এর চেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ আর কি হতে পারে! অথচ এর তিন দিন পরেই এই সেবাব্রতী নিঃস্বার্থ তরুণ ইংরাজ কি না নিহত হলেন আমাদেরই একজনের, এক ভারতবাসীর তথা বাঙ্গালীর তীক্ষ্ম ছুরির আঘাতে! এর

চেয়ে করুণ ট্র্যাজেডি বুঝি কল্পনারও অতীত।

'হত্যার উদ্দেশ্য জানা যায়নি এটা ঠিকই। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী বার বার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এই রহস্যময় গলতিটুকু দেখাবার চেষ্টা করেছেন এও ঠিক। কিন্তু কারণ নেই অতএব হত্যাও হয়নি এ যুক্তি অচল; অচল এই জন্যে যে আসামীর হাতের আঙুলের ছাপে আর তার লিখিত স্বীকারোক্তিতে হত্যার স্বাক্ষর জ্বলজ্বল করছে। তারপর আসামীর আজন্ম পঙ্গুতা, তিন প্রধান ইন্দ্রিয়ের পঙ্গুতাকে কেন্দ্র করে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টাও বড় কম হয়নি। মানুষ হিসাবে আর একজন মানুষের এই দুর্ভাগ্যে সমবেদনার অভাব আমাদের নেই। কিন্তু তাবলে পঙ্গু মানুষ হত্যা করলে তা আমরা সমর্থন করতে পারি না। এমন একজন পঙ্গু মানুষের বাল্যকাল থেকেই অন্যান্য সহজ স্বাভাবিক মানুষের প্রতি হিংসা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই হিংসার বিষ তাকে হত্যায় প্ররোচিত করলে, তখন অন্যায়ের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আর এ ক্ষেত্রে সেই অন্যায় যে কত গুরুতর তা বোঝা যাবে শুধু এইটুকু চিন্তা করলে যে সে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, নিরীহ এক বিদেশীকে সম্পূর্ণ অকারণে হত্যা করেছে। এই সূত্রে আবার আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মিঃ হেনরী বিচামের মন্তব্য— 'আমি স্থিরনিশ্চয় যে রবার্টের সঙ্গে আসামীর পরিচয় হলে, সে তার স্বভাব-কারুণ্যে এই পঙ্গু মানুষটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য উৎসুক হতো।

'এই পৈশাচিক নরহত্যার ক্ষমা নেই। তবুও ক্ষমার প্রশ্ন হয়তো উঠতো যদি আমরা জানতাম যে আসামীর মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নয়। মামলার শুরুতে অনেকেই ভেবেছেন, জুরী মহোদয়ের মধ্যেও কারুর কারুর এমন ধারণা হয়তো ছিল যে আসামী একজন ভয়াবহ উন্মাদ। সে ক্ষেত্রে শাস্তির প্রয়োগ এবং পরিমাণও হয়তো ভিন্ন হতো, কারণ কে না জানে উন্মাদের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব। আসামী উন্মাদাশ্রমে প্রেরিত হলে তার শুভার্থীরাও হয়তো নিশ্চিন্ত হতেন। কিন্তু এখন সব সাক্ষ্য শেষ হবার পর সেটুকু সন্দেহেরও অবকাশ নেই! একাধিক বিচক্ষণ, বিশেষজ্ঞ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে আসামীর মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক।

'আসামীর ওই পশুর আকৃতিতে বিভ্রান্ত হওয়ারও কোনো কারণ নেই। মানুষের মনে তার এই আকৃতির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আসামী সর্বদাই সজাগ এবং প্রয়োজন মতন এই আকৃতিকে মানুষের মনে করুণা জাগাবার কাজে লাগাতেও সে সদাসচেষ্ট। তার মাঝে মাঝে 'ভির্মি' যাওয়া এই প্রচেষ্টারই পরিণাম; অভিনয় দিয়ে সে চায় মানুষের অন্তরকে গলিয়ে দিতে। মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদ, হাত পায়ের বিকৃত ভঙ্গী—সবই তার এই অভিনয়ের অংশ। সে বেশ জানে যে সাধারণ মানুষ যেখানে ক্ষমা পায় না, সেখানে একজন আজন্ম পশু প্রতিবন্ধী সহজেই ক্ষমার পাত্র হয়ে ওঠে। তাই আপনাদের মনে রাখতে বলছি যে আসামী অত্যন্ত তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী,

তার প্রতিটি কাজ বিশেষ বিচার বিশ্লেষণের ফল, তার প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে আছে বুদ্ধি এবং বিবেচনার নির্দেশ। তার বর্তমান নির্বিকার রূপ একটা মুখোশ, অত্যন্ত যত্নে, অনেক ভেবেচিন্তে পরা একটা মুখোশ মাত্র। তার বর্তমান নিশ্ছিদ্র নীরবতাও পূর্বোক্ত অভিনয়ের একটা অংশ, মুখোশের পরিপূরক। বড় কঠিন এই চাল চেলেছে আসামী। এই এক চালেই সে আদালতকে, জুরীকে বিভ্রান্ত করতে চায়, টেনে বার করতে চায় সিদ্ধান্ত যে আঙুলের ছাপ এবং স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সে নির্দোষ। এবং এই চালেই বিভ্রান্ত হয়েছেন আসামী পক্ষের কৌঁসুলী। তিনি বার বার বলেছেন যে আসামী মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিয়ে আড়াল করতে চাইছে প্রকৃত দোষীকে।

'কিন্তু এই কাল্পনিক এক বা একাধিক হত্যাকারীকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছুই নেই। স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। বাস্তব সত্যকে নিয়েই আমাদের কারবার। সেই বাস্তব সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে আসামীর আঙুলের ছাপ। এই আঙুলের ছাপ যে আসামীর নয় এ কথা আসামীপক্ষ প্রমাণ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনীর অবতারণা করতে চেয়েছেন। বেশ তাই যদি হয়, তাহলে ধরেই নিচ্ছি সে সব রহস্যের অবসান হবে প্রকৃত আসামীর আবিষ্কারে। কিন্তু আমাদের বর্তমান কাহিনীতে রোমাঞ্চেরও বুঝি অবকাশ নেই। ৫ই মে তারিখে জলযাত্রা জাহাজে মিঃ বিচামের কেবিনে মিঃ হোমসের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেছে প্রকৃত আসামীর পরিচয়। সেই আসামী দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ায়। এখন সুবিচারের সহজ, সরল পথে প্রাপ্য শাস্তি তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে।

'এইবার আমি ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীর প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করতে চাই……।'

মিঃ পালিত একে একে জাহাজের ভাণ্ডারী ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে পড়ে চললেন। জাহাজের ডাক্তার এবং মানসিক বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যাংশ পড়ার পর বললেন ঃ

'এই দু'জন প্রথিতযশা চিকিৎসকের সাক্ষ্যই একবাক্যে আসামীর মানসিক সুস্থতা প্রমাণ করছে। মনস্তত্ত্ববিদ চিকিৎসক এমনকি বলেছেন—…আসামীর ধীশক্তি সাধারণ মাপকাঠির তুলনায় অনেক, অনেক উচ্চস্তরের।'

এই ভাবেই টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যান্যের সাক্ষ্য বিচার শেষ করে বললেন, 'এরপরে আর বলবার অবশ্য কিছুই নেই। তবুও ফাদার লরেন্স আর ডাঃ সেনের সাক্ষ্য সম্বন্ধে একটু না বলে পারছি না। ফাদার লরেন্স পরিষ্কার বলেছেন যে আসামীর নিশ্ছিদ্র নীরবতা সত্ত্বেও আসামীর মানসিক সুস্থতায় সন্দেহ করবার কিছুই নেই। আর ডাঃ সেন তো এই হত্যার একটা সম্ভাব্য কারণই নির্দেশ করেছেন। মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেলও স্বীকার করেছেন যে কারণটা গ্রহণযোগ্য।

'পরিশেষে জুরী মহোদয়ের প্রতি আমার নিবেদন এই যে ঘটনার বিবরণ, প্রমাণাদি ও সাক্ষ্য সবই অত্যন্ত সহজ সরলভাবে নির্দেশ করছে যে আসামী

শ্রীদীপক দত্তই মিঃ রবার্ট বিচামকে হত্যার অপরাধে অপরাধী। আইনানুসারে প্রাপ্য শাস্তির প্রার্থনা আমার কর্তব্য। সেই প্রার্থনাই আমি জানাচ্ছি। এটুকুও আমার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে ভারতের বন্ধু ইংলণ্ড আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে এই মামলার ফলাফল। আসামী পক্ষের কৌঁসুলি যাই বলুন না কেন, আমার প্রার্থনা যে দেশের বাইরে বিদেশে ভারতীয় আদালতের বিচার-ক্ষমতা যেন পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনানুসারে দেয় শাস্তির সবটুকু আমার দাবী। এ দাবী শুধু আমার নয়; এদেশের এবং ইংলণ্ডের প্রতীক্ষমান প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ নরনারীর এই একই দাবী।'

সওয়াল শেষ করে আসন গ্রহণ করার আগে শ্রীপালিত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন, উদ্দেশ্য তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। খুব বেশী অভিভূত কেউ হয়েছে বলে মনে হলো না। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চোখ ফেরালেন প্রতিপক্ষ বিপ্রদাসের পানে। আশ্চর্য! ভদ্রলোককে তন্দ্রামগ্ন মনে হচ্ছে, চশমাটা ঝুলে পড়েছে নাকের ডগায়—এবার পড়ে না যায়।

অতসীও বিপ্রদাসের এই নির্লিপ্ত অবস্থা দেখে বিস্মিত কম হলো না। সব অগ্রাহ্য করে মন তবু তার বার বার বলছিল—যে ভাবেই হোক এই প্রৌঢ় ব্যারিস্টারের জয় হবেই—মক্কেল তাঁর মুক্তি পাবেই পাবে।

ইতিমধ্যে অ্যাডভোকেট জেনারেল তাঁর সওয়াল শুরু করেছিলেন। ধীর মন্থর গতিতে হত্যার পূর্বেকার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ দিলেন, সুচারুরূপে বর্ণনা করলেন হত্যার আবিষ্কার ও আততায়ীর গ্রেপ্তার। অতসী লক্ষ্য করল, শুনতে শুনতে কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠেছে আসামী।

একটু থেমে তিনি বলে চললেন, 'এই নৃশংস হত্যার কারণ, এবং আসামীর উদ্দেশ্য, কিন্তু এখনও জানা যায়নি। আসামী যদি একজন স্যাডিস্ট বা উন্মাদ হতো তাহলে উদ্দেশ্য নির্ধারণে বেগ পেতে হতো না। বলা যেতো শুধু নরহত্যার পৈশাচিক আনন্দের জন্যই হত্যা করেছে সে। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত অচল। প্রথিতযশা চিকিৎসকদের এবং আসামীর শিক্ষকদের সাক্ষ্যে আসামীর মানসিক সুস্থতা প্রমাণ হয়েছে, প্রমাণ হয়েছে যে তার প্রতিটি কাজ চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের ফল। অপর পক্ষে শ্রীসরকার ইত্যাদির সাক্ষ্যে আসামীর রুদ্র স্বভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। আর শুধু ইঙ্গিতই বা কেন, একটু আগেই আমার বন্ধু মিঃ বসুর তথাকথিত 'পরীক্ষাকে' কেন্দ্র করে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই স্বভাবের নগ্ন রূপ।

'আমরা ধরে নিতে পারি যে আসামীর এই পাশব-প্রবৃত্তি রামপুরহাটের সুনিপুণ শিক্ষার প্রভাবে সাময়িকভাবে দমিত হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সেইসঙ্গে এ ভাবলে অন্যায় হবে না যে তার অন্তরের সেই সুপ্ত পশু হঠাৎ এক বিশেষ মুহূর্তে 'জলযাত্রা' জাহাজের কেবিনে জাগ্রত হয়েছিল। শুধু জাগ্রতই হয়নি, সব শিক্ষা-দীক্ষা, বিবেক-বিবেচনার বাধা তুচ্ছ করে সেই পশু তার হিংস্র নখর মেলে এগিয়ে গিয়েছিল পৈশাচিক নরহত্যার লোভে। কিন্তু সেই জাগ্রত হবার পেছনে কিসের প্রেরণা ছিল? কোন আঘাতে উঠে বসেছিল সুপ্ত পশু? এই

প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ডাঃ সেন তাঁর সাক্ষ্যে। আসামীর সঙ্গে দীর্ঘ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন ডাঃ সেন। তার দৈহিক এবং মানসিক বিবর্তনের সব ইতিহাস ছিল এই চিকিৎসকের নখদর্পণে। এই হত্যার উদ্দেশ্য আবিষ্কারে তৎপর হয়েছিলেন তিনি। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন—'..... রুবির প্রতি দীপকের আকর্ষণের তীব্রতা অনুমান করা কঠিন নয়।..... রুবির মতন সুন্দরী নারীকে দেখে মিঃ বিচামের নিজের অজান্তেই কোনো দুর্বলতা প্রকাশ অসম্ভব নয়।..... এমন কিছু ..হয়ে থাকলে তা শুধু দীপকের তীক্ষ্ম সদাসচেতন অনুভূতি শক্তিতে ধরা পড়ার অপেক্ষা।...তার হাতে পড়লে সাধারণ মানুষ · মশার মতন মরে যাবে।'

'আসামী পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ বসু অবশ্য সবটাই ডাঃ সেনের মনগড়া কাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। স্বপক্ষের সাক্ষীকে বিরুদ্ধ কিছু বলতে শুনলে বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। শান্ত মনে বিচার করলে কিন্তু ডাঃ সেনের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হবে। ডাঃ সেনের নিরপেক্ষতাও সন্দেহের অতীত। সুতরাং ডাঃ সেনের এই মন্তব্যের সূত্র ধরে আমি বলছি যে নিহত মিঃ বিচামকে প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে সন্দেহের বিষস্পর্শে জেগে উঠেছিল আসামীর অন্তরের সুপ্ত পশু এবং ফলে আসামীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন মিঃ রবার্ট বিচাম। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে জাহাজের অসংখ্য যাত্রীর মধ্যে মিঃ বিচামই বা এই সন্দেহের লক্ষ্য হবেন কেন? এই প্রশ্নের মূলে রয়েছে আমাদের ধারণা যে হত্যার পূর্বে আসামীর সঙ্গে মিঃ বিচামের পরিচয় ছিল না। পরিচয় যে ছিল না এই কথা শুধু বলেছেন মিসেস দত্ত। কিন্তু স্বামীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আকুল স্ত্রীর এই উক্তি কি বিশ্বাসযোগ্য?

'ফরিয়াদী পক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস যে হত্যার পূর্বে মিঃ বিচামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল আসামী এবং তার স্ত্রী। মিঃ বিচামের কেবিনও তার অজানা ছিল না। সেই বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই আসামী গিয়েছিল মিঃ বিচামের কেবিনে। হত্যার আগের এবং পরের প্রতিটি পদক্ষেপ আসামীর সুপরিকল্পিত...মধ্যাহ্ন ভোজের পর সে সেদিনও বিশ্রামের ভান করে শুয়েছিল। সে ধরে নিয়েছিল যে তার স্ত্রী 'ডেকে' যাবে একটু পায়চারির উদ্দেশ্যে; হয়তো আগেও স্ত্রীকে সেই একই সময়ে ডেকে যেতে দেখে থাকবে সে। স্ত্রী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়েছিল, প্রথম শ্রেণীর কেবিনের সামনের সরু পথ দিয়ে গিয়ে একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সর্বোচ্চ শ্রেণীর সৌখীন কেবিনগুলোর সামনে। একটু দূরেই মিঃ বিচামের কেবিন। এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সে।......মিঃ বিচামও বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন। উঠে দরজা খুললেন তিনি। আসামী তাঁর পরিচিত অতএব তার উপস্থিতিতে ভীত হবার কিছু ছিল না। দরজা বন্ধ করে আবার শয্যায় গা এলিয়ে দিলেন মিঃ বিচাম। এইখানে আমি পুলিশের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। পুলিশের ধারণায় মিঃ বিচাম নিদ্রিত অবস্থায় নিহত

হয়েছিলেন। এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়—আসামী কেবিনে প্রবেশের সুযোগ পেল কি করে ?

'শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ বিচাম। তারপর ? তারপর আসামী এসে বসেছিল শয্যার পাশের চেয়ারে। হয়তো সে তার বিশেষ পদ্ধতিতে কিছু কথা মিঃ বিচামকে বলবার ভান করেছিল। মিঃ বিচামও আগ্রহভরে চেষ্টা করছিলেন তার বক্তব্য শোনবার। এই সুযোগে গোপনে সে বাড়িয়ে দিল তার হাত পাশের টেবিলে। ভাগ্যক্রমে হাতে ঠেকলো কাগজকাটা ছুরি·· চক্ষের পলক না পড়তেই সেই ছুরি বিদ্ধ হলো মিঃ বিচামের দেহে। পুলিশ-অফিসার পরিচালিত পরীক্ষার সময় যন্ত্রের মতো ঠিক এই কাজগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেছিল আসামী।

'শিরা ছিন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছিল মিঃ বিচামের, শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে তিনি সাহায্যের আশায় দরজা পর্যন্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন শুধু। শয্যা থেকে দরজা পর্যন্ত কার্পেটের ওপর প্রসারিত রক্ত-ধারায় আবির্ভাব তাঁর এই শেষ চেষ্টার ফল। দরজার হাতলে হাত রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন মিঃ বিচাম। তাঁর দেহের ভারেই দরজা অর্ধোন্মুক্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে অভিভূত হত্যাকারী প্রথমে বিছানার চাদর দিয়ে হাতের রক্ত মোছবার চেষ্টা করেছিল। তারপর একটু সামলে উঠে সে শুয়ে পড়েছিল শয্যায়। দরজা বন্ধ করবার কথা তার মনেই হয়নি, দরজার হাতল ধরে যে মিঃ বিচামের মৃতদেহ ঝুলছে তাও সে জানতো না। আর এত মাথাব্যথা তার হবেই বা কেন ? অপরাধ অস্বীকার করবার কোনো মতলবই ছিল না তার। কেবিন ত্যাগ করে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবে যে সন্দেহের বিষে জর্জরিত হয়ে হত্যার অপরাধ করে ফেলেছে—এমন ইচ্ছাও মনের কোণে তার স্থান পায়নি। কিন্তু শয্যায় বসবার আগে একটি কাজ সে করেছিল, রক্তমাখা ছুরিটা ফেলে দিয়েছিল কেবিনের জানলা গলিয়ে। সে পরে বলেছে যে ছুরিটার অস্তিত্বে অস্বস্তি বোধই না কি তার এই ফেলে দেওয়ার কারণ। তারপর সে নীরবে অপেক্ষা করেছিল—কখন কেউ আসবে কেবিনের মধ্যে, ধরা পড়বে তার অপরাধ। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল সে ? কতক্ষণ হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ আগলে বসেছিল ? আধঘণ্টা, বড়জোর একঘণ্টা—তারপরই কেবিনে প্রবেশ করলেন জাহাজের ভাণ্ডারী মিঃ হোমস।

'অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক সন্দেহই এই নৃশংস, নিষ্ঠুর হত্যার কারণ। নিহত মিঃ বিচাম সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জেনেছি তাতে মিসেস দত্তের প্রতি তাঁর দুর্বলতার প্রশ্নই ওঠে না। এই একই সিদ্ধান্ত মিসেস দত্ত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই ভদ্রমহিলার স্বামীর প্রতি প্রেম আদর্শ বলা যায়। মিঃ বিচাম বা মিসেস দত্ত দু'জনেরই এই হত্যার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব একমাত্র আসামীর ; তার সন্দেহসঙ্কুল মনই জুগিয়েছে এই হত্যার প্রেরণা। কেউ বলবে উত্তেজনার বশে হত্যা করেছে সে ; আবার অনেকের মনে এমন চিন্তাও উঠতে পারে—এই হত্যা মানসিক বিকৃতির ফল। কিন্তু ফরিয়াদী

পক্ষের মত হচ্ছে, এই হত্যা সম্পূর্ণ স্থিরমস্তিষ্কপ্রসূত এবং পূর্বসংকল্পের ফল। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে অন্ধ-মূক-বধির মানুষের পক্ষে মিঃ বিচাম সম্বন্ধে সন্দেহজনক কোনো আচরণ বা ঘটনার বিষয়ে সচেতন হওয়া কি করে সম্ভব? উত্তরটা অত্যন্ত সোজা—ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে।

'মিঃ সরকার তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন—আমরা, যারা দৃষ্টিহীন, এক অতীন্দ্রিয় শক্তির বলে, যারা আমাদের সংস্পর্শে আসে, তাদের মনের কথা বুঝে নিতে পারি। আসামী শুধু অন্ধই নয়, মূক এবং বধিরও। তার এই অতীন্দ্রিয় শক্তি বিকশিত হয়েছিল ঘ্রাণশক্তির মাধ্যমে। এই সূক্ষ্ম কিন্তু সাংঘাতিক ঘ্রাণশক্তিই মিঃ বিচামকে কেন্দ্র করে তার মনে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করেছিল মিথ্যা সন্দেহের বিষ। জাহাজেই কোনো সময়ে মিঃ বিচামের গায়ের গন্ধ ধরা পড়েছিল তার ঘ্রাণশক্তিতে। ফাদার লরেন্সের সাক্ষ্যে আমরা জেনেছি যে অন্ধ-মূক-বধিরের, চেতনায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা বিশিষ্ট গন্ধ ধরা পড়ে। অবশ্য অন্যান্য যাত্রী থাকতে মিঃ বিচামের গন্ধই কেন ধরা পড়েছিল বলা শক্ত, হয়তো বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে। কিন্তু ধরা পড়েছিল ঠিকই। তারপর যখনই এই বিশেষ গন্ধ ধরা পড়েছে তার ঘ্রাণশক্তিতে তা সে ডেকে পায়চারি করতে করতেই হোক বা অন্য কোনো সময়ে—তখনই সন্দেহের সাপ উঁকি দিয়েছে তার মনের কোণে, বিষের নেশায় আচ্ছন্ন করেছে তার মস্তিষ্ক। এর জন্য মিঃ বিচাম বা মিসেস দত্তের সত্যিকারের সন্দেহজনক কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। এ একটা স্বয়ংক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া, একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকার। অনেকটা এরকম আমাদেরও হয়। কখনো কখনো দূরে আলাপরত দুজনের কথা কিছু শুনতে না পেলেও, শুধু ঠোঁট নাড়া দেখেই সন্দেহ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল সন্দেহ হয় যে বুঝি আমাদেরই সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। ফলে বিরক্ত হই আমরা, অস্বস্তি বোধ করি।

'অবশ্য আমাদের পক্ষে এই জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বলা যে কখন এবং কেন তার মনে এই বিশেষ গন্ধকে কেন্দ্র করে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিল। তবে এটুকু নিশ্চয় যে সন্দেহের বিষ ধীরে ধীরে ছড়িয়েছিল তার মনে, প্রতিহিংসার সংকল্প নিতে সময় লেগেছিল তার। এই মানুষটির মনে সন্দেহের এই মারাত্মক পরিণতি এই প্রথমও নয়। শ্রী সরকারের সাক্ষ্যে রামপুরহাটে বাগানের কাঠের ঘরে আগুন লাগানোতেই এর প্রমাণ আছে। আলোচ্য হত্যার দশ বছর আগেও দু'জন লোককে আগুনে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়েছিল আসামী, এবং এই দু'জনের একজন ছিল তার প্রিয়তমা নারী। এই মারাত্মক প্রচেষ্টার পেছনেও ছিল তার মনের মিথ্যা সন্দেহ—মিঃ সরকারের মধ্যে সম্পূর্ণ ভুলক্রমে সে খুঁজে পেয়েছিল তার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ফাদার কোলম্যানের সাক্ষ্যে তার এই মনোভাব, এই ভুল সন্দেহ প্রমাণিত হয়েছে।

'এই সন্দেহ এই ঈর্ষার অসংখ্য নজীর ছড়িয়ে আছে আসামীর 'নির্বাসিত আত্মা' উপন্যাসে। নায়কের পরিবারের প্রতিটি মানুষের বর্ণনায় প্রকট হয়েছে

এই ঈর্ষার নগ্নরূপ। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই বর্ণনা দিয়েছে যে, ঠিক যেমন স্বেচ্ছায় একটি নিরীহ মানুষের রক্তে কলুষিত করেছে তার হাত। জুরী মহোদয়কে তাই আমি মনে রাখতে বলছি যে তাঁদের সামনে অভিযুক্ত যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সে দৈহিক পঙ্গুতার ভারে দুর্বল, দুঃস্থ একজন মানুষ নয়। দেহে এবং মনে অসীম শক্তিশালী এই মানুষটি, তীক্ষ্ম এর বুদ্ধি, প্রখর এর মণীষা। দানবের দেহ আর দীপ্ত বুদ্ধি, এই দুই বস্তুকে অপূর্ব চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে চলেছে এই মানুষটি, পশুর মুখোশ পরে মানুষের চোখে ধুলো দিচ্ছে। বাল্যকাল থেকেই আসামী নিজের পঙ্গুতার প্রতি সাধারণ সহজ মানুষের করুণা সম্বন্ধে সচেতন। সে জানে এই করুণার ওপর নির্ভর করে অনেককিছুই করা যায়, এমন কি অন্যায়ও। একজন পঙ্গু মানুষকে শাস্তি দেবার মতো নিষ্ঠুর কেই বা হবে? বর্তমান মামলাতেও মানুষের এই করুণাই তার শেষ সম্বল।

'পঙ্গু মানুষের প্রতি করুণা আমাদেরও আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে করুণার প্রশ্নই ওঠে না। আসামী সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, নিজেকে সমর্থন করার শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন। সুতরাং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় এই মানুষের অন্যায়কে করুণার অজুহাতে হাল্কা করে দেখার কোনো অর্থই হয় না। সে কারুর সাহায্যের প্রত্যাশী নয়, এমন কি তার পক্ষের কৌঁসুলীরও নয়। অবশ্য মক্কেলের নির্দোষিতা প্রমাণে কৌঁসুলীর প্রচেষ্টার ত্রুটি নেই। কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন তিনি, আরও দু'জন সম্ভাব্য হত্যাকারীর কথাও শুনিয়েছেন আমাদের। ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁসুলী ঠিকই বলেছেন—স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। এ ক্ষেত্রে যা সত্য তা হচ্ছে আসামীর স্বীকারোক্তি এবং তার আঙুলের ছাপ—আসামীর অপরাধের জ্বলন্ত প্রমাণ।

'আসামী পক্ষের কৌঁসুলী অবশ্য তাঁর কল্পিত তিনজন সম্ভাব্য হত্যাকারীর মধ্যে আসামীও যে একজন এ কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন যে আসামীর হত্যা করার পথে দুটো বাধা ছিল। প্রথম বাধা তার বিবেক; দ্বিতীয় বাধা সময়—দীর্ঘ সময়ের সুযোগ তাঁর মক্কেলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল প্রকৃত হত্যাকারী। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌঁসুলীর এই মন্তব্য। এরই মধ্যে কি স্বীকৃত হয়নি যে আসামীর মনেও হত্যার বাসনা ছিল? পুলিশ তদন্তে অন্য কোনো সম্ভাব্য হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী একজনই এবং তারই কৌঁসুলী স্বীকার করেছেন যে তার এই হত্যা পূর্বপরিকল্পিত।'

এইখানে অ্যাডভোকেট জেনারেল এই ধরনের ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য আইনের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, 'আবার আমি জুরী মহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে একাধিক সাক্ষ্যে আসামীর মানসিক সুস্থতা প্রমাণিত হয়েছে; অতএব আইনের দেয় সবটুকু শাস্তিই তার প্রাপ্য। আইনানুসারে এই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড—মৃত্যুদণ্ডই ফরিয়াদী পক্ষের এবং সমাজের দাবী।'

অ্যাডভোকেট জেনারেলের এই সূচীতীক্ষ্ণ হিমশীতল সওয়াল এক পশলা তুষারপাতের মতো সারা আদালত কক্ষে ছড়িয়ে পড়ল। 'মৃত্যুদণ্ড' কথাটা যেন একটা তীরের মতো তীব্র বেগে এসে বিঁধল অতসীর বুকে। চমকে উঠল সে। কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দীপকের সারা দেহ বেয়ে একটা মৃদু কম্পনের ঢেউও তার চোখ এড়াল না। দীপকও বিচলিত হয়েছে। এখন একমাত্র ভরসা বিপ্রদাস। সান্ত্বনার আশায় অতসী চোখ ফেরাল বিপ্রদাসের আসনের দিকে। নিশ্চিন্ত নির্বিকার বিপ্রদাস তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে সওয়ালের জন্যে। প্রশান্ত হাসির আলো ভাসছে তার সৌম্য মুখে। নাকের ওপর ঝুলে পড়া অবাধ্য চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে নিচ্ছে বিপ্রদাস ; মামলা আরম্ভ হবার পর থেকে শ'খানেক বারের বেশী এইভাবে সামলাতে হয়েছে চশমাটাকে।

সওয়াল—আসামী পক্ষের

থমথমে আবহাওয়ায় শুরু হলো বিপ্রদাসের সওয়াল। প্রথামত নিবেদনাদি শেষ করে প্রথমেই সে সকলকে তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শোনার জন্যে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ জানাল। তারপর সে বলে চলল ঃ

'বাক্‌বিস্তার বা ভাষার ভোজবাজি আমার স্বভাববিরুদ্ধ। বক্তৃতার চাতুর্যে মহা মহা আইনজ্ঞের মতন সরলকে জটিল করে তোলার মন্ত্রও আমার জানা নেই। আর জানা থাকলেও আমার পক্ষে এই মুহূর্তে তা করা সম্ভব নয়। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমি। মৃত্যুদণ্ডের শাণিত খড়্গ ঝুলছে আমার মক্কেলের মাথার উপর; অতি সরু সুতোয় বাঁধা সেই অস্ত্র। আইনানুসারে শাস্তি বিধান করতে মহামান্য জুরীরা বাধ্য। বিচারের রথ আদালতকে চালিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। এখন আমার দায়িত্ব তাই প্রমাণ করা যে সেই শাস্তি আমার মক্কেলের প্রাপ্য নয় এবং সেই রথের চাকায় যদি আমার মক্কেল পিষ্ট হয় তাহলে বিচার ব্যর্থ হবে।

'মামলার শুরু থেকে অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে দিয়ে আমার মক্কেলের প্রতি সন্দেহ সত্যে পরিণত হতে আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট নেই। সত্যি আশ্চর্য এক আসামী এই দীপক দত্ত। একাধিক সাক্ষী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছে। তবুও তার সত্যিকার পরিচয় জানা যায়নি। 'জানা যায়নি' এ কথাটা আমি ইচ্ছে করেই একটু জোর দিয়ে বলছি ……বলছি কারণ আমার ধারণা যদিও বা আমরা দীপক দত্তের বাল্য বা কৈশোরের সম্যক পরিচয় পেয়ে থাকি, তরুণ দীপক দত্ত, পরিপূর্ণ পুরুষ দীপক দত্ত এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। এবং এই অসম্পূর্ণ পরিচয়ই আমাদের কাছে বর্তমানে অন্যতম প্রধান বাধা। বাধা, কারণ যে মানুষের অন্যায় ক্ষমাহীন, যার প্রাপ্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আমার মতে সেই মানুষের প্রকৃত পরিচয়টুকু জানা বিচারকদের প্রথম প্রয়োজন।

'নথীপত্রে লেখা হয়েছে আসামীর নাম দীপক দত্ত, সে জন্মাবধি অন্ধ-মূক ও বধির, তার বয়স সাতাশ এবং 'জলযাত্রা' জাহাজে গত ৫ই মে মিঃ রবার্ট বিচামের হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত।

'কিন্তু কে এই দীপক দত্ত? এই প্রশ্নের উত্তর, এই মানুষটির প্রকৃত পরিচয় আছে, 'নির্বাসিত আত্মা' উপন্যাসে। নিজের বুক চিরে অন্তরের গোপন রহস্য সকলের সামনে মেলে ধরেছে দীপক দত্ত। উপন্যাসের নায়ক লেখকেরই প্রতিচ্ছবি, দু'টি যেন যমজ ভাই। 'নির্বাসিত আত্মা' যিনিই পড়েছেন তিনিই জেনেছেন এই রহস্যময় মানুষটিকে। কিন্তু এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন পড়েছেন এই উপন্যাস? যিনিই পড়েছেন

তিনিই স্বীকার করবেন আমার মন্তব্যের সত্যতা।

'তিনিই স্বীকার করবেন যে জীবনের প্রথম দশটা বছর এক কারাগারে বন্দী হয়েছিল এই দীপক দত্ত। অনন্ত রাত্রির তমিস্রায় আচ্ছন্ন, নিশ্ছিদ্র, নিকষ কালো অন্ধকারের গর্ভে জন্মের পর থেকে দীর্ঘ দশ বছর বসেছিল এই হতভাগ্য বালক। পশু, পশুর মতন এক অন্ধকার গুহায় বন্দী হয়ে বসেছিল এই বালক, কিন্তু অন্তর তার কাঁদছিল—কখন আসবে তার জীবনে এক জীয়ন কাঠির স্পর্শ, শুনতে পাবে সে মুক্তির গান। ভাবনা, বিচার, বিশ্লেষণ এসবের সাধ্য তার ছিল না, চেতনার রাজ্যে ছিল গাঢ় কুয়াশার প্রলেপ—তবু, তবু অন্তর তার উদ্বেল হয়েছিল এক বোবা কান্নায়। এই সন্ধিক্ষণে সেই অন্ধকার বন্দীশালায় স্নেহ ও সহানুভূতির ভীরু প্রদীপ হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল একটি ছোট্ট মেয়ে। পাথরের রন্ধ্র ভেদ করে প্রদীপের শিখা গিয়ে পড়ল দীপকের অন্ধকার জীবনে, এই প্রথম জীবনের আহ্বান পেল সে।

'টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে আছে একটি বালক আর একটি বালিকা। ফাদার লরেন্সের চোখ দিয়ে দেখছি আমরা। কলকাতার বাড়িতে প্রথম পদার্পণের মুহূর্তে ফাদার লরেন্সের দেখা সেই দৃশ্য। বর্তমান নাটকের প্রয়োজনীয় পাত্র-পাত্রী এই তিনজনই—দীপক, রুবি আর ফাদার লরেন্স। এই মামলায় যা কিছু ভূমিকা এই তিন জনেরই। অন্যান্যেরা সম্পূর্ণ অবান্তর। প্রথম এদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে, প্রত্যেকের স্বরূপ দেখিয়ে, এই অবান্তরদের ভূমিকায় সমাপ্তিরেখা টেনে আমি এগিয়ে যাব আমার প্রধান লক্ষ্যে।

'প্রথম হচ্ছে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য। এদের প্রথম ছ'জনের সাক্ষ্যকে আমি বিশেষ আমল দিই না। ভাণ্ডারী মিঃ হোমস থেকে আরম্ভ করে মনস্তত্ত্ববিদ পুলিশ অফিসার ইত্যাদি প্রত্যেকেই নিছক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—হত্যার আবিষ্কার, সন্দেহক্রমে আসামীকে গ্রেপ্তার, তার কয়েদ ইত্যাদি। অবশ্য এইসব সাক্ষ্যের মধ্যেও কিছু ফাঁক আছে বিশেষতঃ হত্যা সংঘটনের ব্যাপারে। এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব। এখন আমি সাক্ষী মিঃ হেনরী বিচামের সাক্ষ্য দিয়ে আরম্ভ করছি!

'শোকার্ত পিতার মুখে নিহত পুত্রের এক হৃদয়গ্রাহী পরিচয় আমরা পেয়েছি। অকালে নিহত পুত্রের স্মৃতি বর্ণনায় যে কোন পিতাই ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হবেন ; মিঃ বিচামও হয়েছিলেন—তার বেশি কিছু নয়। তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থায় সাক্ষ্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও আমরা অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত—মানবিকতার বিচারে তাই করাই উচিত। আর একটা বিষয়েও আমি ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ পালিতের সঙ্গে একমত—মিঃ বিচাম কোনও প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে এতদূরে থেকে স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে আসেননি। আসামীর প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ তাঁর সাক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অপর-পক্ষে মিঃ বিচাম শুধু তাঁর নিহত পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেই সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই বিদেশে আসেননি। বিদেশ কথাটা ইচ্ছে করেই আমি ব্যবহার

করলাম। ব্যবহার করলাম, কারণ আমাদের সংগৃহীত, লণ্ডনের কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুসারে নিহত তরুণ মিঃ বিচাম তাঁর স্বদেশে বিশেষ সুনামের অধিকারী ছিলেন না—অন্তত তাঁর স্বনামধন্য পিতা যতটা বলেছেন ততটা তো নয়ই। পিতার পদাঙ্ক পুত্র বিন্দুমাত্র অনুসরণ করেননি। অতি অল্প বয়সে পুত্র রাজকীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় দেননি। পিতা পুত্রকে যোগ দিতে বাধ্য করেছিলেন। হ্যাঁ, বাধ্য করেছিলেন কারণ পুত্রের একাধিক নারীঘটিত কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে তাঁর সমাজে মুখ দেখানো দুর্ঘটনা হয়ে উঠেছিল। জীবনের সোজা রাস্তায় না গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল তরুণ পুত্র ধরেছিল নৈশ পানশালা আর বারবণিতার বিলাস কক্ষের সর্পিল পথ। তারপর সৈনিক হিসাবে সে সুনাম এবং সম্মান দুই পেয়েছিল, এটুকু ঠিকই। কিন্তু যুদ্ধ প্রত্যাগত যে সেবাব্রতী, দায়িত্বশীল তরুণের বর্ণনা পিতা দিয়েছেন সেটা ঠিক নয়। যুদ্ধের পর লণ্ডনের সমাজে যে রবার্ট বিচামকে দেখা গিয়েছিল সে একটি নারীলোলুপ দুরন্ত, দুর্মদ তরুণ।

'এই সময়েই তাঁর আলাপ হয়েছিল ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম লোলার সঙ্গে। সমাজে এই অভিনেত্রীটির বিশেষ সুনাম ছিল না। একাধিক ধনীর সন্তান নিঃস্ব হবার পর এই মাদামের রূপের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন মিঃ রবার্ট বিচাম। শুধু জড়িয়েই পড়েননি, ডুবে যেতে বসেছিলেন—মাদামকে বিয়ে করবার জন্যে উন্মত্ত হয়েছিলেন তিনি। পুত্রের এই পতনে পিতা প্রথমটা দিশেহারা হয়েছিলেন, পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে ও বংশের মর্যাদাহানির আশঙ্কায়। তারপর অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর পুত্রকে কিছুদিনের জন্যে ভারতবর্ষে গা ঢাকা দিতে রাজী করেছিলেন তিনি। এই ব্যবস্থার ফলে 'জলযাত্রা' জাহাজের যাত্রী হয়েছিলেন মিঃ রবার্ট বিচাম।

'এই বিবরণটুকু আমায় দিতে হলো যাতে আমার পরবর্তী বক্তব্য অনুসরণে কারুর অসুবিধা না হয়। তাছাড়া আর একটা কারণও আছে। ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁসুলী এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল দু'জনেই আদালতের সামনে দেখাতে চেয়েছেন যে আমাদের দেশের প্রতি ভালোবাসার টানেই সেবার ব্রত নিয়ে এখানে আসছিলেন নিহত মিঃ বিচাম। কিন্তু সত্যি কথা তা নয়। সত্যি কথা হচ্ছে—একেবারে শেষ মুহূর্তে স্থির করা হয় এই বিদেশভ্রমণ এবং এই ব্যবস্থার পিছনে ছিল এক নটীর করালগ্রাস থেকে অধঃপতিত পুত্রকে রক্ষা করার জন্য পিতার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা। আরও একাধিক কারণ ছিল যা আমি যথাস্থানে আদালতকে জানিয়ে দেব, নিহত মিঃ বিচামের চরিত্রটি যে এখনকার মতন সম্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

'এই সঙ্গে ফরিয়াদী পক্ষের যত্নে গড়া এই মামলার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বালির প্রাসাদও নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেশহিতৈষণা, বীর সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যু, সুবিচারের আশায় সাগরপারের এক জাতির উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা এসবের প্রশ্ন আর থাকবে বলে মনে হয় না। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সমাবেশ সব দেশের মানুষের জীবনেই আছে। মিঃ বিচামের মৃত্যুর মতন শোকাবহ এবং

শোচনীয় অসংখ্য সব দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে বিশ্বময়। কোনও সভ্য জাতিই এই সাধারণ সব ঘটনাকে অসাধারণের পর্যায়ে তোলার মতন চটুলতার প্রশ্রয় দেয় না। মিঃ হেনরী বিচাম যদি শুধু সুবিচারের আশায় এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে থাকেন তো ভালই। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠাপন্ন পিতার পক্ষে পুত্রের প্রকৃত চরিত্র যাতে প্রচারিত না হয়, সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হওয়াও স্বাভাবিক। তবুও আমার মনে হয় তিনি আর একটু সংযমের পরিচয় দিলে ভাল করতেন। জোর করে, শুধু কথার জোরে কিছু প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে প্রায়ই বিফল হতে হয়। দায়িত্বশীল মিঃ বিচামের সাক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা এইখানেই শেষ। এইবার মিসেস কল্যাণীর সাক্ষ্যে আসা যাক।

'মিসেস কল্যাণীর সাক্ষ্যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের প্রকাশ নিশ্চয়ই কারুর চোখ এড়ায়নি। ভায়ের বিরুদ্ধে সহোদরার এই অভিযোগ শুনতে শুনতে আমার বার বার মনে হয়েছে—ভাই হয়তো বোনকে ভালোবাসে না কিন্তু এ কি রকম বোন যার অন্তরে ভায়ের প্রতি এক কণাও স্নেহ বা সহানুভূতি নেই! প্রত্যেকটি কথায় পঙ্গু ভায়ের প্রতি ঘৃণা উথলে উঠতে দেখে বিস্মিত হয়ে এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। মহিলাটির সাক্ষ্যেই পেয়েছি তাঁর অস্বাভাবিক মনোভাবের অন্তর্নিহিত সেই কারণ। স্বার্থপরতা আর দম্ভ—দুই অনুভূতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এই মহিলার জীবন। পঙ্গু ভায়ের প্রতি ঘৃণার মূলে আছে স্বার্থপরতা, আর দম্ভ তাঁর দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তবে স্বার্থপরতার প্রভাবই বোধ হয় বেশী। তাই যে স্বামীর জীবনে স্থান পাননি, সেই স্বামীর কাছে আদায় করেছেন জুডিসিয়াল সেপারেশন এবং তাঁরই মোটা মাসোহারায় স্বচ্ছন্দ বিলাসের জীবন যাপনে কুণ্ঠা নেই এঁর। অবশ্য গভর্নেসের মেয়েকে বিয়ে করাও ভায়ের প্রতি বিরাগের একটা কারণ। এখানেও সেই দম্ভের খেলা। স্বার্থপর এবং দাম্ভিক এই মহিলার বক্তব্যের কোনো মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না; আশা করি জুরী মহোদয়ও আমার সঙ্গে একমত হবেন।

'এইবার দীপকের ভগ্নীপতির সাক্ষ্য। বালক দীপকের প্রতি পরিবারের সকলের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের কথা শুনিয়ে সাক্ষী আমাদের প্রথমেই মোহিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উচ্চ মনোভাবের মুখোশ খসে পড়তে দেরী হয়নি। কল্পিত ভয়ে যিনি বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন, তাঁর প্রতি আর যাই হোক ভদ্র সমাজ শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হবে। আর ভয়টা কি, না শ্যালকের পঙ্গুতা তাঁর সন্তানেও বর্তাতে পারে। এর চেয়ে হাস্যকর কল্পনা কিছু হতে পারে না এবং তাও বিয়ের পর এবং পিতামাতার প্ররোচনায়। এমন যে একটি ভালোমানুষ বাধ্য নিরীহ চেহারার ভদ্রলোক, তিনি কি না এলেন আদালতে সাক্ষী হয়ে; উদ্দেশ্য পরিবারের সকলের প্রতি আমার মক্কেলের বাল্যের মনোভাব আদালতকে জানিয়ে দেওয়া। আমার কথা হচ্ছে এটুকু জানাবার জন্য এমন এক দুর্বলচিত্ত অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে না আনলেও চলতো।

'মিসেস বসাকের সাক্ষ্যেরও কিছু গুরুত্ব নেই। বালক দীপকের প্রতি এই মহিলার স্নেহের অভাব ছিল না—নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা। কিন্তু হঠাৎ অবস্থাটা বদলে গেল। বদলে গেল, দীপকের সঙ্গে রুবির বিয়ের প্রস্তাব ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক কষ্ট করে মেয়েকে মানুষ করেছিলেন মিসেস বসাক। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে তাঁর, এমন মেয়েকে কেন্দ্র করে বড়লোকের বাড়ীর সামান্য গভর্নেসের রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাই স্বাভাবিক। শিক্ষিত, ধনী সমাজে প্রতিষ্ঠাবান এক মনের মতন জামাই হবে তাঁর ; মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনিও অভিজাত শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু স্বপ্ন তাঁর সফল হলো না ; মেয়ে দীপককে বিয়ে করতে উদ্যত হলো। এই আশাভঙ্গের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে আদালতে এসেছিলেন মিসেস বসাক।

'ক্ষোভ তাঁর প্রধান শত্রু দীপকের বিরুদ্ধে! সেই কেড়ে নিয়েছে তাঁর মেয়েকে। মিসেস বসাকের দ্বিতীয় শত্রু হচ্ছেন ফাদার লরেন্স। তিনিই যাদু করেছিলেন তাঁর মেয়েকে। যে প্রধান শত্রু—তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও, আনুপূর্বিক ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও এটুকু তিনি ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি যে হত্যা দীপকই করেছে। দীপকের অর্থাৎ এই শত্রুর দণ্ড হলে মেয়েকে আবার নিজের মুঠোয় ফিরে পাবেন তিনি। এই সব ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষোভ সাপের বিষের চেয়েও সাংঘাতিক ; অন্ধ এদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি। এই প্রতিহিংসার বশেই শাশুড়ী এসেছিলেন জামাই-এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে।

'এইখানে আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্তের একটু আভাস দিয়ে রাখছি। 'নির্বাসিত আত্মা' উপন্যাসের অন্ধ-মূক-বধির নায়ক কেন যে তার পরিবারের সকলের প্রতি বিরূপ ছিল তা আর এখন বুঝতে কষ্ট হবে না। লেখকের পক্ষে অন্য কিছু বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমরাই অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। বার বার মনে হচ্ছে—সত্যি কি বিচিত্র এক পরিবার আর কি অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিল বালক দীপক।

'সুবীর সরকারের সাক্ষ্য কিন্তু খুব সহজে বরবাদ করে দেওয়া যাবে না। যাবে না কারণ অত্যন্ত সুনিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য পেশ করে গেছেন মিঃ সরকার এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে সকলকে চমকিতও করেছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছেন মিঃ সরকার। যে অগ্নি-কাণ্ডকে তিনি বন্ধুর ঈর্ষার ফল বলে দেখাতে চেয়েছেন সেটা যে তাঁরই প্রতিহিংসার প্রচেষ্টা এইটুকু প্রমাণ করা খুব কঠিন হবে না।

'দীপকের প্রতি রুবির প্রেমের সবিস্তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এটুকু বললেই হবে যে কিশোরীর মনের স্নেহ ও সহানুভূতিই ধীরে ধীরে একদিন তরুণীর ব্রতী মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছিল। ফাদার লরেন্সের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব শোনা পর্যন্ত সে প্রেমের স্রোতে বাধা পড়েনি। বরঞ্চ তখন আশা ও আশঙ্কার উপলখণ্ডে আঘাত পেয়ে সঙ্গীতমুখর হয়েছিল সেই তীব্র ভাবধারা। এ পর্যন্ত কোনো জটিলতাই ছিল না। কিন্তু এর মাঝপথে মিঃ সরকারই জটিলতার সৃষ্টি করলেন ; রুবির প্রতি প্রেমে হাবুডুবু খেতে

লাগলেন ভদ্রলোক। রুবির পক্ষে তাঁর এই মনোভাবের প্রতি সদয় হওয়া সম্ভব ছিল না। আজও আপনারা রামপুরহাটে গেলে দেখতে পাবেন সেখানকার প্রত্যেকটি বাসিন্দার মনে কি অক্ষয় স্মৃতি রেখে এসেছে রুবি দত্তের স্নেহমধুর, সলজ্জ ব্যবহার। ফাদার লরেন্স বা ডাঃ সেনের অনুমান ব্যর্থ হয়নি। নারীর কল্যাণী স্পর্শে নতুন এক আনন্দের, প্রেরণার হাওয়া বয়েছিল আশ্রমের নিয়মের ছককাটা একঘেয়ে জীবনে! এই স্নেহস্পর্শই মোহস্পর্শে রূপান্তরিত হয়েছিল মিঃ সরকারের জীবনে।

'মোহ থেকে ঈর্ষা বেশী দূরের পথ নয়, তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে তো নয়ই। মিঃ সরকারেয় ক্ষেত্রে ঈর্ষার দুটো কারণ ছিল। প্রথম, ব্যর্থ প্রেম আর দ্বিতীয়, তাঁরই 'হাতে গড়া' দীপক অন্যের—তাঁরই আকাঙ্ক্ষিত নারীর আয়ত্তাধীন হওয়া। একই সঙ্গে প্রিয়া ও প্রিয় দু'জনের দূরে চলে যাওয়া।

'ঈর্ষার ফলেই অসংখ্য পরস্পরবিরোধী উক্তি করেছেন মিঃ সরকার। বর্তমান সাক্ষ্য রুবির প্রতি তাঁর ঘৃণামিশ্রিত প্রেমের এক অভিনব অভিব্যক্তি। হতাশপ্রেমিক এই ভদ্রলোক সাক্ষ্যের সুযোগে রুবির প্রতি বিদ্বেষের বিষ নিক্ষেপের লোভ সামলাতে পারেননি। রামপুরহাট ছাড়ার পর এই বিদ্বেষ ঘনীভূতই হয়েছিল, কালের গতিতে মন্দীভূত হয়নি। লেখক হিসাবে দীপকের সুনাম ও সম্মান ঘৃতাহুতির কাজ করেছিল। রুবিকে পাবার সব আশা নির্মূল হয়েছিল বলেই অন্তরের পুঞ্জীভূত ঈর্ষার বিষ উদ্গীরণের এই শেষ চেষ্টা মিঃ সরকারের।

'রুবি এবং দীপকের বিবাহ-বাসরে মিঃ সরকার উপস্থিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে অন্তরের টানে নয়—ফাদার লরেন্সের একান্ত অনুরোধে। তাঁর চাকরী করে দিয়েছিলেন ফাদার লরেন্স। সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাই মিঃ সরকারকে বাধ্য করেছিল এই উৎসবে যোগ দিতে। ঈর্ষার আগুন মনে ধিকি ধিকি ঠিকই জ্বলছিল। জাহাজে হত্যার খবর, দীপকের গ্রেপ্তার জানার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠল সেই আগুন। বিবেক, সমাজের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু বড় কথা দিয়ে মনের বিষকে ঢাকা যায় না। দীপকের প্রতি বন্ধুত্বের সামান্যতম রেশ তাঁর মনে থাকলে এই বিষকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারতেন না।

'এই পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ সরকার বর্ণিত অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিসেস দত্তের সামান্য সংক্ষিপ্ত উক্তিই তাঁর এই কাহিনী যে কতবড় মিথ্যা তা প্রমাণ করেছে এই ইঙ্গিত দিয়ে যে আগুন লাগাবার পিছনে হাত ছিল মিঃ সরকারের। পরিশেষে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ফরিয়াদী পক্ষ আসামীর স্বভাবের হিংস্র দিক দেখাবার জন্য মিঃ সরকারের মতন একজন কূটবুদ্ধি ব্যক্তির কুমতলবকে প্রশ্রয় না দিলেই ভালো হতো।'

এই পর্যন্ত বলার পর একটু থামল বিপ্রদাস। চশমাটা খুলে আস্তে আস্তে বেশ ভাল করে বার কয়েক মুছে নিল। ধীরে সুস্থে নাকের ডগায় বসিয়ে নিল চশমাটা। তারপর আবার শুরু করল:

'আসামী পক্ষের সাক্ষ্যও যে আমার মক্কেলের পক্ষে বিশেষ আশান্বিত হবার মতন কিছু হয়েছে তা নয়। মক্কেলের মা, ফাদার কোলম্যান বা ডাঃ সেন—এঁদের প্রত্যেকের আন্তরিকতা বা শুভকামনায় সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস মায়ের উদ্বেল স্নেহ, হাস্যমুখ ফাদারের সদিচ্ছা এবং বিজ্ঞ ডাক্তারের গবেষণা, এর কোনোটাই জুরী মহোদয়ের মনকে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত করতে পারেনি। সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য পরোক্ষে ব্যর্থ হয়েছে।

'মায়ের উক্তির মধ্যে অনুতপ্ত একটি নারীর অন্তরের হাহাকার সকলকেই অভিভূত করেছে নিশ্চয়। প্রথম দশ বছর কাছে পেয়েও অসহায়, পঙ্গু সন্তানের প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া এই অনুতাপ। ছেলে দূরে যেতে তিনি মাঝে মাঝে তার কাছে ছুটে গেছেন ঠিকই। প্রবাসী সন্তানের প্রতি স্নেহের টান হয়তো স্বাভাবিকও; দূরত্ব অনেক ভুল দূর করে দেয়। কিন্তু তবুও সন্তানের প্রতি তাঁর প্রথম দশ বছরের ব্যবহার ক্ষমার অতীত! নারীর এই স্নেহহীন নিষ্করুণ রূপের নামই রাক্ষসী। তীক্ষ্মবুদ্ধি বালকও তার মায়ের এই রাক্ষসীর রূপকে চিনতে পেরেছিল, সরে দাঁড়িয়েছিল মায়ের স্পর্শ থেকে দূরে, অনেক দূরে। ফাদার লরেন্স বা ডাঃ সেন কেউই পারেননি মা আর ছেলের মাঝে মিলনের সেতু বাঁধতে। পারা সম্ভবও ছিল না। সম্ভব যে ছিল না তার প্রমাণ আমরা এই মামলার মধ্যেই পেয়েছি। দেখেছি মায়ের করুণ কান্না সন্তানের নীরব উপেক্ষার প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরেছে, ব্যর্থ হয়েছে।

'সন্তানের নির্দোষিতা সম্বন্ধে মায়ের অন্তরের বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর ভাবাবেগের উৎস অন্যখানে। ভদ্রমহিলার আভিজাত্য দু'টি কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রথম, সন্তানের হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়েছেন তিনি এবং সেই শূন্যস্থান জুড়ে বসেছেন ফাদার লরেন্স। দ্বিতীয়—এমন একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে তাঁর নাম।

'এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে যে এমন সাক্ষীকে আমি মনোনীত করলাম কেন? করলাম কারণ সন্তানের দুঃসময়ে মাকে সন্তানের পাশে এসে দাঁড়াবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে আমি চাইনি। এই মামলায় আমার মক্কেলের মা ও বোন দুজনেই অনেক অবান্তর কটূক্তি বর্ষণ করেছেন। বোনের কটূক্তির মধ্যে যা ছিল তা শুধু ঘৃণা, স্বার্থপর আবিল অন্তরের নোংরা আবর্জনা। মা কিন্তু অনুতাপের আবেগে উদ্বেল হয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলেন। এই অভিব্যক্তির মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা ছিল না। আর এইটুকুতেই খুশী হয়েছি আমি। খুশী হয়েছি এই দেখে যে পরিবারের একজনও আমার মক্কেলের প্রতি অতীতের অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে, দেরীতে হলেও, সচেতন হয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে আমি চেয়েছিলাম শুধু এই অনুতাপের অভিব্যক্তিটুকু।

'বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া সন্তানের স্বভাব মায়ের চেয়ে বেশী আর কে জানবে? সেই মা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে তাঁর সন্তান নির্দোষ। মায়ের সমস্ত সাক্ষ্যের

মধ্যে শুধু এই ক'টি কথাই আমার কাছে মূল্যবান।

'সহাস্য ফাদার কোলম্যান সরলভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনায় বিশেষ গুরুত্ব নেই। দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাই—তিনি তার বেশী কিছু জানবার বা জানাবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আমার মক্কেলের রঙ সম্বন্ধে ধারণার কথা আদালতকে জানিয়ে মামলার পর্যালোচনায় নূতন আলোকপাত করেছেন তিনি।

'রঙ সম্বন্ধে আমার মক্কেলের ধারণা সঠিক নয়; সঠিক হলেই অবশ্য আশ্চর্য হতে হতো। ঘ্রাণ আর আস্বাদের সাহায্যে মনগড়া গোটাকতক রঙের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। কোনো বস্তুর অস্তিত্ব জানার সঙ্গে সঙ্গেই এই কল্পিত রঙের একটা তাতে আরোপ করা তার স্বভাব। আমি আগেই বলেছি—বর্তমান হত্যা-নাটকে এই এলোমেলো রঙের ধারণার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। কি সে ভূমিকা তা প্রকাশের আর বিলম্ব নেই। তার আগে দুটো কথা জুরী মহোদয়কে জানিয়ে রাখতে চাই আমি। সাক্ষী মিসেস্ রুবি দত্তকে কেন্দ্র করে আমার পরীক্ষায় দুটো জিনিস প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম, স্ত্রীর গলায় জড়ানো সিল্কের স্কার্ফটার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ আছে আমার মক্কেলের। দ্বিতীয়, হাতের চেটোয় 'সবুজ' এই কথাটার সংকেত আঁকা হলেই ভয়ে শিউরে ওঠে সে। সবুজ রঙের প্রতি এক অদ্ভুত বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে আছে এই মানুষটির অন্তর। অবশ্য সবুজ রঙের স্কার্ফ তার স্ত্রীর গলায় ছিল না। এইখানে এটুকু স্বীকার করাও আমার উচিত যে মিসেস দত্তকে ধূসর রঙের স্কার্ফ পরে আদালতে আসতে আমিই বলেছিলাম। আমার পরীক্ষার প্রয়োজনেই বলেছিলাম।

'ডাঃ সেনও ফাদার কোলম্যানের মতনই সম্পূর্ণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই আদালতে এসেছিলেন। সংস্কারমুক্ত সহজ সরল মন এই বৈজ্ঞানিকের। আমার মক্কেলের জীবনের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অসামান্য। দীর্ঘকাল অসীম স্নেহ-যত্নে এক পঙ্গু বালককে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই ডাঃ সেন আর ফাদার লরেন্স। ডাঃ সেনের সাহায্য না পেলে ফাদার লরেন্স তাঁর সাধনায় সফল হতেন কি না সন্দেহ। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত সত্যে বিশ্বাসী এই ডাঃ সেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত তাঁর প্রতিটি মতামত। সেই মতামতকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। মাতৃ স্নেহবঞ্চিত দীপকেব শূন্য অন্তর পূর্ণ হয়েছিল মিস রুবি দত্তের স্নেহ ও প্রেমে। দীপকের অন্ধকার জীবনে এই দীপ জ্বালানোর অনেকটা কৃতিত্বই ডাঃ সেনের প্রাপ্য। এই সকল মিলনের ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার জন্য ডাঃ সেন অবশ্যই আমার প্রশংসা দাবী করতে পারেন। বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের এক বিশিষ্ট অবদান এই দীপক দত্তের জীবন।

'ডাঃ সেনের বৈজ্ঞানিক মন কিন্তু এক জায়গায় একটু ভুল করেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতি-বিশ্লেষণই এই ভুলের জন্য দায়ী। আমার মক্কেলের আঙুলের ছাপ আর স্বেচ্ছাস্বীকৃতি—এই দুই বাস্তব সত্যের সামনে দিশেহারা

হয়ে পড়েছিলেন ডাঃ সেন। ফলে হত্যার একটা মনগড়া সম্ভাব্য কারণ খাড়া না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হয়নি তাঁর বৈজ্ঞানিক মন। সেই সম্ভাব্য কারণ তিনি আদালতকে জানিয়েছেন এবং ফলে পরোক্ষে হত্যার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন আমার মক্কেলের কাঁধে। নিজের এই ভুল বুঝতে পেরে পরমুহূর্তেই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে হাল্কা করার চেষ্টা তিনি করে গেছেন, তা ঠিকই। তবুও তাঁর ভুলের ফসল ফলতে দেরী হয়নি।

'এমন ফসল কুড়িয়ে নেবার লোকেরও অভাব হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয়নি। অ্যাডভোকেট জেনারেলের সওয়ালই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; তাঁর সিদ্ধান্ত ডাঃ সেনের মনগড়া কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু মনগড়া কাহিনীও সম্পূর্ণ সত্য বিবর্জিত নয়। ডাঃ সেন বলেছেন—রুবির প্রতি দীপকের আকর্ষণের তীব্রতা অনুমান করা কঠিন নয়। তার কাছে রুবি শুধু আনন্দের উৎস নয়, প্রকৃষ্ট আশ্রয়ও। এ বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ নয়, এ স্নেহপ্রবণ একটি মানুষের অন্তরের অনুভূতির কথা। আর এইখানে ডাঃ সেন হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই এক পরম সত্যের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মক্কেল হত্যা করেনি। এই হত্যা-নাটকের আগাগোড়া তার একমাত্র অপরাধ সমস্ত দোষ নিজের উপর নেবার অদম্য প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার পেছনে আছে, প্রয়োজন হলে তার আত্ম-বিসর্জনের লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞাও। যে স্বামীর কাছে তার স্ত্রী 'শুধু আনন্দের উৎস নয়, প্রকৃষ্ট আশ্রয়ও' সেই বুঝি পারে এমন চরম ত্যাগের আহ্বানে সাড়া দিতে। কিন্তু তাহলে, হ্যাঁ, মিসেস রুবি দত্তের এক প্রধান ভূমিকা আছে এই হত্যা-নাটকে। এইবার তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় আমি আসছি···

'জাহাজের কোষাধ্যক্ষ এবং কাপ্তেন দু'জনেই জাহাজের 'সেলে' হত্যাপরাধে ধৃত দীপক দত্তের সঙ্গে তার স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর সেই সাংকেতিক কথোপকথনের নীরব সাক্ষী ছিলেন এই দু'জন ব্যক্তি। হাতের ভাষায় কি কথা হয়েছিল দু'জনের? মিসেস দত্তর মুখে আমরা শুনেছি, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—বল দীপক, যে তুমি খুন করোনি? স্বামী সাংকেতিক ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন—উতলা হয়ো না। আমি সব দায়িত্ব নেব। আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু এই কথাগুলো না বলে সে যদি বলে থাকে—'আমি জানি তুমি দোষী, তবু উতলা হয়ো না! ওই লোকটাকে হত্যা করে ঠিকই করেছো···এখন শুধু চুপ করে থাকো, আমি তোমায় বাঁচাবো।' এই উত্তরটুকু, এই সামান্য ক'টি কথায় মনগড়া কাহিনীর তাসের প্রাসাদ অবশ্যই আর অটুট থাকছে না। হত্যা-নাটকের গতি-পথটাই আকস্মিকভাবে বদলে যাচ্ছে। তা যাক, তবু আসামী পক্ষের ধারণা এই উত্তরই দিয়েছিল দীপক দত্ত। ফরিয়াদী পক্ষ বিস্মিত হয়েছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আসামীর স্ত্রীই কি কম বিস্মিত হয়েছিল! দোষী? হ্যাঁ সে দোষী তাতে সন্দেহ ছিল না কিন্তু তার স্বামী যে অর্থে ভেবেছিলেন, সে অর্থে নয়। আর দীপক দত্ত! স্ত্রীর হত্যাপরাধের অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিল সে;

তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে তার প্রিয়তমা রুবিই হত্যা করেছিল মিঃ রবার্ট বিচামকে। আজও কোনো সন্দেহ নেই দীপক দত্তের মনে। ওর দিকে একবার চেয়ে দেখুন, আমার কথা শুনতে কি ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠেছে ও। ওর নিস্তরঙ্গ নির্বিকার মুখে জেগে উঠেছে অসংখ্য আশঙ্কার রেখা। সত্যিই আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও। রুবির, ওর জীবনের একমাত্র আনন্দ ও আশ্রয়—ওর প্রিয়তমা স্ত্রীর কীর্তি-কাহিনী প্রকাশ হবার ভয়ে কাঁপছে ওর বুক। এই মুহূর্তে ও ভাবছে, এই বুঝি গেঁয়ো, গায়েপড়া ব্রীফ্‌লেস্ ব্যারিস্টারটা ছিন্ন করে দিলে তার এত যত্নে গড়ে তোলা মিথ্যার আবরণ।

'হ্যাঁ, মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করে সত্যকে প্রকাশ করবো আমি। সে সত্য হচ্ছে যে রুবি দত্ত মিঃ বিচামকে হত্যা করেনি। আর তা হলেই এই সাংঘাতিক মিথ্যাকে বুকে নিয়ে অমানুষের মুখোশ পরে থাকতে হবে না দীপক দত্তকে। মিথ্যা, সকলকে মিথ্যা বলেছে. মুখোশ পরে একের পর এক উকিল, ব্যারিস্টার, শুভার্থীকে ভয় দেখিয়েছে, বিপথে চালিত করেছে, এই দীপক দত্ত। প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে আক্রমণ করেছিল ও। ওর উদ্দেশ্য ছিল কারুকে ওর ওই যত্নে গড়া আবরণের কাছে না আসতে দেওয়া। দু'জন ব্যারিস্টার হতাশ হয়ে ত্যাগ করেছিলেন ওর মামলার দায়িত্ব। আমি কিন্তু হতাশ হইনি। ওর ওই মিথ্যার আবরণ, স্তব্ধতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম আমি।

'এই মামলার মধ্যেই দু'বার চেষ্টা করেছি আমি এবং প্রত্যেকবারই আশাতীত ফল পেয়েছি। প্রথম ফাদার লরেন্সের স্পর্শে দীপক দত্তের চোখের কোল বেয়ে নেমেছিল অশ্রুর ধারা। ওর অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনার প্রকাশ এই অশ্রু। আর দ্বিতীয়বার স্ত্রীর সিল্কের স্কার্ফ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে উথলে উঠেছিল ওর সেই অসহায় অকৃত্রিম ক্রোধ—নির্যাতিত হৃদয়ের এক বোবা কান্না। ওই যে মিঃ বিচামের কেবিনে বসে শুরু হয়েছে ওর এই অভিনয়। পশুত্বের আড়ালে স্বেচ্ছায় লুকিয়ে আছে মানুষ দীপক দত্ত। পশু ও হতে পারে না তা নয়। জীবনে একবার প্রকাশিত হয়েছিল ওর সেই দানবের রূপ। কবে তা ও জানে, আমিও জানি। এই হত্যা-নাটকে যবনিকা পাতের পূর্বে সেটুকুও আর গোপন থাকবে না। কিন্তু তার আগে মুখোশের আবরণ সরিয়ে আমার প্রকাশ করতে হবে মানুষ দীপক দত্তকে।

'আমি বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে কি অসম্ভব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে আমার মক্কেল। ওর মূক অন্তরের প্রশ্ন যেন আমি শুনতে পাচ্ছি—হত্যাই যদি করেনি রুবি, তবে তার অপরাধটা কি? উত্তর আমি এখনই দিচ্ছি। ভুল, একটা বিরাট ভুলের ওপর সৃষ্টি হয়েছে অপার রহস্য আর অসংখ্য জটিলতা। সৃষ্টি করেছে দীপক দত্ত নিজেই। ওর স্বার্থের পানে চেয়েই আমাকে ছিন্ন করতে হবে রহস্যজাল, ধীরে ধীরে খুলতে হবে এক একটি জটিল গ্রন্থি। হয় আমার নির্দোষ মক্কেলকে সঁপে দিতে হবে ফরিয়াদী পক্ষের প্রার্থিত 'মৃত্যুদণ্ডের' কবলে আর নয়তো সর্বসমক্ষে ওই পত্নীগতপ্রাণ স্বামীকে জানাতে হবে তার

স্ত্রীর কীর্তি-কাহিনী। আমি জানি কি কঠিন আঘাত পাবে দীপক দত্ত। কিন্তু সত্যকে প্রকাশিত না করেও উপায় নেই।

'মিথ্যা শুধু আমার মক্কেলই বলেনি। মিথ্যার আশ্রয় মিসেস রুবি দত্তও নিয়েছেন। আগেই বলেছি আমি, জাহাজে তাঁর হাতে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা স্বামীর উত্তরকে বিকৃত করে প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু কেন হলো এই মিথ্যার প্রয়োজন?

'স্বামীর উত্তর শুনে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন রুবি দত্ত। সামলে ওঠবার পরই তাঁর বুকের সব ভার মুক্ত হয়ে বের হয়েছিল একটি স্বস্তির নিশ্বাস। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন রুবি দত্ত, নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন স্বামী তাঁর গোপন কীর্তি-কাহিনী, মনের পাপ জানতে পারেননি জেনে। সত্যিই জানতে পারেনি দীপক দত্ত। স্ত্রী হত্যা করেছে জেনে বরঞ্চ খুশী হয়েছিল সে। এই হত্যার মাঝে সে পেয়েছিল এক অমূল্য সম্পদ—তার প্রতি স্ত্রীর অগাধ প্রেমের, আদর্শ একনিষ্ঠতার প্রমাণ। কি তীব্র প্রেমের প্রেরণা থাকলে তবে হত্যার মাঝেও স্বামী খুঁজে পায় তার স্ত্রীর চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ! নিহত মিঃ বিচামের কেবিনে বসে স্ত্রীর মাঝে দীপক দত্ত দেখেছিল এক মহীয়সী নারীর রূপ—যে নারী নরহত্যা করবে তবু পাপের পঙ্কিল পথে পা বাড়াবে না—হবে না স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী। সেই মুহূর্তেই সে স্ত্রীকে বাঁচানোর দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল তার ঘাড়ে। আর এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছিল তার উত্তরে—'আমি জানি তুমি দোষী; তবু উতলা হয়ো না। ওই লোকটাকে হত্যা করে ঠিকই করেছো···এখন শুধু চুপ করে থাকো, আমি তোমায় বাঁচাবো।' দীপকের মতন ভালোবাসলেই তবে বুঝি প্রস্তুত হওয়া যায় এমন চরম আত্মত্যাগের জন্য! কিন্তু কতটুকু মূল্য পাবে এই প্রেম যখন প্রমাণ হবে যে হত্যা রুবি দত্ত করেনি, করেছে অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি! কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি? আবার বলছি আমি, মিঃ বিচামকে হত্যা করা তিনজনের পক্ষে সম্ভব। প্রথম দীপক দত্ত—প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পথ থেকে সরানোর জন্য। দ্বিতীয় রুবি দত্ত—এক অবাঞ্ছিত এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আশায়। আর তৃতীয় প্রকৃত হত্যাকারী—যার উদ্দেশ্য প্রকাশিত হতেও আর বিলম্ব নেই।

'কথাগুলো নিশ্চয়ই কাল্পনিক মনে হচ্ছে। দীর্ঘ বক্তৃতায় বিরক্তও হচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে, পিছিয়ে যেতে হবে 'জলযাত্রা' জাহাজে, যে জাহাজে দীপক দত্ত সস্ত্রীক ফিরে আসছিল তার স্বদেশে।

'দীপক দত্ত এবং তার স্ত্রী দুজনেই আর একটা মিথ্যা শুনিয়েছে আদালতকে, মিঃ বিচামের সঙ্গে তাদের পূর্ব-পরিচয়ের কথা অস্বীকার করে। এইখানে আমি অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে একমত যে এই দম্পতির সঙ্গে বিলাতে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল নিহত মিঃ রবার্ট বিচামের। গতকাল সকালে লণ্ডন থেকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ পেয়েছি আমি যে এই দম্পতির প্রতি এক বিশেষ অনুরাগ ছিল মিঃ রবার্ট বিচামের। অবশ্য

মিঃ বিচাম সম্বন্ধে এই দম্পতির মনোভাব কিছু জানতে পারিনি। তবে সেটা জানাও বিশেষ কঠিন হবে না। আদালতের আদেশ পেলে আর একবার সাক্ষ্যের জন্য মিসেস রুবি দত্তকে ডাকতে চাই আমি।'

যথাবিধি পরামর্শের পর আদেশ দিলেন বিচারপতি। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ মেলে এসে দাঁড়ালেন রুবি দত্ত।

সাক্ষীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল বিপ্রদাস, 'আপনার এবং আমার স্বার্থে অর্থাৎ আপনার স্বামীর মুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্যেই আপনাকে আবার কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি মিসেস দত্ত। মাননীয় বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন যে ইংলণ্ডে দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রবাস-জীবনে আপনার সঙ্গে কোনোদিন মিঃ রবার্ট বিচামের দেখা হয়নি। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। আমি বলছি আপনি মিথ্যা বলেছেন। কেম্ব্রিজে একটা বক্তৃতার শেষে আপনাদের দু'জনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন মিঃ বিচাম। তারপর দীর্ঘ এক বছর ধরে নানা সূত্রে আপনাদের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন এই তরুণ ইংরাজ। ভ্রমণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করে, নানা বিষয়ে সাহায্য দিয়ে অনেক উপকার আপনাদের করেছিলেন তিনি। ঠিক বললে বলতে হয়, আপনার সঙ্গেই বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন মিঃ বিচাম। তাঁর সঙ্গে মোটরে পাশাপাশি বসে পথ চলার কত আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতিতে এখনও ভরপুর হয়ে আছে আপনার অন্তর। অল্প কয়েকদিনেই সুদর্শন মিঃ বিচামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন আপনি। তরুণ ইংরাজের প্রেমাতুর চোখের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট করেছিল আপনাকে। অতৃপ্ত এক কামনার জ্বালায় জ্বলছিল আপনার সারা সত্তা—পুরুষের প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিজের যৌবন-পুষ্পিত-তনু তুলে ধরার কামনা। স্বামীর প্রতি আপনার স্নেহের অন্ত ছিল না ঠিকই কিন্তু তারই মধ্যে একটু বিরাগও ছিল। কিছুতেই আপনি ক্ষমা করতে পারেননি স্বামীর দৃষ্টিহীনতার অভিশাপ, ভুলতে পারেননি যে আপনার এই অপার্থিব সৌন্দর্য কোনও দিনই সিক্ত হবে না এই মানুষটির প্রেমবিহ্বল দৃষ্টির সুধায়। এই মানুষটির সঙ্গে মিলনের পূর্বক্ষণে প্রেমের স্নিগ্ধ আলোয় ছেয়ে ছিল আপনার অন্তর। কিন্তু তারপর? তারপর ধীরে ধীরে বিরাগের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হলো সেই আলোর ক্ষীণ রেখা। মিঃ বিচাম আপনার জীবনে যখন এলেন তখন সেই আলো নিভে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ভালোবাসার সৌরভ। ·াপনার মুখেই আমরা শুনেছি—অনুকম্পার পাত্রের জন্য অন্তর কাঁদতে পারে কিন্তু প্রেমের আলোয় তা ভাস্বর হয় না। সত্যি কথাই এবং নিজের কথাই বলেছেন আপনি। আপনারও অন্তরে স্বামীর জন্য যা অবশিষ্ট ছিল তা অনুকম্পা, প্রেম নয়।'

বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল বিপ্রদাস, তাকাল তার মক্কেলের পানে। তারপর তারই দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি জানি দীপক, কী বিপুল বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তোমার বুক। কিন্তু আমি নিরুপায়, সত্যকে প্রকাশিত করাই আমার কাজ। আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে যিনি তোমায় নির্দোষ হয়েও অপরের দোষ কাঁধে নিয়ে চরম আত্মত্যাগের সাহস দিয়েছেন,

তিনিই তোমাকে শেষ পর্যন্ত এই মর্মান্তিক কাহিনী শোনার শক্তি দেবেন। মর্মান্তিক তো নিশ্চয়ই। যার প্রতি প্রেমের প্রেরণায় তুমি মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছ সেই তোমার অতি-আদরের রুবি তোমায় ভালোবাসে না। তোমার জন্য তার অন্তরে আছে অনুকম্পা, শুধুই অনুকম্পা।'

আবার পায়ে পায়ে সাক্ষীর সামনে ফিরে এল বিপ্রদাস। নতমুখী মহিলাটির পানে একবার চেয়ে বলতে শুরু করল ঃ

'মিসেস দত্ত, আশা করি আমার বিশ্লেষণে ভুল হয়নি। এক মহৎ আদর্শের স্বপ্ন এবং ফাদার লরেন্সের আন্তরিক অনুরোধ আপনাকে দীপকের সঙ্গে বিবাহে প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রেমের সদ্যদীপ্ত ক্ষীণ শিখা ফেলেছিল সেই প্রেরণার পথে আলো; কিন্তু শিখা ক্ষীণ ছিল বলেই ভবিষ্যৎ বাধাগুলো তখন স্পষ্ট হয়নি। বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে কিন্তু একদিন চুপসে গেল রঙিন ফানুস। নিজের নিঃসঙ্গতায় শিউরে উঠলেন আপনি। নিঃসঙ্গতা ভিন্ন আর কি বলতে পারি। পুরুষের প্রেমালিঙ্গনে ধরা পড়ে দেহ কিন্তু মুগ্ধ দৃষ্টির মধুতে সিক্ত হয় না মন; উত্তপ্ত ওষ্ঠ এসে মেশে ওষ্ঠে কিন্তু কানের ভেতর দিয়ে প্রেমগুঞ্জনের সুর মরমে পশে তোলে না বক্ষের বীণায় ঝঙ্কার! এমন পুরুষকে আর যাই হোক সহজে ভালোবাসা যায় না। যে সাধনার সংযম থাকলে ভালোবাসা যায় তা আপনার হয়তো ছিল কিন্তু সিদ্ধি আপনার করায়ত্ত হয়নি।

'স্ত্রীর এই প্রতিক্রিয়া স্বামীর মনেও যে ছায়া ফেলেনি তা নয়। তার তীক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে আভাস পেয়েছিল দীপক, সচেতন হয়েছিল নিজের পঙ্গু ইন্দ্রিয়ের বাধা সম্বন্ধে। তবু সর্বগ্রাসী প্রেম এবং প্রচণ্ড প্রয়োজন এই দুয়ের প্রেরণায় সে চেয়েছিল স্ত্রীকে আপন করে নিতে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল বিয়ের পরই, পুরীতে। দিনের আলোয় লেখা-পড়ায়, আলাপ-আলোচনায়, রহস্যে-রঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার সেতু বেয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসতো এই দম্পতি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কামনা-কণ্টকিত পুরুষ আর সশঙ্কিত, বিরক্ত নারীর মাঝে বয়ে যেত নীরব দ্বন্দ্বের শীতল মসীবর্ণ স্রোত, দুজনের মাঝে গড়ে উঠত দুস্তর এক ব্যবধান। এই ব্যবধানের কথাই আপনি পুরী থেকে ফেরার পথে রামপুরহাটে ব্যক্ত করেছিলেন ফাদার লরেন্সের কাছে, একান্ত গোপনে। সেদিন ফাদার লরেন্সের উপদেশ সাহস এবং শক্তি জুগিয়েছিল আপনাকে। বিদেশে বৈচিত্র্যের আশা মনে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ডের পথে পা বাড়িয়েছিলেন আপনি।

'আপনি জানতেন না, কিন্তু আপনার ওই নতুন জীবনের উচ্ছ্বাস, আশায় উদ্বেল আনন্দোচ্ছল ব্যবহার, দীপকের চেতনায় এক পরম সম্ভাবনার সাড়া জাগিয়েছিল। প্রার্থিত নারীকে নিয়ে সুখ-নীড় গড়ার স্বপ্নে বিহ্বল হয়েছিল সে। সেই মুহূর্ত থেকে তার জীবনের একমাত্র কামনা ছিল আপনাকে সুখী করা। সেদিন থেকে সে আপনাকে পুজো করতে শুরু করেছিল বললেও ভুল হবে না।

'ফাদার লরেন্সের উপদেশও মিথ্যা হয়নি। ইংলণ্ডের কর্মমুখর দিন ও রাত্রি সত্যিই আশ্চর্য পরিবর্তন এনেছিল আপনার জীবনে। শহরের পর শহরে বক্তৃতা, অসংখ্য নর-নারীর প্রশংসা, বেতারে ভাষণ, অভিনন্দন—সব কিছুর মধ্যে ধীরে ধীরে রূপে-রসে বিকশিত হচ্ছিল এক নতুন নারী-সত্তা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' ইংলণ্ডের সমাজে আপনার জনপ্রিয়তায় নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছিল এই উক্তির সত্যতা। এই জয়যাত্রায় পঙ্গু দানবাকৃতি দীপক পাশে থাকায় সুবিধাই হয়েছিল আপনার। আমি কল্পনা করতে পারি যে এই সময়ে ব্যস্ত দিনের শেষে ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে প্রতি রাত্রেই আপনার মনে হতো যে আপনি সত্যিই সুখী। আর এই উপলব্ধির কথাই আপনি লিখেছিলেন ফাদার লরেন্সকে। বেশ কাটছিল দিনগুলো—রঙিন পাখায় ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল যেন। এমন সময় রৌদ্রদীপ্ত প্রান্তরে ভেসে যাওয়া মেঘের ছায়ার মতন আপনার পথে এসে দাঁড়ালেন মিঃ রবার্ট বিচাম, কেম্ব্রিজে এক সভার শেষে।

'আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধ-মূক-বধির দীপক দত্তের প্রতিভাকে দেশে দেশে পরিচিত করার জন্য ব্যগ্র হলেন মিঃ বিচাম। এ সবই সেই লম্পট তরুণের চাতুরী—দীপক দত্ত উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য তার উদ্ভিন্ন-যৌবনা স্ত্রী। দ্রুতগতিতে লোভের জাল ছড়িয়ে চললেন মিঃ বিচাম। ক্রমে আপনি হয়ে উঠলেন তার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। মিঃ বিচামকে অকৃত্রিম বন্ধু বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল দীপক, তাই বাধা দিত না। আর তা ছাড়া আপনি অন্যায় কিছু করবেন এ ছিল তার কল্পনার অতীত। কিন্তু অন্যায়ই করলেন আপনি, পথভ্রষ্টা হলেন। মিঃ বিচামের লালসার আগুনে আহুতি দিলেন নিজেকে।'

আচমকা সেই নিস্তব্ধ আদালতকক্ষে ফেটে পড়ল এক ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জন। দেখা গেল কাঠগড়ার রেলিং-এ ভর দিয়ে বিপ্রদাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উদ্যত হয়েছে আসামী দীপক দত্ত। প্রচণ্ড উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে তার দীর্ঘদেহ। প্রহরীরা জোর করে বসিয়ে দিল তাকে। তখনও দুলছে তার দেহ আর অপর দিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন রুবি দত্ত।

অবস্থা একটু শান্ত হতেই বিপ্রদাস তার ভাষণ শুরু করল ঃ

'আমি জানি কি অপরিসীম বেদনার আঘাত আমি দিচ্ছি এই অসহায় মানুষটিকে। এই মুহূর্তে সম্ভব হলে ও আমায় হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতো না। আদালতকে ওর এই রূপই আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, এই হিংস্র পশুর রূপ। শুধু একটিমাত্র সম্পদ—ওর একান্ত নিজস্ব সম্পদ রক্ষার জন্য ও এইরূপে প্রকাশিত হতে প্রস্তুত। সে সম্পদ হচ্ছে ওর স্ত্রী। এইবার সকলে চেয়ে দেখুন সেই স্ত্রীর দিকে। লজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্র-মহিলা, এখুনি বুঝি মিশে যাবেন মাটির সঙ্গে। আমি যা বলেছি তা অস্বীকার করবার সাধ্য নেই ওঁর। তীব্র কামনার জ্বালায়, অন্ধ-বোবা-বধির ভালবাসার বন্ধন থেকে মুক্তির মোহে মিঃ বিচামের পঙ্কিল জালে ধরা দিয়েছিলেন মিসেস

রুবি দত্ত। এই সাময়িক উত্তেজনার উপশম হতেও দেরী হয়নি। তারপরই শুরু হয়েছিল অনুশোচনা।'

মিসেস দত্তর কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বিপ্রদাস বলে চললো :

'হয়তো বিবেক, হয়তো বিবেচনা ছিল এই শুভবুদ্ধির পেছনে। লম্পট মিঃ বিচামের সঙ্গ থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিলেন আপনি। কিন্তু রক্তের স্বাদ পাওয়ার পর লুব্ধ বাঘ ছাড়বে কেন তার শিকার! পরিস্থিতির এই জটিলতায় বিব্রত হয়েছিলেন আপনি, ভয়ও পেয়েছিলেন। স্বামীর সন্দেহ জাগ্রত হবার ভয় তখন পেয়ে বসেছিল আপনাকে। দীপক যে সন্দেহ করেনি তাও নয়। কিন্তু তার সন্দেহটা অন্য পথ ধরেছিল। স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই সে মিঃ বিচামকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। তার কাছে মিঃ বিচাম ছিলেন এক রক্তলোলুপ শ্বাপদ আর আপনি এক ভীতা আত্মরক্ষার অদম্য আগ্রহে চঞ্চলা হরিণী।

'সত্যিই, এই মনুষ্যরূপী শ্বাপদের কবল থেকে মুক্তির জন্যে চঞ্চল হয়েছিলেন আপনি। আর কোনও পথ নেই দেখে পরের জাহাজেই দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আপনি অবশ্য স্বপ্নেও ভাবেননি মিঃ বিচাম জাহাজেও আপনাকে অনুসরণ করবেন। কিন্তু যা ভাবেননি তাই হলো। জাহাজ ছাড়বার ঘণ্টা দুয়েক বাদেই 'ডেকে' আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং মিঃ রবার্ট বিচাম। দীপককে খুশী করবার জন্যে একটা কারণও দেখালেন— রেডক্রশের পক্ষে আর্ত ভারতবাসীর সেবা করতে চলেছেন তিনি। সেবার সুন্দর নমুনা তাতে সন্দেহ নেই!

'আরও সাবধান হলেন আপনি। কেবিনে খাওয়া-দাওয়া শুরু হলো, বাইরে বার হওয়া প্রায় বন্ধ হলো। তবুও অক্টোপাশকে এড়ান গেল না। পরের দিনই জাহাজের এক নিভৃত কোণে আপনাকে ধরে ফেললেন মিঃ বিচাম। অনুরোধ, উপরোধের ডালি নিয়ে আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন এই আসঙ্গলিপ্সু তরুণ। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ছাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন আপনি। ভয়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল আপনার সত্তা। একবার মনে হয়েছিল আত্মহত্যাই বুঝি মুক্তির একমাত্র পথ। পরক্ষণেই মনে পড়েছিল অসহায় স্বামীর কথা, মমতার মধুর সুরে বেজে উঠেছিল বুকের বীণা। তাহলে, কোন পথে পাওয়া যাবে মুক্তি? চেষ্টা করেও যখন সরা যাচ্ছে না, তখন যে বাধা তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিলেই তো হয়! চিন্তাটা পেয়ে বসেছিল আপনাকে, মিঃ বিচামকে পথ থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার চিন্তা। কামনার আগুন নিভে গেলে, লম্পট পুরুষের বিরুদ্ধে অনুতপ্তা নারীর অন্তরে আবার আগুন জ্বলে, সে আগুন প্রতিহিংসার।

"মিঃ বিচাম কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না, ছায়ার মতন রইলেন আপনার পেছনে পেছনে। কেবিনে দরজা খুললেই চকিতে সরে যায় তার দীর্ঘ দেহ, চোখ এড়ায় না আপনার। এড়ায় না দীপকের সদাজাগ্রত চেতনা। ঘ্রাণ শক্তির মাধ্যমে সে ঠিকই বুঝত আপনার পাশে মিঃ বিচামের অস্তিত্ব, সন্দেহ তার

প্রখরতর হয়। ক্রমশঃ ভয়ে বুক ভারী হয়ে ওঠে আপনার। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে মিঃ বিচামের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন আপনি।'

একটু থেমে সাক্ষীর দিক থেকে ফিরে জুরীদের উদ্দেশ্য করে বলল বিপ্রদাস, 'নাটকের একটা অঙ্কের শেষ হলো এখানে। এইবার আমরা হত্যার ক্ষণপূর্ব মুহূর্তে, নাটকের ক্লাইমেক্স-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। ⋯ ⋯'

আবার সাক্ষীর পানে তাকাল বিপ্রদাস। কাঠগড়ার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন রুবি দত্ত, লজ্জায় ভয়ে মাথা নুয়ে পড়েছে তাঁর। তাঁকে লক্ষ্য করেই শুরু হলো বিপ্রদাসের ভাষণ ঃ

'রোজকার মতন মধ্যাহ্নের আহার শেষে স্বামী বিশ্রাম নিচ্ছেন, দিবানিদ্রার আমেজে চোখ বুঁজে এসেছে তাঁর। আপনিও 'ডেকে' যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, একটু পায়চারি করবেন সেখানে। সেদিন কিন্তু রোজকার রুটিন একটু বদলাল। হাতব্যাগে ছোট্ট রিভলবারটা পুরে নিলেন আপনি। দ্বিতীয় দিন সাক্ষাতের সময় আপনিই আমায় বলেছিলেন যে ইংলণ্ডে সংগ্রহ করবার পর রিভলবারটা সব সময়ে হাতের কাছে রাখা আপনার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'ডেকের' পথ না ধরে আপনি পা বাড়ালেন মিঃ বিচামের কেবিনের পথে। সমস্ত পরিকল্পনাটা আপনার মনে স্পষ্টাক্ষরে আঁকা ছিল। কেবিনের দরজায় টোকা মারলেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াবেন মিঃ বিচাম। পলাতকা হরিণী স্বেচ্ছায় হাতের মুঠোয় ফিরে এসেছে দেখে সারা মুখে তাঁর ছড়িয়ে পড়বে খুশীর আলো, তাঁর অসংযত ব্যবহারের ফলে ঘনীভূত বিপদ সম্বন্ধে বোঝাবেন, আপনাকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ জানাবেন, প্রয়োজন হলে কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বেন। হয়তো সফল হবেন। কিন্তু যদি না হন, যদি কিছুতেই না বাধ্য করা যায় সেই দুর্দান্ত কামার্ত পুরুষকে⋯⋯তখন শেষ আশ্রয় ওই ছোট্ট রিভলবার। বিষবৃক্ষকে নিঃশেষ করে দেওয়াই উচিত। তারপরের কাজ খুব সহজ। রিভলবারটা পোর্টহোল গলিয়ে ফেলে দিয়ে সোজা 'ডেকে' চলে যাওয়া। সমুদ্রের হাওয়ায় সেই পঙ্কিল পুরুষের গন্ধ সম্পূর্ণ মুছে যাবে। ধীরে সুস্থে কেবিনে ফিরে এসে দেখবেন স্বামীর ঘুম তখনও ভাঙেনি!

'দুর্ভাগ্যক্রমে পরিকল্পনার ছন্দ-পতন হলো। মিঃ বিচামের কেবিনের সামনে গিয়ে দেখলেন দরজাটা আধখোলা। একটু বিচলিত হলেন আপনি। তবুও সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে পা বাড়ালেন কেবিনের ভেতর। মাটিতে যেন গেঁথে গেল আপনার পা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন— চোখের সামনে বিছানার উপর পড়ে আছে মিঃ বিচামের নিষ্প্রাণ দেহ—ঘাড়ের নীচে জমাট বেঁধে আছে লাল রক্ত। দেহের পাশেই পড়েছিল একটা সবুজ সিল্কের স্কার্ফ, আপনি যে স্কার্ফটা পরতেন, যেটা আপনার স্বামীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল—ঠিক সেইরকম একটা সবুজ সিল্কের স্কার্ফ। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, তাই স্কার্ফটা আপনার চোখে পড়ল না। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র,

তারপরই কেবিন ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন 'ডেকে'।

'ডেকের রেলিং ধরে যখন দাঁড়ালেন তখন আপনার পা কাঁপছে, বুকে কে যেন হাপর চালাচ্ছে। সমুদ্রের শীতল বাতাসে ধীরে ধীরে দেহ-মন শান্ত হলো। তবুও বারে বারে চোখের সামনে ফিরে এল কেবিনের সেই ভয়াবহ দৃশ্য। আপনার বুঝতে দেরী হলো না যে আপনি যাবার কয়েক মিনিট, হয়তো বা কয়েক মুহূর্ত আগেই আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন মিঃ বিচাম। কিন্তু কে সেই আততায়ী? উত্তপ্ত মস্তিষ্কে প্রথম যে মুখটা ভেসে এল, সেটা আপনার স্বামীর। একটু ভাবতেই বুঝতে পারলেন—সকাল থেকে যে আপনার চোখের সামনে ছিল, যাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আপনি ধরেছিলেন মিঃ বিচামের কেবিনের পথ তার পক্ষে আপনার আগেই মিঃ বিচামের কেবিনে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আপনাকে অনুসরণ হয়তো সে করতে পারতো। কিন্তু তাও করেনি, কারণ কেবিন থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বা পরে আশেপাশে কোনও মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

'তাহলে কে সেই আততায়ী? অন্য কোনও স্ত্রীলোক? হলে আশ্চর্য হবার কি আছে? আততায়ী পুরুষ হোক বা নারীই হোক, মিঃ বিচামকে হত্যা করে আপনার অশেষ উপকার সে করেছে, রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করেছে আপনাকে। 'ডেকে' দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপনার ইচ্ছে হয়েছিল রিভলবারটা সমুদ্রে ফেলে দেবার। তারপরই ভাবলেন অব্যবহৃত রিভলবার কাছে রাখায় ভয়ের কিছু নেই। সেটা এখনও আপনার কাছেই আছে; হয়তো ভেবেছেন যখন সব আশার শেষ হবে তখন নিজেকে চিরতরে সরিয়ে নেবার প্রয়োজনে······।'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে হতচকিত মিসেস দত্তর হাত থেকে টুক করে তাঁর হাতব্যাগটা তুলে চোখের নিমেষে ছোট্ট রিভলবারটা বার করে নিল বিপ্রদাস। ব্যাগ যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে রিভলবারটা নিয়ে রাখল বিচারপতির টেবিলে। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে আসতে আসতে প্রশান্ত মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'শুধু আমার স্বার্থেই নয়, আরও অনেকের কাছেই আপনার প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি, মিসেস দত্ত। স্বামীর প্রতি যে অন্যায় আপনি করেছেন তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যও আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।' চশমাটা ঠিক করে নিয়ে কপালের ঘাম মুছে বিপ্রদাস আবার শুরু করল তার সওয়াল:

'প্রকৃতিস্থ হবার পর আপনি কেবিনে ফিরে গেলেন। সেখানে দ্বিতীয় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আপনার জন্যে। গিয়ে দেখলেন কেবিন শূন্য, স্বামী নেই। ডেকের চিন্তাটাই আবার চট করে ফিরে এল আপনার মনে। দীপকই কি হত্যা করেছে মিঃ বিচামকে? অতি সাধারণ যুক্তি পরক্ষণেই বলে দিল যে দীপকের পক্ষে আপনার আগে মিঃ বিচামের কেবিনে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তা হলে গেল কোথায় দীপক? একা একা সে বার হবেই বা কেন? মিঃ বিচামের কেবিনে ফিরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়, সম্ভবতঃ নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন আপনি। কিন্তু সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন

হওয়ার সাহস হলো না। তা ছাড়া সেই কেবিনের কাছাকাছি যাওয়ার বিপদ সম্বন্ধেও ততক্ষণে সচেতন হয়েছিলেন আপনি। সুতরাং কেবিনে বসে স্বামীর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই মনস্থ করেছিলেন। বেশ কিছু সময় কেটে গেল……

'কুড়ি মিনিট পরে বিচলিত হয়ে উঠলেন—এতক্ষণ কি করছে দীপক? কোথায় গেল সে? তবে কি ঘুম ভেঙে আপনাকে কেবিনে না পেয়ে 'ডেকেই' চলে গেল সে? আর সেখানে এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে না কি! ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আপনার; তখনই 'ডেকে' ছুটলেন। আধ ঘণ্টা সেখানে খোঁজাখুঁজি করে নিরাশ হয়ে আবার ফিরে গেলেন কেবিনে। কেবিন আগের মতনই শূন্য পড়ে আছে। নতুন একটা আশঙ্কা চেপে বসল আপনার মনে। যদি ইতিমধ্যে দীপকের কোনও এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে থাকে? চিন্তার চাপ আর সইতে না পেরে ছুটলেন কোষাধ্যক্ষের কামরায়। এর পরের ঘটনা আদালতের জানাই আছে।

'হত্যার দিন থেকে আজ পর্যন্ত একটি কথা আপনি গোপন করেছেন, মিসেস দত্ত, নিহত মিঃ বিচামের কেবিনে আপনার উপস্থিতির কথা। অবশ্য এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হত্যার ঘটনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে চেয়েছিলেন আপনি; কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণও ছিল, সেটা হচ্ছে মিঃ বিচামের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক দীপককে না জানানো। তাই জাহাজের 'সেলে' দীপকের উক্তি শুনে আপনি মনে মনে চমকে উঠেছিলেন। ঠিক এই কথাগুলো বিদ্যুৎঝলকের মতন চমকে উঠেছিল আপনার মনে—হয় মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে আমাকে হত্যাকারী ভাবছে দীপক অথবা নিজেই হত্যা করে এখন…? শেষের সন্দেহটা এখনও রয়েছে আপনার মনে। এখনও ভাবছেন—তা হলে হত্যা কি দীপকই করেছে?

'হত্যা আপনি করেননি একথা আমি প্রমাণ করেছি। মামলার পরবর্তী জট খোলার জন্য আপনার স্বামীর প্রয়োজন ছিল এই প্রমাণটুকুর। এইবার আপনার স্বামীর নির্দোষিতাও আমি প্রমাণ করবো, এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেব কেন সে মিথ্যা অপরাধের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এরজন্যে আবার ফিরে যেতে হবে সেই মুহূর্তে—যখন স্বামীকে ঘুমন্ত দেখে আপনি চুপি চুপি পা বাড়িয়েছিলেন মিঃ বিচামের কেবিনের পথে।

'আপনি অবশ্য জানতেন না যে একটু পরেই মিঃ বিচামের কেবিনের পথে পা বাড়িয়েছিল দীপক দত্ত স্বয়ং। স্ত্রীকে অনুসরণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য কারণ সে ধরে নিয়েছিল যে মিঃ বিচামের কেবিনই তার স্ত্রীর গন্তব্যস্থল। এতক্ষণ পর্যন্ত একাধিক সাক্ষী এবং মাননীয় কৌঁসুলী, সকলেই কাহিনী শুরু করেছেন মিঃ বিচামের কেবিনে দীপকের উপস্থিতি থেকে। কিন্তু কেউই ভাবেননি যে কেমন করে একজন অন্ধ-মূক-বধির, জাহাজের সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্ধকার গলিপথ ধরে, সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে পৌঁছতে পারে মিঃ বিচামের কেবিনে! আমিও প্রথমটা ভেবে পাইনি। মিঃ বিচামের কেবিনে দীপক গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কেমন করে? উত্তরটা হচ্ছে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে,

গন্ধকে অনুসরণ করে। স্ত্রীর ব্যবহৃত মিষ্টি সেন্টের সুবাস তার ভুল হওয়ার কথা নয়। স্ফীত নাসারন্ধ্র, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ এই দানবাকৃতি লোকটি জাহাজের অলিগলি বেয়ে অদৃশ্য এক গন্ধ অনুসরণ করে চলেছে—দৃশ্যটা রোমাঞ্চকর তাতে সন্দেহ নেই। এবং বাস্তবে ঠিক এইরকমই ঘটেছিল।

'দানবাকৃতি মানুষটির প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠেছিল সংকল্পের দৃঢ়তা। কি সে সংকল্প? পথের কাঁটাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া। প্রয়োজন হলে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না। পরিণামের কথা চিন্তা করবার অবস্থাই ছিল না তার। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস তখনও তার ক্ষুণ্ণ হয়নি কিন্তু সন্দেহের সাপ উঁকি দিতে শুরু করেছিল তার মনে। ক্রমশঃ শিক্ষা আর সংস্কৃতির বাঁধ ভেঙে পড়ছিল, জেগে উঠছিল সেই আদিম বর্বর পুরুষ, যার কাছে, নিজের নারীরত্ন রক্ষার জন্য নরহত্যাও লজ্জার নয়। হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে হত্যার চিন্তা বারবার তার বুকে জেগে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কাকে হত্যা করবে সে? অত খুঁটিয়ে ভাবেনি সে। মিঃ বিচামকে না নিজের স্ত্রীকে? প্রথম যাকে হাতের মুঠোয় পাবে নিঃসন্দেহে তাকেই, প্রয়োজন হলে দু'জনকেই!

'মিঃ বিচামের কেবিনের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে, গন্ধের গতিপথ বিভ্রান্ত করেছিল তাকে। গন্ধের গতিপথ দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল এইখানে, একটা প্রসারিত সামনের পথে অন্যটা মিঃ বিচামের কেবিনের দরজার পানে। কোনদিকে যাবে সে, কোন পথটা ধরবে? একটু দাঁড়িয়ে, স্থির হয়ে চিন্তা করে কেবিনের পথেই পা বাড়িয়েছিল সে।

'আধখোলা দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকেই তার নাকে এল মিঃ বিচামের উপস্থিতির গন্ধ, ঘৃণায় শিউরে উঠল তার সারা দেহ। জোরে জোরে নিশ্বাস টানল সে—স্ত্রীর সেন্টের গন্ধ আর সেই ঘৃণ্য গন্ধ মিশে এক হয়ে ছড়িয়ে আছে কেবিনের বাতাসে। এই অকাট্য প্রমাণে দু'জনের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলো সে। কেবিনেই আছে দু'জনে, পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে সে, আর পালাবার পথ নেই। অস্ত্রের প্রয়োজন নেই তার কাছে দুটো হাতই সেরা অস্ত্র। কাগজ-কাটা ছুরি খুঁজে সময় নষ্ট করবে কেন সে? দুটো বজ্রমুষ্টি দিয়ে দু'জন মানুষকে মশার মতন টিপে মেরে ফেলতে পারে যে, তার পক্ষে অন্য অস্ত্রের কথা চিন্তা করাই অবান্তর। প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনও অস্ত্র সংগ্রহের কথা সেই মুহূর্তে ভাবেওনি দীপক দত্ত। অন্ধ দীপক দত্ত সেই মুহূর্তে স্বাভাবিক চেতনার বশে আশ্রয় করেছিল তার দ্বিতীয় জাগ্রত শক্তিকে—তার তীক্ষ্ণ স্পর্শশক্তির উপর নির্ভর করেছিল সে। একবার শুধু স্পর্শ করার অপেক্ষা, তারপর লৌহকঠিন পাঁচ আঙুলের চাপে নিঃশেষ করে দেওয়া দুই কীটানুকীটকে।

'হত্যার মাধ্যম সম্বন্ধে দীপক দত্তের তৎকালীন এই চিন্তাটুকুর প্রতি আমি আদালতের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমার পূর্ববর্তীরা অনেকেই হত্যার পূর্বাপর ঘটনাবলীকে সুন্দর এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা মস্ত মনস্তাত্ত্বিক ভুল হয়েছে। আমি

বলতে চাই যে দীপক দত্ত খুন করলে কাগজ-কাটা ছুরির গা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বার করতে হতো, তার সাহায্য সে নিত না, তার দুটো হাত দিয়েই কাজটুকু সে সহজে সম্পন্ন করতে পারতো। কাগজ-কাটা ছুরি ব্যবহারের ব্যাপারটা তার মাথায় খেলেছিল একটু পরে। পুলিশ অফিসারের সামনে তার খুনের মহড়া অত নিখুঁত আর যান্ত্রিক বলেই সন্দেহজনক মনে হয়েছিল আমার। হ্যাঁ, সত্যিই মহড়া দিয়েছিল দীপক। দীর্ঘ আধ ঘণ্টা নিহত বিচামকে সামনে রেখে এই গতিভঙ্গীর এই কার্যক্রমের মহড়া দিয়েছিল দীপক দত্ত। দোষ নিজের ঘাড়ে নেবার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে এইটুকু বুঝেছিল যে তার কার্যক্রমের বিবরণ যত নির্ভুল হবে ততই সন্দেহাতীত হবে তার স্বীকৃতি। তার পঙ্গুতার জন্যই এই মহড়ার প্রয়োজন সে উপলব্ধি করেছিল যাতে পুলিশকে সে বিভ্রান্ত করতে পারে, যাতে তার কাগজ-কাটা ছুরি ব্যবহার এবং সঠিকভাবে আঘাত করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে পুলিশ নিঃসন্দেহ হয়। বিভ্রান্ত সে করেছিল ঠিকই। তার এই একটি চালেই ভুল পথে চলে গিয়েছিল পুলিশী তদন্ত।

'যাই হোক, এইবার ফিরে আসা যাক সেই রহস্যময় কেবিনের মধ্যে। স্পর্শশক্তির উপর নির্ভরশীল দীপক দত্ত সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছিল সামনের দিকে। হঠাৎ বিছানায় বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, প্রসারিত হাত গিয়ে ঠেকল শায়িত এক দেহে···নিশ্বাসে তার আবার মিশে গেল সেণ্টের সুবাস জড়ানো ঘৃণ্য গন্ধটা। কিন্তু পরক্ষণেই শিউরে উঠল তার দেহ। বাতাসে মেশানো তৃতীয় একটা গন্ধ ধরা পড়েছে তার তীক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তিতে—রক্তের গন্ধ আর তারই সঙ্গে যেন পাওয়া যাচ্ছে মৃত্যুর গন্ধের ক্ষীণ একটা রেশ···

'চমকে হাতটা সরিয়ে নিল সে, তারপর সামলে নিয়ে স্পর্শ করল দেহটা ···ধীরে ধীরে তার আঙুল সঞ্চালিত হলো—বুক থেকে মুখে, ক্রমশঃ মাথা পেরিয়ে ঘাড়ে নামতেই রক্তে ডুবে গেল তার আঙুল—উষ্ণ গাঢ় রক্ত। ক্ষতের চারপাশে সঞ্চালিত হলো আঙুল—আঘাতের গভীরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলো সে। এবার আঙুল রাখল হৃদপিণ্ডের উপর। অভ্রান্ত তার স্পর্শশক্তি —থেমে গেছে বুকের স্পন্দন—মিঃ বিচামের মৃত্যু হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে সে তৎপর হলো অস্ত্রটার অনুসন্ধানে—বিছানার উপর ঘুরে চলল আঙুল···হঠাৎ হাতে ঠেকল কাগজ-কাটা ছুরিটা। জিনিসটা তার পরিচিত, তার বিছানার পাশের টেবিলে বইয়ের পাতা কাটার জন্য এমনি একটা ছুরি আছে বটে।

'আরও কিছু প্রমাণ যদি পাওয়া যায় এই আশায় বিছানার অপর প্রান্তে আবার সে শুরু করল অঙ্গুলি সঞ্চালন·····চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন নিশ্চল হলো তার দেহ, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার······আঙুল তার স্পর্শ করেছে একটা সিল্কের স্কার্ফ·····এ স্পর্শ, এ গন্ধ তার ভুল হবার নয়, স্ত্রীর এই সবুজ সিল্কের স্কার্ফ অতি পরিচিত, অতি প্রিয় তার·····রুবির সবুজ সিল্কের গন্ধসিক্ত স্কার্ফ। এই কাছেই কোথায় লুকিয়ে পড়েছে রুবি—কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে সে?

'উঠে কেবিনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে। কোনও অসুবিধাও হল না কারণ কেবিনের ব্যবস্থাটা মোটামুটি তার জানাই ছিল। পাশের বাথরুম, ঝোলানো 'বাঙ্ক', মাল রাখার খুপরি কিছু বাদ দিল না তার এই ক্ষিপ্ত অনুসন্ধান।······কিন্তু পাওয়া গেল না রুবিকে। আর কেউ নেই সেই কেবিনে! এই হতচকিত মুহূর্তে হঠাৎ চিন্তাটা ঝলকে উঠল তার মস্তিষ্কে······দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু, কোনও যাদুকরের স্পর্শে যেন তার অন্তর্দৃষ্টির সামনে থেকে উঠে গেল রহস্যের যবনিকা। কোনও ছলে মিঃ বিচাম রুবিকে কেবিনে ডেকে এনে তারপর উন্মত্তের মতন অগ্রসর হয়েছিলেন···

···রুবি বাধা দিয়েছিল, শেষে সেই পাপস্পর্শ থেকে মুক্তির আশায় হাতের কাছে যা পেয়েছিল তাই তুলে নিয়ে, টেবিল থেকে কাগজ-কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে করেছিল আঘাত।······মহিমময়ী নারীর মতন কাজ করেছে রুবি, সাবাশ রুবি!

'উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত রুবি ভুলে ফেলে গিয়েছিল তার সিল্কের স্কার্ফটা; এমন কি ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করার কথাও তার মনে ছিল না। মুহূর্তে রুবির দেহ-সুবাসের দ্বিমুখী গতির রহস্যও সমাধান হয়ে গেল তার কাছে। কেবিন ছেড়ে 'ডেকের' পথে গিয়েছিল রুবি, তাই সুবাস সেই সামনের গলিপথে প্রসারিত।······পাপিষ্ঠ তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে; এখন যে-কোনও প্রকারে রক্ষা করতে হবে রুবিকে।

'চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প স্থির হতে দেরী হলো না দীপকের। সময় অল্প, তার ওপর রয়েছে আচমকা কেউ এসে হত্যা আবিষ্কার করার আশঙ্কা। এই অবস্থায় অত্যাশ্চর্য হলেও তার পঙ্গুতার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে সহজ এবং নিশ্চিত পথ ধরল দীপক। হত্যার অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়াই স্থির করল সে। বড়জোর কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হবে হয়তো···অন্ধ-মূক-বধির একজন মানুষের মৃত্যুদণ্ড না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মানবিক সহানুভূতি তার স্বপক্ষে যাবে নিশ্চয়ই। আর তা ছাড়া তার স্বপক্ষ সমর্থনের একমাত্র অস্ত্র হবে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। বিচারপতি এবং জুরী দু'পক্ষই তার এই অদ্ভুত ব্যবহারে নিশ্চয়ই বিচলিত হবেন, এবং ফলও আশানুরূপ হবে—শাস্তিটা লঘু হবে······তারপর কারাগার থেকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে এসে দাঁড়াবে তার স্ত্রী; আবার শুরু হবে তাদের নিঃশঙ্ক, নিরুপদ্রব দাম্পত্য জীবন।

'তার মস্তিষ্কের পথে এই সব চিন্তার মিছিল চলতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী লাগেনি। তারপর, প্রথমেই সে দরজাটা বন্ধ করল। প্রমাণগুলো নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন। সিল্কের স্কার্ফটা কেবিনের জানালা গলিয়ে ফেলে দিল সমুদ্রের জলে। রুবির আঙুলের চিহ্ন-মাখা ছুরিটাও ফেলতে যাচ্ছিল, জানালার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল।······গ্রেপ্তার হবার পর তাকে জবানবন্দী করতে হবে, অতএব হত্যার বিবরণ দিলেই হবে না, তার কার্যক্রম-টুকুও রপ্ত হওয়া দরকার। বার বার তাই মহড়া দিল সে। তারপর প্রতিটি

অঙ্গ-ভঙ্গী, চলা-ফেরা নিখুঁত হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হবার পর ছুরিটাকেও পাঠিয়ে দিল স্কার্ফের পথে।

'হত্যা-নাটকের মঞ্চ-সজ্জাকর চাইছিল তাড়াতাড়ি তার কাজ সম্পূর্ণ করতে। আবার কোথাও কোনো ত্রুটিও না থাকে। কেবিনের সর্বত্র নিজের আঙুলের ছাপ ছড়িয়ে দেওয়া হলো, রাখা হলো স্বহস্তে হত্যার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। অতবড় একটা জোয়ান বিছানায় নেতিয়ে পড়ে মরে থাকলে কখনও বিশ্বাসযোগ্য হয়! মৃতদেহ তুলে দরজার গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, পথের দু'চারটে আসবাব করা হলো বিক্ষিপ্ত। আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির প্রমাণটা পরিষ্কার হলো এতক্ষণে। দরজাটা রাখা হলো আধখোলা অবস্থায় যাতে সহজেই বাইরের লোকের চোখে পড়ে কেবিনের বিশৃঙ্খল অবস্থা। সজ্জা শেষ করে বসল সে, অপেক্ষা করতে লাগল পটোত্তলনের। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। এই অপেক্ষার স্মৃতি তার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবার কথা। বসে থাকতে থাকতে এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে গিয়েছিল তার মন। এতক্ষণ যা ছিল অভিনয় তাই এক আশ্চর্য মানসিক ক্রিয়ার ফলে মনে হচ্ছিল সত্য। নিজেকে হত্যাকারী ভাবতে ভালো লাগছিল তার। আমি আগেই বলেছি দীপক দত্ত জীবনে একবার প্রকাশিত হয়েছিল তার পাশব রূপে। এই অপেক্ষার সময়ে মানুষ দীপক দত্ত ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল জীবন্ত দানবে। হত্যার প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে সে একান্তভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। তাই যতবারই ভাবছিল, মনে হচ্ছিল যে তার, তারই নিজের দুটো বলিষ্ঠ হাত উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে পাপিষ্ঠ মিঃ বিচামকে আর ততবারই অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে উঠছিল তার মন। অনুতাপের সামান্য কণাও ছিল না তার মনে—মিঃ বিচামকে সেও হত্যা করেছিল, তবে হাত দিয়ে নয়, হত্যা করেছিল নিভৃত মনের গোপন চিন্তায়।

'আদালতকে আমি জানাতে চাই যে এইটুকু, শুধু এইটুকুই আমার মক্কেল দীপক দত্তের সঙ্গে মিঃ বিচামের হত্যার সংস্রব।'

বিপ্রদাস থামবার সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষে ছড়িয়ে পড়ল প্রশংসার গুঞ্জন। মুগ্ধ হয়ে সকলে শুনছিল তার ভাষণ, হয় তো শুনছিল নিশ্বাস রুদ্ধ করে। তাই সামান্য বিরতির সুযোগে ফেটে পড়ল পুঞ্জীভূত আবেগের ঢেউ। অতসীও কম মুগ্ধ হয়নি। বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার অধিকারী একজন মানুষ যে প্রেমের জন্যে নরহত্যা করতে পারে, এই চিন্তাটা বার বার খোঁচা দিচ্ছিল তার অন্তরে। বিপ্রদাসের ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তি পেল এই অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকে। দীপক দত্তের প্রতি অনুকম্পা রূপান্তরিত হলো আন্তরিক শ্রদ্ধায়।

সামান্য একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল বিপ্রদাস। প্রশংসার গুঞ্জনে কান ছিল না তার, নির্বিকার মনে রুমাল ঘষছিল চশমার কাঁচে। হঠাৎ চোখ তুলেই বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল সে:

'এ কি, দীপক কাঁদছে কেন?'

সকলের চোখ গিয়ে পড়ল কাঠগড়ায় আসামীর উপর। থরথর করে কাঁপছে আসামীর দেহ, ব্যথায় বেদনায় ম্লান মুখ তার ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে।

শ্রোতাদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনের সাড়া জাগবার আগেই শোনা গেল বিপ্রদাসের শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'কাঁদুক ও! এ ওর স্বপ্নভঙ্গের কান্না, জাহাজের কেবিন থেকে আজ পর্যন্ত আকুল আগ্রহে আঁকড়ে থাকা প্রেমের পবিত্র আদর্শ হারিয়ে যাওয়ায়, এ ওর নিঃসঙ্গ অন্তরের হাহাকার। এই আদর্শে উদ্বেল, ভাবপ্রবণতায় বিহ্বল মানুষ দীপককে প্রকাশিত করবারই চেষ্টা করছিলাম আমি। শেষ হয়েছে ওর সংকল্পের এক দুর্বহ বোঝা বহনের কাল। অপরের দোষ ঘাড়ে নেবার প্রাণান্তকর পরিশ্রম থেকে এইবার মুক্তি চায় ও।'

সঙ্গে সঙ্গে দোভাষীর পানে ফিরে বলল বিপ্রদাস, 'এইবার ওকে জিগ্যেস করুন তো—হত্যার পূর্বের ও পরের প্রতিটি বর্ণনা এবং তাতে ওর ভূমিকা যা আমি বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য কি না ?'

কথা বলতে বলতে দীপকের সামনে এসে দাঁড়াল বিপ্রদাস। একবার তার হাতের উপর রাখল নিজের হাত। তারপরই শুরু হলো দোভাষীর অঙ্গুলি সঞ্চালন, বিপ্রদাসের প্রশ্ন পৌঁছে গেল দীপকের কাছে। বিপ্রদাসের স্পর্শে হয় তো ছিল এক পরম সান্ত্বনার আভাস। নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল দীপক দত্ত। দোভাষীর হাত স্পর্শ করল তার আঙুল, মামলার মধ্যে প্রথমবার দেখা গেল সেই দানবাকৃতি মানুষটির দীর্ঘ আঙুলের রহস্যময় দ্রুত সঞ্চালন। দোভাষী উচ্চকণ্ঠে জানালেন বিপ্রদাসের প্রশ্নে দীপক দত্তের উত্তর ঃ

'আপনার বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।'

আবার প্রশ্ন করল বিপ্রদাস, 'তাহলে এখনও কি তুমি বলবে যে ৫ই মে তারিখে 'জলযাত্রা' জাহাজে মিঃ রবার্ট বিচামকে তুমিই স্বহস্তে হত্যা করেছো ?'

প্রশ্ন যথারীতি সঞ্চালিত হলো সাংকেতিক ভাষার মারফত। একটু পরেই দোভাষীর মুখে শোনা গেল দীপক দত্তের উত্তর, 'আমি স্বীকার করছি যে আমার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে আমি পূর্বে মিথ্যা বলেছি। মিঃ রবার্ট বিচামকে আমি হত্যা করিনি।'

কথা শেষ করেই ক্লান্ত, অবশ দেহের ভার যেন আর বইতে না পেরে বসে পড়ল দীপক।

মক্কেলের পানে একবার চেয়েই বিপ্রদাস ধরল তার ভাষণের খেই ঃ

'এই হত্যা-নাটকে দীপক দত্তের ভূমিকা এইখানেই শেষ হলো, দুঃখের দীর্ঘ পথ পার হয়ে মুক্তি পেল বেচারি। এইবার আমি সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই মিসেস রুবি দত্তকে। আশা করি এখন আর মিসেস দত্তের মিথ্যা বলার প্রয়োজন হবে না।

'মিঃ রবার্ট বিচামের লালসার জালে আপনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন কি না ?'

শোনা গেল লজ্জায় অবনত সাক্ষীর মৃদু উত্তর, 'হ্যাঁ।'

'গত ৫ই মে তারিখে 'জলযাত্রা' জাহাজে আপনি বেলা দুটো নাগাদ মিঃ বিচামের কেবিনে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম, গিয়েছিলাম আমার সঙ্গে ভবিষ্যতে মিলিত হবার চেষ্টায় মিঃ বিচামকে বিরত করার জন্য। আমার অনুরোধে মিঃ বিচাম সম্মত হবেন এ আশা আমার ছিল। এবং সম্মত না হলে হয় তো আমার স্বামীর শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় আমি তাঁকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু কেবিনে গিয়ে দেখলাম···মিঃ বিচাম নিহত হয়েছেন···পড়ে আছে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ।'

'আমার বর্ণনা আপনি শুনেছেন এবং ফলে ঘটনার অনেক হারানো সূত্রই এখন ফিরে পাওয়া স্বাভাবিক। এইবার ভালো করে ভেবে বলুন তো, মৃতদেহের পাশে আপনার সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা পড়ে থাকতে দেখেছিলেন কি না?'

'না। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় অত খুঁটিনাটি দেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই কয়েক মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভাসছিল শুধু রক্ত, তাজা লাল রক্ত···'

এই পর্যন্ত বলে মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মিসেস দত্ত। আবেগে বার বার কেঁপে উঠল তাঁর সারা দেহ।

শুনতে শুনতে অতসীও রাগে কেঁপে উঠল। কেন কে জানে তার বার বার মনে হচ্ছিল যে রুবি দত্ত কাঁদছে প্রেমিক মিঃ বিচামের শোকে। দীপককে কোনো দিনই ভালোবাসেনি এই দ্বিচারিণী নারী, ভবিষ্যতে কোনো দিন ভালোবাসতে পারবেও না। তার চিন্তায় বাধা পড়ল বিপ্রদাসের শান্ত প্রশ্নে, 'হত্যার আগে কি আপনি জানতেন না যে আপনার স্কার্ফটা হারিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, জানতাম। জাহাজে ওঠবার পর স্কার্ফটা আমার কাছেই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ সেটা আর পেলাম না, অনেক খুঁজেও পেলাম না। প্রথমটা আমি বিচলিত হয়েছিলাম; কিন্তু আমার স্বামীকে কিছু বলিনি। বলিনি কারণ জানতাম যে তার এই একান্ত প্রিয় বস্তুটি হারানোর সংবাদে সে ব্যথিত হবে। তারপর অবশ্য স্কার্ফটার কথা আর মনে ছিল না।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে হত্যার আগেই জাহাজে আপনার এই সবুজ স্কার্ফটা অপহৃত হয়েছিল। অপহরণকারী শুধু আপনাকেই ভালোভাবে চিনত না, সে জানত যে স্কার্ফটা আপনার পোশাকের একটা প্রধান অঙ্গ এবং তাতে মাখানো থাকত আপনার ব্যবহৃত সেন্টের বিশিষ্ট সুবাস। ··'জলযাত্রা' জাহাজেরই কেউ একজন মিঃ বিচামকে হত্যা করেছিল এবং হত্যার পর নিহতের পাশে রেখেছিল আপনার স্কার্ফ, যাতে হত্যার সন্দেহ আপনার ওপর গিয়ে পড়ে। দীপক সম্বন্ধে এই হত্যাকারীর কোনও মাথাব্যথাই ছিল না, তার আক্রোশের কেন্দ্র ছিলেন আপনি এবং মিঃ বিচাম।

'ডাঃ সেন এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল মহোদয়ের মতনই আমারও অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়েছে এই রহস্যময় এবং অত্যন্ত সুনিপুণ হত্যার উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে। হত্যাকারীর কারসাজির কথা ভাবতে ভাবতে বার বার বিস্মিত হয়েছি আমি। আপনার স্বামী স্কার্ফটা জলে ফেলে না দিলে এবং

তার নিজের আঙুলের চিহ্ন কেবিনের সর্বত্র ছড়িয়ে না রাখলে, পৃথিবীর কোনো কৌঁসুলীর সাধ্য ছিল না হত্যাপরাধ থেকে আপনাকে মুক্ত করা! তাই বলছি হত্যাকারীর আক্রোশের কেন্দ্র ছিলেন আপনি এবং মিঃ বিচাম।

'কে সেই লোকটি, কি তার পরিচয়? মিঃ বিচাম এবং আপনি নিশ্চয়ই তার কোনও ক্ষতি করেছিলেন? কি করেছিলেন এবং কি ক্ষতিই বা করেছিলেন? বৈষয়িক কোনও ক্ষতি? প্রথম থেকেই এ সম্ভাবনাটা আমার মনঃপূত হয়নি। নৈতিক ক্ষতি? হলেও হওয়া সম্ভব··· ··কিন্তু ক্ষতিটা সেণ্টিমেণ্টাল হতেই বা বাধা কোথায়? হৃদয়গত, কোনও আঘাত যে এই হত্যার মূলে থাকতে পারে, এ সম্ভাবনা কেন যে একবারও মনে আসেনি আমার, মনে আসেনি ধুরন্ধর কৌঁসুলী বা মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের? অথচ কার না জানা আছে যে হৃদয়ের বীণার তারে গভীরতম আঘাতই অনেক পরম সৃষ্টি আর চরম অনাসৃষ্টির কারণ! হত্যাকারী অথবা হত্যাকারীণ যদি শুধুমাত্র একটা যন্ত্র হয় তা হলে তার পিছনের যন্ত্রী, হয় একজন পুরুষ অথবা একজন নারী। যন্ত্রী কথাটা এই প্রথম বললাম, আশা করি পরে আমার ভাষণে ইনি প্রধান হয়ে উঠলে কেউ আশ্চর্য হবেন না। পুরুষ হলে তিনি হবেন ব্যর্থ প্রেমিক, মানে মিসেস দত্তের কাছে প্রেম চেয়েও পাননি। আর নারী হলে মিঃ বিচামের কোন পরিত্যক্ত প্রণয়িনী হতে বাধ্য।

'পুরুষের সম্ভাবনাটা অনেক ভেবেও আমার পছন্দ হয়নি। পছন্দ হয়নি কারণ মিসেস দত্ত মিঃ বিচামের জালে ধরা পড়েছিলেন ক্ষণিক দুর্বলতার বশে। এই তাঁর প্রথম স্খলন এবং হয়তো শেষ স্খলনও। অবশ্য মামলা চলাকালে সুবীর সরকারের কথা একসময়ে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই হত্যার ব্যাপারে ভদ্রলোকের কোনও গোপন হাত নেই তো! ক্ষণপরেই নিজের হাস্যকর চিন্তায় নিজেই লজ্জিত হয়েছিলাম। সময়ের ব্যবধান এবং পথের দূরত্ব তো উপেক্ষা করা যায় না! তখন পড়ে রইল দ্বিতীয় সম্ভাবনা; প্রতিদ্বন্দ্বিনী কোনও নায়িকার আবির্ভাব। সম্ভাবনার কথা মনে উঠতেই অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ চমকের মতন হঠাৎ দেখতে পেলাম রহস্যময়, তিমিরনিবিড় পথের আভাসিত একটা অংশ···

'অঙ্কের সংখ্যাগুলো পেলে যোগ করা অতি সহজ ব্যাপার। নায়িকার কথা মনে হতেই নামও এসে গেল। জুরীগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এই নায়িকার নাম মাদাম লোলা। এই ফরাসী অভিনেত্রীর নাগপাশ থেকে মিঃ রবার্ট বিচামকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন তাঁর বাবা, আর তারই পরিণতি 'জলযাত্রা' জাহাজে ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা। কিন্তু এ সবটাই পিতার চোখের চশমায় দেখা পুত্রের কীর্তি। এইবার মাদাম লোলার চোখ দিয়ে অবস্থাটা দেখবার চেষ্টা করলে সবকিছু আরও পরিষ্কার হবে। মিসেস দত্তর সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক আগেই মিঃ বিচামের মন ও মানিব্যাগ দুই অধিকার করে বসেছিলেন এই মাদাম। পরিচয়ের পরও দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলছিলেন মিঃ বিচাম; তবে খুব শান্তিতে নয়। অশান্তির ঝড় উঠেছিল মাদামের দিকে। মিঃ

বিচামের জীবনে নতুন প্রেমিকার আবির্ভাব সে টের পেয়েছিল। এইসব নারীর ক্ষেত্রে 'প্রেম' কথাটা ব্যবহার করার মতন মূর্খতা আমার নেই। স্বভাবতই 'সোনার হরিণ' হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছিল এই মোহিনী নারী। অন্য নৌকায় অবশ্য গোলমাল ছিল না। সরলা রুবি 'ডন জুয়ানের' কাহিনী জানত না, মিঃ বিচামও ঘুণাক্ষরে জানতে দেননি মাদামের অস্তিত্ব। তবুও মিঃ বিচামকে বিস্মিত করে রুবি হঠাৎ দাঁড়াল মুখ ঘুরিয়ে। বিবেকের তাড়নায় মনের ও দেহের আগুন হঠাৎ নিভে গেল রুবির, সে স্বামীকে নিয়ে ভারতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলল। প্রাকৃতিক নিয়মে না কি কোনও শক্তিই লুপ্ত হয় না, হয় রূপান্তরিত। রুবির পরিত্যক্ত উত্তাপ তাই সঞ্চারিত হলো মিঃ বিচাম আর মাদাম লোলার মনে। রুবির প্রতি মিঃ বিচামের আকর্ষণ হয়ে উঠল দুর্নিবার। ভদ্রলোক রুবির পিছু পিছু ভারতে যাওয়া ঠিক করে ফেললেন ; ভাবটা দেখালেন যেন পিতার অনুরোধেই তিনি স্বীকার করেছেন এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন। 'জলযাত্রা' জাহাজে যাত্রী হলেন মিঃ বিচাম··· ···আর তাই তাঁকে 'ডেকে' দেখে বিস্মিত হয়েছিল দত্ত-দম্পতি।

'অন্যদিকে মাদাম লোলার মনে জ্বলে উঠেছিল লোভের আগুন। তবুও খুব সাবধানে চলতে হচ্ছিল তাঁকে ; স্বামী যেন না কিছু জানতে পারে। হ্যাঁ, একটি স্বামী ছিলেন মাদামের এবং সেই বিশেষ মুহূর্তে কিছু আগে থেকেই তিনি সশরীরে লণ্ডনে অর্থাৎ মাদামের ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন।

'নাটকের ভিতরেও নাটক থাকে। এইবার সেই ভিতরকার নাটকের যবনিকা ওঠার পালা। স্থান—লণ্ডন, তারিখ—'জলযাত্রা' জাহাজ ছাড়ার আগের দিন, সময়—সন্ধ্যা। সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন স্বামী। এই সুযোগে মিঃ বিচামকে তার ফ্ল্যাটে একবার আসবার অনুরোধ জানালো মাদাম লোলা। নারীলোলুপ, দুর্বলচিত্ত মিঃ বিচামের এই অনুরোধ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না ; তা ছাড়া তাঁর ভয়ও ছিল। কেলেঙ্কারীর ভয়। খবরের কাগজ মারফৎ এমন একটা কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত করা মাদামের পক্ষে অসম্ভব ছিল না আর সময়টাও ছিল অনুকূল। ঠিক সেই সময়েই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁর বাবা। অতএব ··· ·অতএব ডাক পাবার কিছু পরেই মাদামের ফ্ল্যাটে উদয় হলেন এই পুত্ররত্ন! মিসেস রুবি দত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে একটা উপকার হয়েছিল মিঃ বিচামের। মাদাম লোলার স্বরূপটা চিনতে পেরেছিলেন তিনি, বুঝেছিলেন যে টাকা, শুধু টাকা পেলেই সন্তুষ্ট এই সর্পিনী নারী। নামেই সে ছিল অভিনেত্রী, স্বামীর আয়ও ছিল সামান্য। অতএব কিছু টাকা দিয়ে মাদামের মুখ বন্ধ করার অভিপ্রায়েই সেদিন গিয়েছিলেন মিঃ বিচাম।

'মিঃ বিচাম অবশ্য মাদামের স্বামীর অস্তিত্ব জানতেন কিন্তু পরিচয় জানতেন না। মাদামের ফ্ল্যাটে ভদ্রলোকের মুখোমুখি হবার সুযোগও আগে কোনোদিন হয়নি। 'মাদাম লোলা' এই নামের মধ্যেও তার স্বামীর পরিচয় ছিল না। ছিল ন' বলে খুশীই ছিলেন মিঃ বিচাম। খুশী ছিলেন শুধু এইটুকু জেনে যে তাঁর প্রণয়িনীর এই রহস্যময় স্বামীটি প্রয়োজনমতন স্ত্রীর

ফ্ল্যাটে অনুপস্থিত থাকে।

'দু'জনের প্রাথমিক আলাপ-আপ্যায়ন আমাদের কাছে অবান্তর। ধরে নিতে পারি কথাবার্তা এই ধরনের হয়েছিল ঃ

'কত টাকা পেলে তুমি খুশী হবে?' সোজা জিগ্যেস করলেন মিঃ বিচাম।

'পঞ্চাশ হাজার।'

'শেষ পর্যন্ত অনেক দর কষাকষির পর বিশ হাজারে রফা হলো। সেখানেই মাদামের নামে চেক কেটে দিলেন মিঃ বিচাম। চেকটায় অবশ্যই মাদামের পুরো নাম লেখা হলো। আমি খবর পেয়েছি যে চেকটা পরের দিনই ভাঙানো হয়েছিল এবং সেই সূত্রে মাদামের স্বামীর উপাধিটুকু পেতেও আমার অসুবিধা হয়নি।

'চেক লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাইরের দিকে পা বাড়াবেন মিঃ বিচাম, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। চেনা আওয়াজ—স্বামী হঠাৎ ফিরে এসেছেন। পেছনের সিঁড়ির দরজাটা চেনাই ছিল মিঃ বিচামের। তৎপর হয়ে সেদিকে পা বাড়ালেন তিনি, মাদাম এগিয়ে গেল দরজা খুলে দিতে। বিধাতার বিচিত্র বিধানে ঘরে পা দিতেই স্বামীর চোখে পড়ল অপসৃয়মান মিঃ বিচামের দেহের একাংশ। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন স্বামী, শুরু হলো স্ত্রীর উপর অত্যাচার। বেচারি মাদাম শেষে কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করে ফেললেন ঃ

'রবার্ট···মিঃ রবার্ট বিচাম ··কিন্তু আর কোনোদিন সে আমার ঘরে আসবে না; কাল সে তোমারই জাহাজে তার প্রণয়িনীর পিছু পিছু চলে যাবে ভারতবর্ষের পথে। প্রণয়িনীর পরিচয়টাও দিতে বাধ্য হলেন মাদাম।

'মিঃ বিচাম অবশ্য এই সবের কিছুই জানতে পারেননি, জানতে পারেননি যে মাদাম লোলার ফরাসী স্বামীও প্রতি মাসেই চাকরির সুবাদে একবার 'জলযাত্রা' জাহাজে ভারতের পথে যাত্রা করেন এবং সেই বারও করবেন।

'স্বামী-স্ত্রীর ভাব হতে বিলম্ব হয়নি। সে রাত্রিটাও তাদের ভালোই কেটেছিল। স্বামী খুশী ছিলেন স্ত্রীকে একান্তভাবে কাছে পেয়ে আর স্ত্রী বিভোর ছিল বিশ হাজার টাকার স্বপ্নে।

'পরের দিন 'জলযাত্রা' জাহাজ ছাড়ল। জাহাজের পথ-ঘাট, নিয়মকানুন সব অন্ধি-সন্ধিই জানা ছিল মাদামের এই স্বামীটির; দু'বছর ধরে প্রতি মাসে লণ্ডন-কলকাতা যাতায়াত করেছিলেন ভদ্রলোক। সুতরাং তাঁর পক্ষে মিঃ বিচামের কেবিন এবং দত্ত-দম্পতির কেবিন খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি। মতলবও তাঁর স্থির হয়ে গিয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার পরের দিনই তাঁর পরিকল্পনার প্রথম পর্ব নিখুঁতভাবে সমাধা করলেন তিনি। মিসেস দত্তের সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা চুরি করলেন—উদ্দেশ্য মিঃ বিচামের প্রণয়িনীকে তাঁর জালের মধ্যে জড়িয়ে আনা।

'অপমানে, ক্রোধে, ক্ষোভে জ্বলছিল স্বামীর বুক, তাঁর সারা সত্তা আচ্ছন্ন করে জ্বলছিল প্রতিহিংসার আগুন। এই আগুনই বোধ হয় তাঁকে এই নির্মম পরিকল্পনা রচনায় এবং সেই বন্ধুর পথ নিপুণভাবে পার হওয়ার সাহায্য

করেছিল। প্রথম কাজ মিঃ বিচামকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া, তাঁর স্ত্রীর পথে এই পাপিষ্ঠের ছায়া যেন আর কখনও না পড়ে। তার আগেই হত্যার সন্দেহ যাতে মিঃ বিচামের প্রণয়িনী মিসেস দত্তর উপর গিয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিবাহিতা রমণী নিজের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে মিঃ বিচামের মতন লম্পটকে হত্যা করেছে—এমন একটা কাহিনী সকলেই বিশ্বাস করবে। হত্যাটা নিয়ে দু'চারদিন একটু হৈ চৈ নিশ্চয়ই হবে; মিঃ হেনরী বিচামের একমাত্র পুত্রের হত্যা বলেই অবশ্য। তারপর কলকাতার আদালতে বিচার হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি পাবে হত্যাকারিণী।

'মিসেস দত্তর গলায় জড়ানো সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা জাহাজে ওঠার সময়েই লক্ষ্য করেছিলেন তিনি; তারপর ডেকে ভদ্রমহিলার পাশে দাঁড়িয়ে তার সুরভিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। নিহত মিঃ বিচামের পাশে জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ এই স্কার্ফটাই ফেলে আসা ছিল এই প্রকৃত হত্যাকারীর উদ্দেশ্য।

'পরিকল্পনার প্রথম পর্ব নিপুণভাবে সমাধা হলো, নিখুঁত ভাবেও। কিন্তু প্রত্যেক পাপের মধ্যে হয়তো সামান্য একটু ভুলকে কেন্দ্র করে, লুকিয়ে থাকে পাপীর পরিচয়। একেই বোধ হয় বলে ধর্মের কল। সেই কল এক্ষেত্রেও নড়ল। প্রথম নাড়া দিল দীপক দত্ত। সবুজ স্কার্ফই হলো কাল; তারই সুরভিতে মিঃ বিচামের কেবিনে স্ত্রীর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল দীপক দত্ত।

'দ্বিতীয় কল নড়ল স্ত্রীকে প্রেরিত স্বামীর একটি টেলিগ্রামে। খুনের পর প্রতিহিংসার আগুন মন্দীভূত হলেও স্ত্রীর প্রতি ক্রোধের অবশেষটুকু তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছিল। শিক্ষা দিতে হবে স্ত্রীকে যাতে আর কোনো প্রণয়ীকে ফ্ল্যাটে ডাকার সাহস তার না হয়।

'খবরের কাগজে যথাসময়ে মাদাম মিঃ বিচামের হত্যা সংবাদ পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিস্মিত হয়েছিলেন অপরাধী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির নাম পড়ে—সে নাম তার স্বামীর নয়, সে নাম মিঃ বিচামের প্রণয়িনীর স্বামীর। কিন্তু সবচেয়ে তাঁকে বিহ্বল করেছিল প্রায় পর পরই পাওয়া ছোট্ট একটা টেলিগ্রাম—তাতে লেখা 'তোমার দুঃখে সত্যিই দুঃখিত', তলায় তাঁর স্বামীর নাম।

'আমি বলেছি খবরের কাগজে হত্যা সংবাদ পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন মাদাম। বরঞ্চ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বললেই ঠিক বলা হবে। স্বামী যে এই হত্যার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েনি এইটুকু জেনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। স্বামী জড়িয়ে পড়লে বিপদ হতো। তদন্তে ধরা পড়তে দেরী হতো না যে মিঃ বিচাম জাহাজে যাত্রার আগের দিন শেষ মোটা অঙ্কের চেক কেটেছিলেন হত্যাকারীর স্ত্রীর নামে। তখন? ·····

'আমাদের মামলার প্রয়োজনে মাদাম লোলার ভূমিকা এইখানেই শেষ হলো। এইবার খুঁজে বার করতে হবে তার স্বামী-রত্নটিকে এবং সেই সঙ্গে মিঃ বিচামের হত্যাকারীকে। খুব কঠিন হবে না এই কাজ, কারণ প্রয়োজনীয়

সব প্রমাণ আমি আগেই সংগ্রহ করেছি। আমার প্রয়োজনে মিসেস দত্তর ভূমিকাও এইখানে শেষ। আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি এখন যেতে পারেন।'

মিসেস রুবি দত্ত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্রদাস ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম পাঁচজন সাক্ষীকে পর্যায়ক্রমে পুনরায় ডাকার জন্য আদালতকে অনুরোধ জানাল। স্থির হলো যে পূর্বে যে ক্রমানুসারে তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন সেই ভাবেই একে একে আসবেন এবং বিপ্রদাসের প্রশ্নের জবাব দেবেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রথমেই এলেন জাহাজের ভাণ্ডারী মিঃ পল হোমস।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, 'মিঃ হোমস, আপনি বলেছেন যে নিহত মিঃ বিচামকে তাঁর কেবিনে আপনিই প্রথম আবিষ্কার করেন—এ কথা কি ঠিক ?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস রুবি দত্তের অনুরোধে জাহাজের কোষাধ্যক্ষ আপনাকে সব সৌখীন কেবিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজ করতে বলেছিলেন—তাই না ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'মিঃ বিচামের কেবিনের দরজা আধখোলা দেখে আপনি নিশ্চয়ই বিশেষ বিস্মিত হয়েছিলেন ?'

'আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। কি বলতে চান আপনি ?'

'আমি বলতে চাই যে আপনি দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা দেখবেন আশা করেছিলেন। পরিবর্তে বিস্মিত হয়ে দেখলেন—আধখোলা দরজার গায়ে মৃতদেহটা ঝুলছে আর কেবিনের বিছানায় বসে আছে দীপক দত্ত !'

'আমি……'

'বিস্মিত হচ্ছেন ?' সাক্ষীকে কথা বলতে না দিয়েই বলে চলল বিপ্রদাস, 'কারণ প্রায় দু'ঘণ্টা আগে কেবিন ছেড়ে যাবার সময় যে রকমটা দেখে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে অনেক প্রভেদ ছিল এই দৃশ্যের।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কোষাধ্যক্ষের হুকুমে মিঃ বিচামের ঘরে ঢোকবার দু'ঘণ্টা আগে আপনি আর একবার ওই একই কেবিনে ঢুকেছিলেন ; সেবার ঢুকেছিলেন আপনার চাবি দিয়ে দরজা খুলে। মিঃ বিচাম তখন বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। তিন দিন ধরে মিঃ বিচামের গতিবিধি, তাঁর প্রত্যেকটি অভ্যাস ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং তাঁর এই দিবানিদ্রার সময়টুকু আপনার অজানা ছিল না। অতি সন্তর্পণে কেবিনে ঢুকে দাঁড়ালেন যাতে মিঃ বিচামের ঘুম না ভেঙে যায়। চোখ নামাতেই দেখলেন হাতের কাছে টেবিলে রয়েছে কাগজ-কাটা ছুরি। এইটাই আপনি চাইছিলেন। সূচীতীক্ষ্ম ছুরি আপনার কাজের পক্ষে আদর্শ অস্ত্র, অথচ যেটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কষ্টও আপনাকে স্বীকার করতে হয়নি। ঘুমন্ত মানুষটি কোনও বাধা দিলেন না, নীরবে দিবানিদ্রা থেকে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।'

'কি সব বাজে কথা বলছেন আপনি', ক্রোধে ফেটে পড়ল সাক্ষীর কণ্ঠস্বর।

শ্রোতাদের কণ্ঠ থেকে আবার একটা গুঞ্জনের ঢেউ ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে থামবার হুকুম দিলেন বিচারপতি, টেবিলে জোরে হাতুড়ি ঠুকে সকলকে দিলেন সাবধান করে। আবার প্রশান্ত কণ্ঠে শুরু করল বিপ্রদাস, 'মিঃ হোমস, আমি বলছি যে গত ৫ই মে তারিখে. ১-৩৫ মিঃ সময় আপনি 'জলযাত্রা' জাহাজের সৌখীন কেবিনে মিঃ রবার্ট বিচামকে কাগজ-কাটা ছুরির আঘাতে ঘাড়ের রক্তবাহী শিরা ছিন্ন করে হত্যা করেছেন। এই হত্যার অপরাধে আপনাকে অভিযুক্ত করছি আমি। ছুরিতে আপনার আঙুলের ছাপ ছিল না কারণ আপনার হাতে দস্তানা পরা ছিল। আরও একটু আছে—আপনি ইচ্ছে করেই ছুরিটা এবং আগেই জাহাজে চুরি করা মিসেস রুবি দত্তর সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা বিছানায় ফেলে এসেছিলেন। তাই তো জানতে চাইছিলাম, দরজা আধখোলা আর বিছানায় উপবিষ্ট দীপক দত্তকে দেখে আপনি বিস্মিত হয়েছিলেন কি না?'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না' প্রায় খাবি খেতে খেতে বলল সাক্ষী।

'এখনও বুঝতে পারছেন না? কি বলছেন মিঃ হোমস? বুঝতে পারছেন না অথচ আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে, কপালে ঘাম জমছে। নাঃ, আপনার স্মৃতিশক্তি সত্যিই দুর্বল দেখছি। আচ্ছা আরও একটু খুলে বলি, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। পুলিশের রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হয়ে আমি নিজেই কিছু কিছু খোঁজ খবর নিয়েছি, অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি, রামপুরহাট গেছি……জাহাজ কোম্পানীর অফিসেও কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। প্রথমেই দেখলাম আলোচ্য লণ্ডন-কলকাতা ভ্রমণে 'জলযাত্রা' জাহাজের যাত্রীর তালিকা। তারপর জাহাজ থেকে প্রেরিত টেলিগ্রামগুলোর নকলে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ছোট একটা টেলিগ্রাম—তোমার দুঃখে সত্যিই দুঃখিত, তলায় নাম লেখা 'পল'—পড়ে কেমন খটকা লাগল মনে। অতি নিরীহ টেলিগ্রাম, সন্দেহ করবার কিছু সত্যিই ছিল না। কে আর টেলিগ্রামে উল্লিখিত 'দুঃখে'র সঙ্গে জাহাজে সংঘটিত হত্যার যোগাযোগ কল্পনা করবে? কিন্তু আমার মাথায় তখন শুধু ঘুরছে জাহাজের ওই হত্যার কথা। তাই হত্যার ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই জাহাজ থেকে প্রেরিত এই টেলিগ্রামটায় একটু মন দিলাম। দেখলাম টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছে লণ্ডনে এক মাদাম লোলার কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে আমার এক বিশেষ বন্ধুর কাছে এই মাদামের সম্পূর্ণ পরিচয় খোঁজ নিয়ে জানবার জন্য টেলিগ্রাম করলাম। অনেক খবরই পেলাম। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান খবর হচ্ছে মাদামের প্রণয়ীর তালিকায় 'জলযাত্রা' জাহাজে নিহত মিঃ বিচামের নাম। দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় খবর হচ্ছে মাদামের স্বামীর নাম। তিন বছর আগে বিয়ে হয়েছিল মাদামের এবং তাঁর স্বামীর নাম মিঃ পল হোমস। অবশ্য 'মাদাম লোলা' নামটা ত্যাগ করেননি মহিলা, কেন করেননি তা ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। এই নামেই তিনি তাঁর বিশেষ মহলে পরিচিত।

স্বামী এবং স্বামীর নাম দুইই এই মহিলার জীবনে কোনও স্থান পায়নি।

'ধর্মের কল আবার নড়ে উঠল। টেলিগ্রাম প্রেরক মিঃ পল এবং মাদার লোলার স্বামী মিঃ পল হোমস—তাহলে কি? এই সূত্র ধরেই অগ্রসর হলাম আমি। মিঃ পল নামে একজন তাহলে হত্যার পূর্বে, হত্যার সময় এবং হত্যার পর জাহাজেই ছিলেন এবং তিনি লণ্ডনস্থ মাদাম লোলার স্বামী হওয়াই উচিত। যাত্রীদের তালিকায় মিঃ পলকে খুঁজে পেলাম না। সংগ্রহ করলাম জাহাজের কর্মচারীদের তালিকা। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম অন্যতম ভাণ্ডারী মিঃ পল হোমসের নাম। আর সবচেয়ে যা বিস্ময়কর, এই মিঃ পল হোমসের উপরেই ভার ছিল সৌখীন কেবিনের যাত্রীদের অন্যতম যাত্রী মিঃ রবার্ট বিচামের তত্ত্বাবধানের ভার। অঙ্কের সংখ্যা দুটো যখন পাওয়া গেল তখন যোগ করে নির্ভুল ফল বার করতে বিলম্ব না হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো এই বিস্ময়কর যোগাযোগটুকুর সন্ধান আমি পেয়েছি নিয়তির অনিবার্য বিধানে। কিন্তু দৈবের অনুগ্রহ বিনা পৃথিবীতে কোন অঘটনই বা কবে সম্ভব হয়েছে!'

এইবার শ্রোতাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত উচ্ছ্বাস আর কোনও বাধা মানল না। উল্লাসে দাঁড়িয়ে উঠে অতসী দেখল এই প্রশংসার প্লাবনের মুখে কেমন অসহায় হয়ে পড়েছে বিপ্রদাস; বার বার ঝুলে পড়া চশমাটা ঠিক করে বসাবার চেণ্টা করছে আর ব্যর্থ হয়ে হচ্ছে অধিকতর বিব্রত। অল্প পরেই নিজেকে সামলে নিল বিপ্রদাস। দু'একবার খুক্ খুক্ করে কেসে গলাটা পরিষ্কার করে বলে চলল ঃ

'আদালত এবং জুরী মহোদয়ের কাছে আমার নিবেদন—মিঃ রবার্ট বিচামের হত্যাকারী আপনাদের সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। হত্যাকারী মিঃ পল হোমসের বিচারের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই করবেন এবং তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য আমার চেয়ে উপযুক্ত কৌঁসুলীর অভাব নিশ্চয়ই হবে না। আমি যে দায়িত্বভার নিয়েছিলাম তা যথাযথ পালন করতে পেরেছি, শুধু এইটুকুতেই আমি তৃপ্ত। আমার মক্কেল দীপক দত্ত যে অচিরে মুক্তি পাবে, এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। মক্কেলের কাছে কোনও ধন্যবাদ আমি আশা করি না, আশা করলেও হয় তো পাব না কারণ স্ত্রীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তার জীবনের সোনার স্বপ্ন আমি ভেঙে দিয়েছি। মিসেস রুবি দত্ত যে এগিয়ে এসে একটা মিণ্টি কথা বলবেন তাও নয়। বরঞ্চ আমায় দেখলে তিনি চোখ ফিরিয়ে নেবেন; জীবনের গোপন রহস্য যে সকলের চোখের সামনে মেলে ধরেছে সে শত্রু ছাড়া আর কি! আর দত্ত পরিবারের অন্যান্যেরা—তাঁরা আমার মুণ্ডপাত করছেন দীপক দত্ত মুক্তি পেল বলে। তবু, এই সবের মধ্যেও একটু আশার আলো আছে বৈ কি! আমি জানি অন্ততঃ একজন আমার মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবেন—ফাদার লরেন্সের কথা বলছি আমি। আমার জীবনে এইটুকুই পরম লাভ।…

আবার সেই লোয়ার সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাট। আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আলো এসে পড়ছে ঘরে। টেবিলের ওপর সবুজ শেড দেওয়া টেবলল্যাম্পটা জ্বলছে, বাইরের আলোর আভা পড়ে কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছে এই বিদ্যুতের বাহার। পাশের আরাম কেদারায় ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে বিপ্রদাস। পাশে ধূমায়িত কফির পেয়ালা, কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই নেই। খেয়াল নেই অতসীর উপস্থিতটুকুও। চেয়ারে বসে কত কথাই বলে যাচ্ছে অতসী। কিছু শুনছে না বিপ্রদাস, চোখ বুজে কি যেন ভাবছে এই প্রৌঢ় ব্যারিস্টার, কোন অচেনা জগতে যেন উড়ে গেছে তার মন।

কি ভেবে শেষে উঠে পড়ল অতসী। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি এখন যাই। আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।' চোখ না খুলেই মৃদুস্বরে উত্তর দিল বিপ্রদাস, 'আর একটু বসো অতসী, সারা দিনের কোলাহলের পর তোমার মিষ্টি কথাগুলো শুনতে ভালই লাগছে। তা ছাড়া প্রচণ্ড ঝড়ের পর পাশে কেউ না থাকলে নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়।'

'উঃ অসাধ্য সাধন করেছেন আপনি। দীপককে শুধু মুক্তিই দেননি, তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'

'যাক, আমার কন্যা যে আমার বক্তৃতা শুনে নিরাশ হয়নি, এটুকুই যথেষ্ট। বলতে বলতে মনে হচ্ছিল সকলেই বুঝি আমার বিরুদ্ধে, এমন কি আমার মক্কেলও···সে পরের দোষ কাঁধে নিয়ে ফাঁসী যাবে তবু স্ত্রীর অপবাদ সহ্য করবে না।'

'বিরুদ্ধে বলছেন কেন। আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি কিন্তু আমি দেখেছি কি আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার দীর্ঘ ভাষণের প্রতিটি কথা শুনছিল! শেষে মনে হচ্ছিল আপনি শুধু আসামী পক্ষের কৌঁসুলী নয়, আপনি একাধারে পুলিশ, বিচারক, আসামী এবং ফরিয়াদী পক্ষ—এক কথায় যেন ন্যায় বিচারের মূর্ত প্রতীক।'

'থাম, থাম, জান তো সেই সর্ববিদ্যাবিশারদ জ্যাকের অপবাদ···'

হেসে ফেলে অতসী প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা এরপর কি হবে?'

'মিঃ পল হোমসের বিচার হবে এবং হয়তো শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। মোট কথা মিঃ সোম খুশী হবেন কারণ তাঁর চাই কাঁচা মাথা, তা সে দীপকেরই হোক বা হোমসেরই হোক।'

'আর মিঃ হোমসের স্ত্রীর?'

'মাদাম লোলার? ধনী প্রণয়ীর মৃত্যুতে দুঃখিত হবেন, না অবাঞ্ছিত স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে খুশী হবেন বলা বড় শক্ত।'

'আচ্ছা দীপককে ওরা এখনই ছেড়ে দিল না কেন? এত কষ্ট পাচ্ছে বেচারী।'

'বিচারের যন্ত্রটা বড় জটিল অতসী, ওটা একবার চললে থামতে একটু দেরী হয়। তবে ভাববার কিছু নেই, দিন তিনেকের মধ্যেই দীপক তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে।'

'স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে? আমার বিশ্বাস এমন বোকামি ও করবে না!'

'করতেই হবে, কন্যা—না করে উপায় নেই। রুবি ভিন্ন ওর চলবে কেমন করে? বুদ্ধিমান ছেলে দীপক, ও এখনই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে বাল্যাবধি ওর প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি ও সাহায্যের তুলনায় রুবির এই সাময়িক বিচ্যুতি, একটা অতি সামান্য ঘটনা। মানে কোনো ঘটনাই নয়। দীপক আর রুবি, এ দু'জনকে আলাদা করে ভাবতেই পারি না···

'এ হতেই পারে না! ওই নির্লজ্জ, স্বার্থপর রুবি হবে দীপকের প্রেমের অবলম্বন! এ অসম্ভব!' হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা যেন ফেটে পড়ল অতসীর কণ্ঠস্বরে।

বিস্মিত চোখ তুলে তার এই সরল সংযত কন্যাটির পানে তাকিয়ে বিপ্রদাস শুধু বলল, 'তোমার আবার কি হলো?'

নিজের কণ্ঠস্বর কানে যেতে অনিচ্ছাকৃত এই বাচালতার জন্য অস্বস্তি বোধ করছিল অতসী। বিপ্রদাসের ক্ষুদ্র প্রশ্নে লজ্জায় মাথা নীচু করে অস্ফুটস্বরে শুধু বলতে পারল, 'না কিছু না।' তারপরই কথার মোড় ঘুরিয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'আর আপনি? এরপর আপনি কি করবেন?'

'আমি? এখন একমাত্র কামনা ভোর না হওয়া পর্যন্ত একটানা একটি ঘুম। মানে, অন্ধ-কালা-বোবা, লণ্ডনের নটী, জাহাজের কর্মচারী, রামপুর-হাটের মিশনারী, এদের দুঃস্বপ্ন রাত্রির বিশ্রামে না বাধা দেয়।'

'তাহলে আমি এইবার উঠি। আপনাকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

উঠে পড়ল অতসী। হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল সে। বিপ্রদাস তাকে ইতস্তত করতে দেখে হেসে বলল, 'কি কিছু বলবে?'

'একটা প্রশ্ন, যদি বিরক্ত না হন।'

'বলই না শুনি।'

'ওই সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা সম্বন্ধে। ওইটার অস্তিত্ব আপনি আবিষ্কার করলেন কি করে? স্কার্ফটা সম্বন্ধে একমাত্র অবহিত ছিল দীপক এবং সেই ওটা সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিল। অথচ ওই স্কার্ফটার মধ্যেই লুকিয়েছিল রহস্যের চাবিকাঠি। মৃতদেহের পাশে স্কার্ফটা পড়ে না থাকলে দীপকেরও স্ত্রীর অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার কোনও কারণই ঘটত না।'

'ঠিকই ধরেছো তুমি। সত্যিই, সিল্কের স্কার্ফটার অস্তিত্ব আমি না জানলে দীপক দত্তকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতেই হতো! কিন্তু জানলাম কি করে? ঠিক কি করে তা এখন নিজেই বলতে পারবো না। রুবি দত্তর সঙ্গে আমার

প্রথম দেখা হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে—মনে আছে তোমার ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতেই পারছো, দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও এই তরুণীকে সেদিন আমি পুঙখানুপুঙখভাবে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। দুটো জিনিসে আকৃষ্ট হয়েছিলাম—একটা হচ্ছে তরুণীর অঙ্গের সুমিষ্ট সুবাস আর অন্যটা তার গলায় জড়ানো ধূসর রঙের সিল্কের স্কার্ফ। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল পূর্বরাত্রে পড়া 'নির্বাসিত আত্মা' উপন্যাসের একটা অংশ। অন্ধ-মূক-বধির নায়কের স্ত্রীর বর্ণনায় লেখক বলেছেনঃ 'তার গলায় সব সময় জড়ানো থাকতো একটা সুবাসিত সবুজ সিল্কের স্কার্ফ। অন্ধ স্বামীর প্রিয় ছিল সবুজ রঙ, একটি বিশিষ্ট সুবাসের প্রতি ছিল তাঁর আগ্রহ। স্বামীকে খুশী করবার জন্য এই স্কার্ফটা পরতে স্ত্রীর কখনোই ভুল হতো না। সুবাসের মাধ্যমেই স্বামী বুঝতে পারতেন স্কার্ফটার অস্তিত্ব, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রিয় রঙটার কথা কল্পনা করে উল্লসিত হতেন।' সেইদিন থেকে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে দত্ত-দম্পতির জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনার প্রতিফলন সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। তার স্ত্রীর গলায় জড়ানো সুবাসিত স্কার্ফ যে দীপকেরও অতি প্রিয় বস্তু এ-সিদ্ধান্ত আমার মনে আপনি গড়ে উঠেছিল। তারপর নানা কাজে জড়িয়ে পড়লাম, ভুলে গেলাম স্কার্ফটার কথা।

'দিন পাঁচেক পরে মিসেস দত্ত আবার এলেন দেখা করতে, আমার বসবার ঘরে। ভদ্রমহিলা ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্ট সুবাসে আকৃষ্ট হলাম। ধূসর রঙের সিল্কের স্কার্ফটা আবার জুড়ে বসল আমার চিন্তা। অনেকগুলো প্রশ্ন মনে জড়ো হয়েছিল। সেদিন কথার ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো বলে ফেললাম। উত্তরে দুটো জিনিস জানলাম—প্রথম, তাঁর ব্যবহৃত সেই বিশেষ সুবাসটি ছিল মিঃ দত্তের একান্ত প্রিয় আর দ্বিতীয়, গ্রেপ্তার হবার দিন পর্যন্ত মিঃ দত্তের ধারণা ছিল যে স্কার্ফটার রঙ সবুজ। সবুজই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রঙ, সরসতার প্রতীক।

'এরপর আমি একটু ঔৎসুক্য দেখাতেই ভদ্রমহিলা নিজের থেকে স্কার্ফ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করলেন। অর্থাৎ কথাগুলো তিনি বলতেই চাইছিলেন, আমার কৌতূহলে উৎসাহ পেলেন আর কি! যা বললেন তার মর্মার্থ এইঃ লণ্ডনে সবুজ সিল্কের একটা স্কার্ফ দীপক তার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল। ফিরে আসবার সময় 'জলযাত্রা' জাহাজে দ্বিতীয় দিনেই কিন্তু হারিয়ে গেল স্কার্ফটা। অনেক খুঁজলেন মিসেস দত্ত কিন্তু পেলেন না। স্বামীকে ব্যাপারটা জানালেন না, বেচারি ব্যথিত হবে এই ভেবে। ঠিক একই ধরনের কিন্তু ধূসর রঙের আর একটা স্কার্ফ ছিল তাঁর সুটকেসে। সেটাই সুবাসিত করে পরে নিলেন। অন্ধ স্বামী সুবাসে তৃপ্ত এবং স্কার্ফটা নাড়াচাড়া করে আগের মতনই আনন্দিত হলেন। তাঁর কল্পনায় রঙটা সবুজই থেকে গেল। তা থাক, শান্তি বিঘ্নিত হবার পরিবর্তে এইটুকু মিথ্যার আশ্রয়ে

কোনো দোষ ছিল বলে স্ত্রীর মনে হয়নি।

'এদিকে সময় বয়ে চলল, এগিয়ে আসতে লাগল মামলার দিন। আবার একবার দেখা হলো মিসেস দত্তর সঙ্গে, আবার চোখে পড়ল সেই ধূসর স্কার্ফ। কেন জানি না ধীরে ধীরে আমার মনে একটা ধারণা গড়ে উঠছিল—মনে হচ্ছিল এই হত্যার ব্যাপারে সিল্কের স্কার্ফটার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, হত্যার সঙ্গে কোথায় যেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া সবুজ সিল্কের স্কার্ফটার। এই প্রেরণাটুকু তুমি দৈবানুগ্রহ বলতে পার। ধর্মের কল নাড়াবার জন্যেও তো একটা উপলক্ষ্য চাই; এই সন্দেহের মধ্যেই সেই উপলক্ষ্যের প্রথম উন্মেষ।

'এই সময় আমি শুরু করলাম হত্যার ঘটনাগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সাজিয়ে একটা পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য রূপ দেবার কাজ। প্রথম খটকা লাগল কেবিনের সর্বত্র ছড়ানো দীপকের হাতের ছাপ নিয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে ইচ্ছে করেই এলোমেলোভাবে সে ছাপগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন? অন্যের দোষ স্বেচ্ছায় বরণ করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই অন্যটি কে? জাহাজে একজন ছিল যার জন্যে দীপক প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণেও কুণ্ঠিত হতো না। সেই একজন তার স্ত্রী, রুবি দত্ত। সেই একজনই তাহলে কল্পিত 'অন্য' ব্যক্তি হওয়া স্বাভাবিক, প্রায় সুনিশ্চিতও। এই পর্যন্ত চিন্তার পর সিদ্ধান্ত হলো যে রুবি দত্তই খুন করেছিলেন মিঃ রবার্ট বিচামকে এবং কেবিনে ঢুকে স্ত্রীর এই অপকর্মের অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিল দীপক। কি সেই প্রমাণ? সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা হতেই বা বাধা কি! রুবি দত্তর ভুলে ফেলে আসা স্কার্ফের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল দীপকের ঘ্রাণশক্তিতে। তাহলে কী জাহাজে সবুজ স্কার্ফ হারিয়ে যাওয়ার কাহিনীটা বানানো?

'এই সূত্র ধরে নানাভাবে সাজালাম ঘটনার কাহিনীকে। কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধি রুবি দত্তকে হত্যাকারিণী হিসাবে স্বীকার করতে কিছুতেই সম্মত হলো না। বার বার একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এল আমার মনে—কেন, কি কারণে, মিঃ বিচামকে হত্যা করবে রুবি দত্ত? উত্তরটা পাওয়া অবশ্য কঠিন হলো না। অন্যায় সংসর্গ থেকে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব এবং তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় মানুষের দুষ্কৃতির দুর্গম পথে পা বাড়ানো কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সংশয়ের তবুও শেষ হলো না। মিঃ বিচামের মতন একজন শক্তিমান পুরুষকে রুবির মতন ক্ষীণাঙ্গী তরুণীর একটা কাগজ-কাটা ছুরির সাহায্যে হত্যা করা কি সম্ভব? কোনও যুক্তি দিয়েই এই বাধাটুকু আর অতিক্রম করতে পারছিলাম না। একবার মনে হলো—যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে রুবি। এই প্রথম তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ছায়া ফেলল আমার কল্পনায়।

'সাধনা আর সিদ্ধির মাঝে সামান্য একটু ফাঁক থেকেই যায়। সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে মানুষের মন। এই সন্ধিক্ষণে এগিয়ে আসে বিধাতার আশীর্বাদ, অলক্ষ্য হস্ত এসে জুড়ে দিয়ে যায় ফাঁকটুকু। এই দৈবানুগ্রহের

অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে মানুষের অসাধ্য সাধনের ইতিহাসে। আমার চিন্তার পথও আলোকিত হলো এমনি এক আকস্মিকতার আশীর্বাদে। হঠাৎ মনে হলো এই তৃতীয় ব্যক্তি রুবি দত্তর সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ হলেই বা ক্ষতি কি! এমনও তো কেউ থাকতে পারে যার হিংস্র দৃষ্টি অনুসরণ করেছিল এই দুজনকে—মিঃ রবার্ট বিচাম আর মিসেস রুবি দত্তকে। হয়তো সে উভয়ের প্রতি প্রচণ্ড এক আক্রোশ পোষণ করেছিল। এই ব্যক্তিই হত্যা করেছিল মিঃ বিচামকে এবং সেই হত্যার দায় চাপাতে চেয়েছিল রুবি দত্তের ওপর। শেষটুকুর জন্যে প্রয়োজন ছিল নিহত বিচামের দেহের পাশে অকাট্য কোনও প্রমাণ ফেলে আসা। তাই সে করেছিল। এবং এরই ফলে জাহাজে ওঠার পরই চুরি গিয়েছিল রুবির সুবাসিত সবুজ সিল্কের স্কার্ফটা।

'এইভাবে হত্যার কাহিনীটুকু সাজিয়ে নিয়েছিলাম। এর পিছনে প্রায় সবটাই ছিল কল্পনা। কিন্তু দীপক যে মিঃ বিচামের কেবিনে স্ত্রীর স্কার্ফটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল, তার প্রমাণ কি? আদালতে সামান্য একটু পরীক্ষার মাধ্যমে এই প্রমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। ফলাফল তুমি স্বচক্ষে দেখেছো। পরিচিত সুবাস পেতেই চমকে উঠেছিল দীপক, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই সুবাসের কেন্দ্র স্কার্ফটা স্পর্শ করার আকুল আগ্রহে। সেই মুহূর্তে তার মনে জেগেছিল বিস্ময়ের পর বিস্ময়। কোথা থেকে এল সেই সুবাসিত সবুজ স্কার্ফ তার স্ত্রীর অঙ্গে? সমুদ্রের জলে যার শেষ সমাধি নিজের হাতে রচনা করে এসেছে, সেই সবুজ সিল্কের স্কার্ফ? দীপকের পরবর্তী বিক্ষোভ তোমার অজানা নেই। এই হচ্ছে স্কার্ফের রহস্য উদ্ঘাটনের সামান্য কাহিনীটুকু, অতসী।'

'কিন্তু দীপক যে স্কার্ফটা নিজের হাতে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিল এটা আপনি ভাবলেন কি করে?'

'খুব সহজে। দেখ অতসী, ধ্যান আর ধারণার সাহায্যে সত্যকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছি। এই দুর্গম পথে সহায় ছিল আমার সহজ বুদ্ধি। দীপকের অবস্থায় পড়লে আমি নিজে কি করতাম? স্ত্রীর দোষ নিজের কাঁধে তুলে নেবার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ দুটো, স্কার্ফ আর ছুরিটা—সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিতাম। এইবার আমার কথাটি ফুরুলো। অনেক রাত হয়েছে, সারাদিনের পরিশ্রমে তুমিও কম ক্লান্ত হওনি। তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়গে। পথে যেতে যেতেই ভুলে যাও সব, যাতে রাতে ভুতুড়ে স্বপ্ন এসে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল অতসী। বিপ্রদাসের কথা শেষ হলেও কিছুক্ষণ তার মনটা যেন আটকে রইল জাহাজের কেবিনে। তারপর জোর করে গা ঝাড়া দিয়ে সংযত হলো সে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজাটা খুলতে যাবে, এমন সময় কানে এল বিপ্রদাসের ডাক, 'শোন অতসী, আমার কাছে এসে একবার দাঁড়াও তো।' অপরিসীম স্নেহ যেন ঝরে পড়ল এই মৃদু-মধুর কণ্ঠস্বরে।

ফিরে বিপ্রদাসের সামনে এসে দাঁড়াল অতসী।

'আরও কাছে এস তো, দেখি তোমার মুখখানা।'

সরে এল অতসী।

চশমাটা চোখে বসিয়ে মুখ তুলে তাকাল বিপ্রদাস।

'এ কি, তোমার মুখ এমন কালো হয়ে উঠেছে কেন, কন্যা! কি হলো তোমার?'

আর পারল না অতসী। অন্তরের পুঞ্জীভূত মেঘে মমতার উষ্ণ বাতাস লেগে চোখের দু'কোল বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা। লজ্জায় ভেঙে পড়ে বিপ্রদাসের কোলে মুখ গুঁজল অতসী।

প্রথম বসন্তের উতলা হাওয়ায় জানালার সাদা পর্দা দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছিল এক টুকরো জ্যোৎস্নার আলো। হঠাৎ মিলিয়ে গেল সেটা, সাদা মেঘের ভেলায় ঢাকা পড়ল বুঝি চাঁদের মুখ। অতসীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে স্বপ্নময় কণ্ঠে বিপ্রদাস বলল, 'মেয়ের মনের দুঃখ কি বাবার কাছে গোপন থাকে কখনও। ছিঃ, এ দুর্বলতা তোমার সাজে না অতসী! আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মানুষ দীপক দত্ত নয়। তার আত্মীয় আমরা কেউ হলেও হতে পারি কিন্তু অন্তরঙ্গ হওয়া অসম্ভব। বিরূপ অন্তরে ধীরে ধীরে অনুরাগের আলো যে কেমন করে এসে পড়ে, কি সে রহস্য তা আমি জানি না, অতসী। কিন্তু সেই আলো কারুর অন্তরে জ্বলতে দেখলে বিস্মিত বা বিরক্ত কিছুই হই না। প্রেমকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি আমি। আমি জানি আদালতে বসে কল্পনায় অনেক ছবি এঁকেছো। কিন্তু সে শুধুই স্বপ্ন অতসী, বাস্তব অস্তিত্ব তার একটুও নেই। অন্ধ-মূক-বধির দীপকের জীবনে যুক্ত হওয়ায় জন্যে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সে তপস্যার দাবী করতে পারে একমাত্র রুবি দত্ত। তার এই ক্ষণিক বিচ্যুতিরও হয়তো প্রয়োজন ছিল। এর শিক্ষাই দীপক আর রুবির ভবিষ্যৎ জীবনে সুদৃঢ় সুখের বন্ধন আনবে। কিন্তু তোমার জীবন? পরিবারের দায়িত্ব আছে তোমার, আছে আইনের আঙিনায় সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে যাবার প্রত্যাশা। তাই জীবনের প্রথম মামলায় হেরে গেলে তো তোমার চলবে না অতসী! এর ফল কি জান তো? এই আমার মতো পরাজিত, অবহেলিত জীবন, দর্শনের পুরনো পুঁথির পাতায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকা। ওঠ, চোখ মুছে, মুখে হাসি ফুটিয়ে, নির্ভয়ে পা ফেলে বাড়ীর পথ ধর। তোমার সামনে এক সম্ভাবনাময় জীবন পড়ে রয়েছে, অতসী। অনেক পথ এখনও চলতে হবে তোমায়। আমার সামান্য দুটো কথা কিন্তু কখনও ভুলো না—ভুলো না যে জীবন সত্যিই সুন্দর, মানুষ সত্যিই মহৎ!

—